পিরানদেল্লোর গল্প

পিরানদেল্লোর গল্প

সম্পাদনা করেছেন

বুদ্ধদেব বসু

অনুবাদ করেছেন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ক্ষিতীশ রায়

কমলা রায়

বুদ্ধদেব বসু

সিগনেট প্রেস : কলিকাতা

সূচিপত্র

(১৮৬৯—১৯৪৬)

লুইজি পিরান্দেল্লো

গাব্রিয়েলে দান্নুনৎসিও আর লুইজি পিরান্দেল্লো—এঁরা দু'জন আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্যের দুই চূড়ামণি। কিন্তু দু'জনের প্রতিভার স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দান্নুনৎসিও দীপ্ত, মুগ্ধ, উচ্ছ্বসিত, আনন্দময়; পিরান্দেল্লো শান্ত, রুক্ষ, নিপীড়িত, রহস্যময়। তরুণ বয়সে পিরান্দেল্লো যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, তখন দান্নুনৎসিওর খ্যাতি মধ্যগগনে, কিন্তু পূর্বসূরীর শিষ্যত্ব তিনি কখনো গ্রহণ করেন নি, দান্নুনৎসিওর কলোল্লাস তাঁর ভালোই লাগতো না। অন্য অনেক প্রসিদ্ধ গদ্যলেখকের মতোই, পিরান্দেল্লো তাঁর সাহিত্যজীবন আরম্ভ করেন কাব্যকলার প্রাঙ্গণে, কিন্তু ঠিক সুরটি লাগলো না, বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরেই একটি কাব্যগ্রন্থের তিনি নাম দিয়েছিলেন 'বেসুরো'। কাব্যলক্ষ্মীর কাছে বিমুখ হ'য়ে তিনি গদ্য লেখা ধরলেন, এবং গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা, অল্পকালের মধ্যেই বিকশিত হ'য়ে উঠলো। তারপর পরিণত বয়সে ইতালিয়ান 'গ্রোটেস্ক' নাট্যের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতারূপে তিনি জগদ্বিখ্যাত হলেন। ইওরোপ-আমেরিকার বড়ো-বড়ো শহরে তাঁর নিজস্ব সম্প্রদায় ইতালিয়ান ভাষাতেই তাঁর নাটকের অভিনয় ক'রে বেড়ালো, হলিউডে গ্রেটা গার্বো তাঁর একটি নাটকের সুলভ চলচ্চিত্র-সংস্করণ প্রকাশ করলেন, নোবেল প্রাইজের বরণ-মাল্য তাঁর গলায় পড়লো। ইওরোপে—সুতরাং আমাদের দেশে তাঁর খ্যাতি প্রধানত নাট্যকাররূপেই পৌঁচেছে; কিন্তু বললে কথা-সাহিত্যেও তাঁর বিপুল প্রতিভা, ছোটো গল্পে তিনি বর্তমান ইতালির

প্রধান পুরুষ ব'লে স্বীকৃত। জীবন ভ'রে অজস্র ছোটো গল্প তিনি লিখেছেন, ইতালিয়ান-এ তাঁর সমগ্র গল্পসংগ্রহ *Novelle per un anno* ('বছরের প্রতি দিনের জন্য একটি গল্প') নামে অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ছোটো গল্পের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো এই বইয়ের উদ্দেশ্য।

এ-বইয়ের গল্প ক'টি থেকেই পিরানদেল্লোর মূল সুরটি ধরা যায়। গভীর বেদনারসে গল্পগুলি পরিপ্লুত। এ-বেদনা কখনো মধুরের আভাস এনে দেয়, যেমন 'কয়েকটা কমলালেবু'তে, কখনো বা অতল হতাশায় মগ্ন করে, যেমন 'ডা বেশ' গল্পে। কখনো তিক্ততা, কখনো বিদ্রূপের বাঁকা হাসি, কখনো বা একটু দুর্লভ অশ্রুজল। কিন্তু বেদনা ছাড়া আর কিছু নয়। পিরানদেল্লোর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে এই বিচিত্র বিশাল দুঃখের একটা পটভূমি পাওয়া যায়। তিনি বিবাহ করেছিলেন যুবাবয়সে, পাত্রী তাঁর পিতার নির্বাচিত—বিবাহের পূর্বে কন্যাকে তিনি চোখেও দেখেননি। দাম্পত্য জীবন কিছু দিন সুখেই কেটেছিলো, কিন্তু তারপর পিতার ব্যবসা ফেল পড়ায় তিনি আর্থিক টানাটানিতে পড়লেন, বাধ্য হলেন রোমের একটা মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি নিতে, এবং দুঃখের পাত্র তাঁর পূর্ণ হলো যখন তাঁর স্ত্রী মনঃপীড়ার আক্রমণে অস্বাভাবিক মূর্তি ধরলেন। রোগের প্রধান লক্ষণ হলো স্বামীর প্রতি দুর্দান্ত সন্দেহ—এই সন্দেহের তাড়নায় পিরানদেল্লোকে বছরের পর বছর দুঃসহ নির্যাতন ভোগ করতে হয়। তাঁর স্নেহশীল মন স্ত্রীকে উন্মাদ-আশ্রমের নির্বাসনে পাঠাতে পারলো না, নিঃশব্দে তিনি সহ্য করলেন ভাগ্যের এই আঘাত, এই দীর্ঘ নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। বছরের পর বছর কোনো বন্ধুর বাড়ি তিনি যেতেন না, নিজের উপার্জনের শেষ কপর্দকটি স্ত্রীর হাতে তুলে দিতেন। এই সময়েই তিনি ভাবতে আরম্ভ করেন—তাঁর মধ্যে আসল মানুষটি কে, তাঁর

স্ত্রী যাকে সন্দেহ করে আর তিনি নিজে যাকে জানেন, এ দুয়ের মধ্যে কোনজন? এই চিন্তা ক্রমে গভীরভাবে তাঁর সমস্ত রচনায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে—প্রতি মানুষের মধ্যে এই ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যাবে তাঁর নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে। ১৯১৮ সালে উন্মাদিনী ম'রে তাঁকে মুক্তি দিলো, কিন্তু তাই ব'লে জীবনে তাঁর সুখ ফিরে এলো না। শেষ বয়সে তাঁর মুখের গভীর গম্ভীর বিষণ্ণতা লক্ষ ক'রে অনেকে তাঁকে বলতেন 'চিনে বুদ্ধ'—এই সময়ে তাঁর নাটকে দলের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের নগরগুলিতে গৃহহারা যাযাবরের জীবন তিনি কাটাতেন, টাকাকড়ি সব ছেলেদের লিখে দিয়েছিলেন—সংসারের বাঁধন কিছুই তাঁর ছিলো না। মুখে বলতেন 'হোটেলের ঘরই আমার বাড়ি, আর সম্পত্তির মধ্যে আমার টাইপ্‌রাইটার।'

এ-কথা মনে রাখতে হবে যে পিরানদেল্লো খাস ইতালিয়ান নয়, জাত-সিসিলিয়ান। ছাত্রজীবনে জার্মানির বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সিসিলির মৌখিক ভাষার বিষয়ে, এবং ঐ ভাষায় লেখা কয়েকটি নাটকও তাঁর আছে। এই ছোটো বইটি প'ড়েও বোঝা যাবে যে তাঁর সাহিত্য সিসিলির গন্ধে ভরপুর। জীবনে যখনই যেখানে থেকেছেন, সিসিলির নীল আকাশ, উজ্জ্বল রৌদ্র, সিসিলির অজ্ঞ সরল আবেগপ্রবণ মানবপ্রকৃতি কখনো তিনি ভুলতে পারেন নি। ইওরোপের হিশেবে সিসিলি আমাদের দেশের মতোই 'পেছিয়ে পড়া' দেশ, তাই এই গল্পগুলিতে বর্ণিত কোনো-কোনো চরিত্র মনে হয় যেন আমাদেরই আপন জন। সেই দারিদ্র্য, সেই কুসংস্কার, সেই আত্মঘাতী অচেতনতা। 'দাই-মা'র নায়িকা অনায়াসে বাংলার পাড়া-গাঁর মেয়ে হতে পারে, 'মাটি'র দু' ভাই যেন আমাদের দেশেরই চাষি। সমস্ত দুঃখের পরপারে মাতৃভূমি সিসিলির প্রতি একটি গভীর প্রেম পিরানদেল্লোর ধ্যানী চিত্তে নিঃস্পন্দ।

অনুবাদ সম্বন্ধে দু' একটি কথা। অনুবাদ ইংরেজি থেকে করা হয়েছে, মূল ইতালিয়ান থেকে নয়। অনুবাদের অনুবাদে কিছুটা ক্ষতি হয়তো অপরিহার্য, সে ক্ষতি আমরা পূরণ করবার চেষ্টা করেছি ভাষাবিন্যাসের সৌষ্ঠবে। অনুবাদের বাংলা যাতে সহজেই বাংলার মতো পড়া যায়, যাতে বিজাতীয় গন্ধ কোথাও তাকে উগ্র না করে, সেইদিকেই আমরা বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি। নামগুলির ইতালিয়ান উচ্চারণই রাখা হয়েছে—যদি বন্ধ-লিপিতে কোথাও ভুল হয়ে থাকে, পণ্ডিতরা মার্জনা করবেন—শুধু জায়গার নামগুলি লেখা হয়েছে ইংরিজি উচ্চারণের অনুসরণে, রোমকে রোমা লিখলে বাঙালির অভ্যাসের উপর বড়ো বেশি জুলুম করা হতো।

[illegible]

প্রথম যেদিন তাদের বিয়ে ঠিক হ'লো, সেদিন থেকেই বার্তোলিনো তার ভাবী স্ত্রীকে বলতে শুনেছে :

জানো তো, আমার সত্যিকার নাম কিন্তু লিনা নয়। আমার নাম আসলে কারোলিনা, কিন্তু উনি আমাকে লিনা ব'লে ডাকতেন, আর সেই থেকে আমার নাম লিনাই হয়ে গেছে। আহা—ভারি ভালো-মানুষ ছিলেন উনি, ঐ ভাখো না তাঁর ছবি—'

ব'লে লিনা বড়ো একটি ফোটোগ্রাফের দিকে আঙুল তুললো। বার্তোলিনো দেখলো, তার ভাবী স্ত্রীর প্রথম স্বামী সিনোর ফোলিনো তাফেরি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে টুপি তুলছেন।

প্রায় নিজের অজান্তে, বার্তোলিনো মৃত ভদ্রলোকের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে নিজের মাথাটি অর্ধেক নিচু ক'রে ফেলেছিলো।

তাফেরি ছিলেন একজন বিখ্যাত স্থপতি। তিনি গত হবার পরে তাঁর ছবিটি দেয়াল থেকে নামিয়ে রাখবার কথা তাঁর বিধবা স্ত্রী লিনা সাফেরির একবারও মনে হয়নি। কেনই বা হবে। তাঁর কাছে লিনার কৃতজ্ঞতা তো কম নয়। তার মান সম্মান, বাড়ি ঘর, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র সব তো তিনিই তার জন্য ক'রে গেছেন।

ভাবী দ্বিতীয় স্বামীর অপ্রতিভ ভাব কিছুমাত্র লক্ষ্য না ক'রে লিনা আরো বলেছে, 'আমি অবশ্য নাম বদল করতে চাইনি, কিন্তু উনি যা বলতেন, তার উপর আমি আর না বলতে পারতুম না। তুমিও আমাকে ঐ নামেই ডেকো, কেমন? কিছু মনে করবে না তো?'

বার্তোলিনো থতমত খেয়ে বলেছে, 'না···ইয়ে···না···তা তো ঠিকই।' ভেনাসের বড়ো ছবিটি থেকে সে যেন আর চোখ ফেরাতে পারেনি—ভদ্রলোক তারই দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে টুপি তুলে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

তিন মাস পরে যখন আত্মীয় বন্ধুরা লিনা আর তার স্বামীকে তাদের হানিমুন-যাত্রায় তুলে দিতে স্টেশনে এলো, তখন লিনার প্রিয় সখী অর্তেনসিয়া বোকা স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটি অসহ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বেচারা বার্তোলিনো—লিনার মতো মেয়ের সঙ্গে···'

'কেন, বেচারা কেন?' তার স্বামী ব'লে উঠলো। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, লিনার দ্বিতীয় বিবাহের ঘটকালি বলতে গেলে তিনিই করেছেন, তাই এ-বিয়ের কোনোরকম সমালোচনা শুনলেই তাঁর রাগ হ'তো। 'বেচারা হবার কী হয়েছে? বার্তোলিনো তো বোকা নয়, কেমিস্ট্রিতে তার অসাধারণ দখল।'

'হ্যাঁ, কেমিস্ট্রিতে,' বললে অর্তেনসিয়া।

'দেখো তুমি, বার্তোলিনো একেবারে আদর্শ স্বামী হবে। কেমিস্ট্রির কথাই বা কী—যদি একটু গা ক'রে ওর সব কাজ ও ছাপিয়ে বের করতো তাহ'লে দেশের একজন আদর্শ শিক্ষক হ'তে পারতো। তা ছাড়া ও এমন মন-খোলা ভালোমানুষ—'

'ঠিক বলেছো, নিতান্ত মন-খোলা ভালোমানুষ।' লিনার এই দ্বিতীয় হানিমুনের কথা ভেবে অর্তেনসিয়া মনে মনে একটু না হেসে পারলো না। প্রথম বারেও রোমে গিয়েছিলো লিনা—এবারেও রোমে যাচ্ছে। প্রথম বারে ছিলো বুদ্ধিমান, ধূর্ত, উৎসাহী (কখনো-কখনো একটু বা বেশি উৎসাহী) লিনো ভাক্কেরি, আর এবারে তার জায়গায় এই

ছোকরা বার্তোলিনো—মাথায় টাক, কিন্তু চেহারায় আর ব্যক্তিত্বে ছেলেমানুষ।

ট্রেন ছাড়বার আগে আনসেলমো-বুড়ো দৌড়ে বলেছিলেন, 'বার্তোলিনোর একটু দেখাশুনো কোরো…একটু যত্ন-টত্ন কোরো ওকে।'
লিনা তার প্রথম হানিমুনে আগে একবার রোমে এসে গেছে, দেশ-ভ্রমণের সব রহস্য তার জানা—সে সমস্তটা পথ বার্তোলিনোকে প্রায় ছেলেমানুষের মতো হাতে ধরে নিয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত গাড়ি যখন রোমে পৌঁছলো, সে স্বামীকে বললে, 'তুমি কিছু ভেবো না—আমি সব ক'রে নিচ্ছি।' যে-কুলিটা তাদের মালপত্র গোছাচ্ছিলো তার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'হোটেল ভিক্টোরিয়া।'
স্টেশনের বাইরেই হোটেল ভিক্টোরিয়ার বাস্ অপেক্ষা করছিলো। ড্রাইভারকে চিনতে পেরে লিনা তার দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নাড়লো।
'সুন্দর হোটেলটি দেখো। ছোট্ট ফিটফাট, চাকর-বাকররা চটপটে, একেবারে শহরের মধ্যিখানে, অথচ খরচও খুব বেশি নয়।…ছ' বছর আগে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম হানিমুনে এসে এ-হোটেলেই উঠেছিলাম।…তোমারও এটা ভালো লাগবে, দেখো।'
হোটেলটা লিনার প্রায় বাড়ি-বাড়ি লাগলো। তাকে যে কেউ চিনতে পেরেছে এমন মনে হ'লো না, কিন্তু সে সকলকেই ঠিক চিনতে পারছে। ঐ তো বুড়ো 'পিয়েত্রো', ছ' বছর আগেই এই লোকই তাদের [illegible] করেছিলো। সে তাদের দোতলায় এক ১২ নম্বর ঘরে নিয়ে গেলো—বেশ বড়ো ঘরটি, ভালো ক'রে সাজানো, কিন্তু লিনার সে-ঘর পছন্দ হ'লো না।
'পিয়েত্রো, উনিশ নম্বর ঘর কি খালি আছে?' পিয়েত্রো খবর নিতে বেরিয়ে

গেলো, সে তাকে লিনার মনে-পড়লো যে দু' বছর আগে তাঁদেরও ঠিক এই রকমই হয়েছিলো। ওঁর জন্য দোতলায় একটা ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিলো ওরা, কিন্তু উনি চেয়েছিলেন তেতলায় এন্-১৯ নম্বর ঘর।
'শুনছো, ওখানেই আমরা ভালো থাকবো। গোলমাল কম, হাওয়া বেশি। ঐ একই ঘর…'
পিয়েত্রো ফিরে এসে যখন বললে যে এন্ ১৯ খালি আছে, লিনা ছেলে-মানুষের মতো হাত-তালি দিয়ে হেসে উঠলো। ঠিক সেই ঘরেই সে আবার থাকবে, সেই সব আসবাব, সেইরকম ক'রে সাজানো, জানলার ধারে ঠিক সেই ফুলুঙি! কী মজা!
বলা বাহুল্য, বার্তোলিনো তার আনন্দের অংশগ্রহণ করতে পারেনি।
'কী গো, ঘরটি ভালো লাগছে না তোমার?' লিনা জিগগেস করলে।
উদাসভাবে বার্তোলিনো জবাব দিলো, 'মন্দ কী—তোমার ভালো লাগলেই হ'লো…'
তারপর—লিনা যখন কাপড় ছাড়তে পরদার পিছনে গেলো—সে ঘরের খাটটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো যে এখানেই, এই বিছানায় তার স্ত্রী তার প্রথম বিবাহিত রাত্রি কাটিয়েছে—কাটিয়েছে তার প্রথম স্বামী গিনোর ভাকেত্তির সঙ্গে।…আর অনেক দূর থেকে, তার স্ত্রীর বাড়ির দেয়ালে ঝোলানো ছবিটি থেকে, গিনোর ভাকেত্তির মূর্তি তার চোখের সামনে জেগে উঠলো—মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে তিনি টুপি তুলছেন!

হানিমুনের সময়টা তারা যে শুধু সেই একই বিছানায় শুলো তা নয়, সেই একই রেস্তোরাঁয় খেলো, সেই সব দৃশ্যই দেখে বেড়ালো, সেই সব যাদুঘর, সেই সব চিত্রশালা, সেই সব গির্জে, এমন কি সেই সব বাগান—

যেখানে যেখানে দু' বছর আগে, লিলা তার 'উমি'-র সঙ্গে গিয়েছিলো। বার্তোলিনো ভারি লাজুক স্বভাবের মানুষ—কিছুতেই সে মুখ ফুটে বলতে পারলো না যে সেই প্রথম স্বামীর উপদেশ, অভিজ্ঞতা, রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা পায়ে পায়ে অনুসরণ ক'রে চলতে কত খারাপ তার লাগছে। লিলাও লক্ষ্য করলো না যে তার ব্যবহারে তার তরুণ স্বামী মনে মনে কী রকম মর্মাহত। আঠারো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিলো, তখন সে বলতে গেলে খুকি, কিছুই বোঝে না, জানে না, ঐ মানুষটিই তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ করেছে, সে তার প্রথম স্বামীরই তো সৃষ্টি। যা-কিছু তার আছে সবই কি ওঁর কাছ থেকেই সে পায় নি—এমন কি, ওঁর থেকে ভিন্নভাবে ভাববার কি অনুভব করবার শক্তিও তার লোপ পেয়ে গিয়েছিলো।

সে যে আবার বিয়ে করেছে তাও তো সিনোর তাফেরিরই উপদেশ। তিনিই তাকে শিখিয়ে গেছেন যে অশ্রুজলে জীবনের শুশ্রূষা হয় না, জীবিতের জন্য জীবন, আর মৃতের জন্য মৃত্যু। শুধু এই কথা মনে ক'রেই সে বার্তোলিনোকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলো—আর কোনো কারণে নয়। বার্তোলিনো যদি তাকে ভালোবাসে তাহ'লে তার মতামত মেনে নিয়েই চলবে সে—আর তার মানেই সিনোর তাফেরির ইচ্ছা অনিচ্ছার অনুসরণ করা। তিনিই কর্তা, জীবন-রথের তিনিই সারথি।

কিন্তু—যৌবনের অন্ধ অনভিজ্ঞতার বশে বার্তোলিনো ভাবলো—অতি সামান্য কিছুও কি লিলা তাকে দিতে পারে না—একটি চুম্বন, একটু আদর, তার প্রথম স্বামী তাকে যা-সব শিখিয়ে গেছে তা থেকে যা আলাদা? এমন কিছু, যা ঐ মৃত মানুষের কর্তৃত্ব থেকে লিলাকে তখনকার মতো মুক্তি দিতে পারে? কিন্তু কথাটা উল্লেখ করতেও তার লজ্জা, আর বিদ্রোহ করবার কথা সে তো ভাবতেই পারে না।

হানিমুন থেকে ফিরে এসে একটি অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ পেলো তারা।

লিনোর খোকা—যিনি তাদের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন—হঠাৎ মারা গেছেন।

সে নিজে যখন বিধবা হয়েছিলো তখন এই খোকার স্ত্রী আর্তেমিসিয়া তার জন্য যে কত করেছিলো তা কি লিনা ভুলতে পারে। সেও ছুটে গেলো সখীকে সান্ত্বনা দিতে, সাহায্য করতে। কিন্তু সে বুঝতেই পারলে না যে স্বামীর মৃত্যুর দশ দিন পরেও আর্তেমিসিয়া অমন শোকাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে কেন।

'ওর কী হয়েছে বলো তো?' ফিরে এসে সে তার স্বামীকে জিগেস করলে।

স্ত্রীর বোধশক্তির অভাবে বার্তোলিনো লজ্জায় লাল হ'লো।—'মানে—যাই বলো না, ওর স্বামী তো মারা গেছে।'

'ওর স্বামী? তা মরেছে তো কী হয়েছে? বাপের বয়সি স্বামী, তার আবার...'

'তা হ'লেই বা, তাই বলে কি দুঃখ হ'তে নেই?'

'বাপের বয়সি, কিন্তু বাপ তো নয়।' লিনা জোর ক'রেই বললে।

লিনার কথাই ঠিক। আর্তেমিসিয়া লক্ষ্য করেছিলো যে লিনার মুখে বার বার তার মৃত স্বামীর কথা শুনে শুনে বার্তোলিনোর নেশা ধ'রে গেছে। সে তাই দুঃসহ দুঃখের ভাব ধ'রে তার মন ভোলাবার চেষ্টা করলে। তার দুঃখ বার্তোলিনোকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করলে যে এই প্রথমবার, প্রাণপণে লজ্জা কাটিয়ে উঠে, সে তার স্ত্রীর কাছে বিদ্রোহ করলে।

'তুমি...তুমিও কি কাঁদোনি!'

সে আরো কিছু বলতে হয়তো, কিন্তু লিনা তাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, 'ওর সঙ্গে আমার তুলনা। এখন কথা, উনি ছিলেন...'

স্ত্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বার্তোলিনো বললো, 'উনি তখনো যুবো

হয়নি—এই তো ?'

'তা ছাড়া···আমিও কি কাঁদিনি ? হ্যাঁ, কেঁদেছি বইকি, খুব কেঁদেছি···কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছি আমি। কিন্তু অর্তেনসিয়া কী করছে ? কেবলই কাঁদছে আর কাঁদছে আর কাঁদছে—যেন জীবন ভ'রে ও কাঁদবেই। জানি, জানি, ও-সব মেকি কান্না !'

মেকি ! অসম্ভব ! কথাটা শুনে বার্তোলিনোর আরো রাগ হলো যত না স্ত্রীর উপর, তার চেয়েও বেশি রাগ হলো স্ত্রীর ঐ মৃত স্বামী, ঐ সিনোর জাফেরির উপর। লোকটা এখনো দেয়াল থেকে তাকিয়ে তার দিকে মুচকি হেসে টুপি তুলে আছে, এখনো তার ইচ্ছার, তার মতামতের বশ ক'রে রেখেছে তার স্ত্রীকে !

ঐ ছবি ! ঐ চিরন্তন হাসি ! আর সহ্য হয় না। যেখানেই সে যায়, ভূতের মতো লেগে আছে তার পিছনে। ঐ তো, তার চোখের সামনে, হেসে হেসে টুপি তুলে যেন বলছে :

'এবার তোমার পালা—হাত পা ছড়িয়ে বেশ আরাম ক'রে নাও। এ-ঘর এককালে আমার আপিশ-ঘর ছিলো, এখন তোমার কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি হয়েছে। জীবিতের জন্য জীবন, মৃতের জন্য মৃত্যু। সুখে থাকো, শান্তিতে কাজ করো।'

হয়তো সে শোবার ঘরে ঢুকেছে, সেখানেও সিনোর জাফেরির মূর্তি মুখের ক্রূর হাসিটি নিয়ে উপস্থিত !

'এসো, এসো। তারপর, ভালো তো ? আমার স্ত্রীকে কেমন লাগছে তোমার ? আমি তাকে সুশিক্ষা দিয়েছিলাম কিনা, বলো ! জীবিতের জন্য জীবন, মৃতের জন্য মৃত্যু।'

না, আর সহ্য হয় না। বাড়ির প্রতিটি কোণ ঐ মানুষটা জুড়ে আছে। বার্তোলিনো এমন যে নিরিবিলি মানুষ সেও অস্থির হ'য়ে উঠলো, ছটফট করতে লাগলো, স্ত্রীর কাছে মনের ভাব লুকোবার চেষ্টা আর তার সফল

হ'লো না।

শেষ পর্যন্ত মনের ভাব লুকোবার চেষ্টাই সে ছেড়ে দিলে। চেষ্টা করলো খাপছাড়া হ'তে, অদ্ভুত হ'তে, যাতে তার স্ত্রীর পুরোনো অভ্যাসগুলি নাড়া খায়। কিন্তু এবারেও সে সফল হ'লো না।

'তোমার চাল চলন ঠিক ওর মতোই হ'য়ে উঠছে,' ঈষৎ খাদের সুরে লিনা বললে। 'উনিও বড্ড বেহিসেবি ছিলেন—আহা ভালোমানুষ বেচারা!'

শিগগিরই বার্তোলিনো বুঝতে পারলো যে তার খাপছাড়া ব্যবহার লিনা মনে মনে উপভোগই করেছে। তার এ-সব কারসাজি লিনাকে ঠিক সেই মানুষটির কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে, যাকে সে স্ত্রীর মন থেকে মুছে দিতে চায়।

শেষটায় বিশ্রী একটা ফন্দি তার মনে এলো।

সত্যি বলতে, স্ত্রীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করবার ইচ্ছা তার ততটা ছিলো না, যতটা ছিলো প্রতিহিংসার উত্তেজনা। সেই মানুষের উপরেই তার আক্রোশ, যে-মানুষ তার আগেই তার স্ত্রীকে দখল করেছিলো, এবং ম'রে গিয়েও সে-দখল ছাড়েনি। তার অজ্ঞাত অনভিজ্ঞ মনে ধারণা হ'লো যে এই দুর্বুদ্ধির ফন্দি একান্তই তার নিজের সৃষ্টি। সে ভাবতে পারলো না যে এ-দুর্বুদ্ধি অর্তেনসিয়াই তার অবচেতন মনে একটু একটু ক'রে ঢুকিয়েছিলো। যখন সে বিয়ে করেনি, তখন তাকে তার পড়াশুনো থেকে ভ্রান্ত করবার অনেক চেষ্টাই অর্তেনসিয়া করেছে, ক'রে ব্যর্থ হয়েছে।

কুচক্রী অর্তেনসিয়া এবার চালের পিঠে চাল ছাড়লো। ইনিয়ে-বিনিয়ে বার্তোলিনকে সে বোঝালো যে লিনার মতো প্রিয় সখীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু বার্তোলিনোকে অনেক আগে থেকেই সে ভালোবেসে আসছে, লিনা তখন তাকে চোখেও দ্যাখেনি। সে ভালোবাসা নিয়তির মতোই অনতিক্রম্য।

এর পরে যা হ'লো, তাতে যে নিয়তির কী হাত থাকতে পারে, বার্তোলিনো কিন্তু তা ভেবে পেলো না। বেচারা ভালোমানুষ! তার গূঢ় অভিসন্ধিটি যে এত সহজে সফল হ'লো তাতে একটু হতাশই হ'লো সে। মনে হ'লো সে যেন ঠকে গেছে। তার পুরোনো বন্ধু যোভান্নার শোবার ঘরে সে যখন একলা হ'লো, একটু পরেই অনুশোচনায় তার মনটা ভ'রে গেলো। হঠাৎ তার চোখে পড়লো যে বিছানার পাশে মেঝের উপর একটা চকচকে জিনিশ পড়ে আছে। ছোট্ট সোনার একটা লকেট, নিশ্চয়ই আর্তেমিসিয়ার গলার। সে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আর্তেমিসিয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। নাড়াচাড়া করতে করতে তার উত্তেজিত আঙুলের চাপে হঠাৎ লকেটের মুখটা গেলো খুলে।

নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারলো না।

লকেটের ভিতরে একটা ছবি খুব ছোটো ক'রে খোদাই করা। সিনোর কোসিমো ভাক্কেরির সেই ছবি, তিনি মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে টুপি তুলে আছেন।

—বুদ্ধদেব বসু

[illegible]

'তেরেসিনা কি এখানে থাকে ?'

বাটলারের গায়ে তখনো কেবল শার্ট কিন্তু এতই মতো সে গলার শক্ত কলার চাপিয়েছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছেলেটিকে সে একবার দেখে নিলো। ছেলেটি তার মোটা কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিয়েছে, শীতে নীল হয়ে জমে গেছে তার হাত। এক হাতে একটি ছোট্ট নোংরা ব্যাগ, অন্য হাতে একটা পুরোনো আট্যাশে কেস নিয়ে সব চেয়ে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বর্বরের মতো সে বাটলারের দিকে তাকিয়ে।

বাটলারের চোখের উপর মোটা মোটা ভুরু, দেখে মনে হয় তার গাল থেকে দাড়ি কেটে নিয়ে কেউ স্থায়ীভাবে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে। সেই ভুরু তুলে সে জিগগেস্ করলে, 'তেরেসিনা ? তেরেসিনা কে ?' ছেলেটি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে এক ফোঁটা শিশির তার নাক থেকে ঝরিয়ে দিলে। তারপর জবাব দিলে, 'তেরেসিনা—গায়িকা তেরেসিনা।' বাটলারের মুখে বিস্ময় মেশানো বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো।—'ও ! তাঁর নাম বুঝি তেরেসিনা—শুধুই তেরেসিনা ? আর তুমি কে [illegible] তো ?'

ছেলেটির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটলো, ফোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ বেরুলো তার নাক দিয়ে।—'সে বাড়িতে আছে না নেই বলো দেখি। তাকে গিয়ে বলো যে বিচুক্কো এসেছে—তাহলেই হবে।'

বাটলারের মুখের উপর একটি হুব্‌হু হাসি যেন জমে বরফ হয়ে গেলো।

'কিন্তু এখন তো কেউ বাড়ি নেই। বাবার পিসিমা মাসিমা এখনো থিয়েটার থেকে ফেরেননি আর...'
'আর মার্থা-মাসি?' মিচুকো তাকে বাধা দিলে।
'ও আপনি তাঁর বোন-পো বুঝি?' চাকরটা তক্ষুনি সসম্মানে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'আজ্ঞে না কেউ বাড়ি নেই: একটার আগে ফিরবেন মনে হয় না। আর আপনার...আপনার হবেন বকুলী-রজনী কিনা ...বাবার তাহ'লে আপনার কী না হলেন...মাসতুতো বোন না?'
মিচুকো একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, 'না...মানে...ওরা ঠিক আমার আত্মীয় নয়।...আমি...আমার নাম মিচুকো যোনাশিরো...আমার নাম শুনলেই সে চিনবে। ওর সঙ্গে দেখা করতেই আমি দেশ থেকে এসেছি।'
এর পরে বাটলার ভাবলে যে 'আজ্ঞে'-'আপনি'গুলো ব্যবহার না করাই ঠিক হবে। রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট অন্ধকার একটা ঘরে মিচুকোকে সে নিয়ে গেলো। সেখানে কার উচ্চ নাসিকাধ্বনির শব্দ আসছে।
'বোসো এখানে—আমি আলো নিয়ে আসছি।'
যেদিক থেকে নাক ডাকার শব্দটা আসছিলো, মিচুকো সেদিকে তাকালো, কিন্তু নাসিকাধ্বনির উৎপত্তি আবিষ্কার করতে পারলো না। তখন সে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো—বাবুর্চি আর বয় মিলে ডিনার প্রস্তুত করছে। ভোজ্যবস্তুর গন্ধে সে আকুল হ'লো, মাথা ঝিমঝিম আর গা বমি-বমি করতে লাগলো তার; সকাল থেকে সে বলতে গেলে কিছুই খায়নি, বেসিনা থেকে এক রাত্রি এক দিন ট্রেনে কাটিয়ে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে।
বাটলার আলো নিয়ে এলো। ঘরের এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়ালে দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে একটা পর্দা খাটানো হয়েছে, তার আড়ালে এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে যে ঘুমুচ্ছিলো সে আবো ঘুমের মধ্যে

বিরক্তির স্বরে ব'লে উঠলো : 'কে ?'

'সোফিনা, ওঠ্। সিনোর বোনা ভিচিনো এসেছেন।'

আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে মিচুজো বললে, 'বোনাভিনো।'

'সিনোর বোনাভিনো এসেছেন···মালামের বন্ধু···আর তুই কিনা প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছিস! ঘণ্টা বাজলে তোর কানে কখনো যায় না। আমি তো আর এক হাতে সব করতে পারি না। আমাকে এখন খাবার টেবিল সাজাতে হবে, আনাড়ি বাবুর্চিটার পিছনে তো আমি লেগেই আছি···এর উপর কে এলো না এলো তাও কি আমাকেই দেখতে হবে ?'

বাটলারের এই বকুনির উত্তরে শোনা গেলো অনেকক্ষণ ধ'রে আড়-মোড়া ভাঙার সঙ্গে তাল রেখে হাইয়ের প্রচণ্ড শব্দ, তারপর হঠাৎ একটা তীব্র আনুনাসিক ধ্বনি। রাগে গজগজ করতে করতে বাটলার চ'লে গেলো।

মিচুজোর একটু হাসি পেলো। চোখ দিয়ে বাটলারকে সে অনুসরণ করলে—আরো একটা আরো অন্ধকার ঘর পার হ'য়ে উজ্জ্বল আলো-জ্বলা বিশাল খাবার ঘরের প্রান্তে সে পৌঁছলো। কী সুন্দর, কী জমকালো টেবিল সেখানে পাতা! মিচুজো মুগ্ধতায় আত্মবিস্মৃত হ'লো। খানিক পরে সেই নাক ডাকার শব্দে আবার তার চোখ এসে পড়লো পর্দার উপরে।

বগলের তলায় ন্যাপকিনটি নিয়ে বাটলার একবার ও-ঘরে যাচ্ছে, একবার এ-ঘরে আসছে। কখনো সোফিনার উদ্দেশে, কখনো বাবুর্চির উদ্দেশে তার বকরবকর চলেইছে। বাবুর্চিটি নিশ্চয়ই নতুন লোক, আজকের উৎসবের জন্যই তাকে আনা হয়েছে—সে অবিশ্রাম এ-কথা ও-কথা জিগেস ক'রে বাটলারকে অস্থির ক'রে তুলছে। মিচুজোরও তাকে অনেক কথা জিগেস করবার ছিলো—কিন্তু এখন সেগুলো চেপে

থাওয়াই ভালো, বাটলারকে আর খাটিয়ে কাজ নেই। এ-কথাও তাকে জানালো হরকার যে সে, বিচুক্কোই তেরেসিনার ভাবী স্বামী। কিন্তু কথাটা বলতে সে খুব উৎসাহ পেলো না, কেন কে জানে। এ-কথা শুনলে তার সঙ্গে অত্যন্ত সসম্মান ব্যবহার না ক'রে বাটলারের উপায় থাকবে না—সেটাই কি কারণ? যদিও এখনো সে তার কোটটি গায়ে চড়ায়নি, তবু বাটলারের ভাব ভঙ্গি কী মার্জিত, কী অদ্ভুত! তার দিকে তাকিয়ে বিচুক্কো মনে মনে কথাটা ভাবতেও লজ্জায় যেন ম'রে গেলো। সে, তেরেসিনার ভাবী স্বামী! তবু এক সময়ে তার পক্ষে আর আত্মসংবরণ সম্ভব হ'লো না, সে ফিসফিস ক'রে ফেললো, 'কিছু মনে কোরো না…কিন্তু…এই বাড়ি…বাড়িটি কার?'

বাটলার তাড়াতাড়িতে জবাব দিলে, 'আমাদেরই, যতক্ষণ এখানে আছি, আমাদেরই।' আর বিচুক্কো ব'সে ব'সে মাথা নাড়তে লাগলো। কী কাণ্ড! সব তাহ'লে সত্যি!…তেরেসিনার কপাল খুলেছে! সে বড়োলোক! এই যে রীতিমতো ভদ্রলোকের মতো দেখতে বাটলার, ঐ বয়, বাবুর্চি, ঐ যে দোবিনা প'ড়ে প'ড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—এরা সবাই তাহ'লে তেরেসিনার চাকর, তেরেসিনার কথায় ওঠে বসে। এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে?

রেসিনার কথা আবার তার মনে পড়লো। একটা জঘন্য চিলকোঠায় তেরেসিনা তার মা-কে নিয়ে থাকতো। পাঁচ বছর আগে, সেই খুপরি চিলকোঠায় মা-মেয়ের না খেয়ে মরবার দশা হয়েছিলো। মরেনি তার জন্যই। সে, বিচুক্কো, সে-ই আবিষ্কার করেছিলো তেরেসিনার কণ্ঠের ঐশ্বর্য। তখন সে সব সময়েই গান গাইতো, গাইতো পাখির মতো, নিজের প্রতিভা সে নিজেই জানতো না। তার গানের মধ্যে একটি উদ্দাম উৎসাহ ছিলো—গান দিয়ে সে নিজেকে ভুলিয়েছে, ভুলে থেকেছে তার দুঃখ, তার দুঃসহ দুরবস্থা। তার মা, বাবা—বিশেষ ক'রে

তার মা—নিরন্তর বাধা দিয়েছেন, তবু বিচুজোর প্রাণপণ চেষ্টা ছিলো কেমন ক'রে সেই দুঃখ একটুও লাঘব হবে। তেরেসিনার বাপ মারা গেলো—এর পর সে কি তাকে ত্যাগ করতে পারে? সে নিঃস্ব ব'লে তাকে ছেড়ে যাবে সে? তার তো ছোটোখাটো একটা চাকরি আছে মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাণ্ডে সে বাঁশি বাজায়।

বিচুজোর মনে যেন দৈব প্রেরণা এসেছিলো, যেন সে আকাশ-বাণী শুনেছিলো—তাইতো তেরেসিনার কণ্ঠস্বরকে কাজে খাটাবার কথা মনে হয়েছিলো তার। মনে পড়ে সেদিন ছিলো এপ্রিল মাস, ওদের চিলকোঠার জানলাটি যেন ফ্রেমের মতো খানিকটা উজ্জ্বল নীল আকাশকে ধরেছে। সেই জানলার ধারে ব'সে তেরেসিনা একটা সিসিলির সুর গুনগুন করছিলো। সেদিন তাদের কথায় ছিলো উদ্দাম আবেগ। তেরেসিনার মন ভালো ছিলো না, বিচুজোর মা বাবা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না, আর এই তো সেদিন তার নিজের বাপ···। বিচুজোরও এত খারাপ লাগছিলো যে গান শুনতে-শুনতে চোখে তার জল এসেছিলো। ও গান তেরেসিনার মুখে তো আগেও শুনেছে, কিন্তু ও-রকম সে আর কখনো গায়নি। সেদিন তার মন এমন নাড়া খেয়েছিলো যে পরের দিনই—তেরেসিনাকে কি তার মা-কে কিছু না ব'লে—তার এক বন্ধুকে, সেই ব্যাণ্ডের কণ্ডাক্টরকে সে সঙ্গে ক'রে ওদের চিলকোঠায় নিয়ে এসেছিলো। এইভাবে আরম্ভ হ'লো তেরেসিনার সংগীতশিক্ষা—আর এর পরে দু' বছর ধ'রে বিচুজো তার মাইনের প্রায় সবটাই তেরেসিনার পিছনেই খরচ করেছে; সে পিয়ানো ভাড়া করলো, স্বরলিপি কিনলো, এমন কি ওস্তাদজির হাতেও বন্ধুভাবে অল্প-স্বল্প কিছু গুঁজে দিলো। কী ভালোই ছিলো সেই দিনগুলি! তেরেসিনার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল রঙে আঁকতেন তার ওস্তাদ—তেরেসিনার ইচ্ছা হতো দড়িদড়া ছিঁড়ে সেই ভবিষ্যতের দিকে ভেসে পড়ে। আর

তারই সঙ্গে-সঙ্গে বিচুক্কোর প্রতি তার কত ভালোবাসা, কত কৃতজ্ঞতা! কত সুখের স্বপ্নই দু'জনে মিলে তারা দেখেছে!

কিন্তু তেরেসিনার মা, মার্থা-মাসি হতাশভাবে মাথা নেড়েছে। জীবনে আশার অঙ্কুর তার অনেকবার গজিয়েছে, অনেকবার ঝরেছে—ভবিষ্যতের উপর আর তার আস্থা নেই। মেয়ের কথা ভেবে তার আশঙ্কা হোতো—মেয়ে যে এই দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবার স্বপ্নও দেখছে এটাও তার ভালো লাগতো না। বেশ তো—এই দুঃখই তো বেশ গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। আর বুড়োর মতো এই যে স্বপ্ন-দেখা, এর কত কঠিন মূল্য যে বিচুক্কোকে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাও মাসি জানতো।

কিন্তু দু'জনের একজনও তার কথায় কর্ণপাত করলে না। একবার এক তরুণ গায়ক-সুরকার এক জলসায় তেরেসিনার গান শুনে বললে যে এই মেয়েকে সংগীত শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য নেপল্‌স-এ না-পাঠানো অমার্জনীয় অপরাধ। যেমন ক'রে হোক নেপল্‌স-এর গীতভবনে একে যেতেই হবে।

মার্থা-মাসির আপত্তি বিফলে গেলো। বিচুক্কো এ নিয়ে আর দু'বার ভাবলে না। এক পূর্বপুরুষ-বুড়ো তাকে কিছু জমি-জমা দিয়ে গিয়েছিলেন, বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সে তা-ই বেচে দিলে, তারপর তেরেসিনাকে নেপল্‌স-এ পাঠালো সংগীতশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে।

তারপর আর তার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছে, যতদিন গীতভবনে ছিলো, তেরেসিনাই চিঠি লিখতো। তারপর একবার যখন তার গানের জীবন বন্যার মতো তাকে ভাসিয়ে নিলে, মস্ত কাগজের তার নাম ফেটে পড়বার পর সব বড়ো বড়ো থিয়েটারওয়ালার সে কাম্য হয়ে দাঁড়ালো তখন থেকে চিঠি লিখতো মার্থা-মাসি। বুড়োমানুষ ভালো ক'রে কিছুই লিখতে পারতো না, আঁকাবাঁকা অক্ষরে খানিকটা কাঁপা-কাঁপা কথা বিচুক্কোর কাছে এসে পৌঁছতো—আর সেই সঙ্গে

তেরোসিনাও এক লাইন জুড়ে দিতো—নিজে আলাদা ক'রে লিখবার দরকারই তার হ'তো না। 'ফিচুক্কো যা যা লিখছেন সব ঠিক কথা। ভালো থেকো, আমাকে ভালোবেসো।' নিজেদের মধ্যে তারা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিলো যে পাঁচ ছ' বছর ফিচুক্কো তাকে একেবারে ছেড়ে থাকবে, আর এই সময়ে সে নিজের চেষ্টায় নিজের পথ তৈরি ক'রে নেবে। দুজনেই ছেলেমানুষ—অপেক্ষা করতে বাধা নেই। কাটলো পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে ফিচুক্কোর আত্মীয়রা তেরোসিনার নামে, তার মা-র নামে নানারকম কলঙ্ক রটাবার চেষ্টা করেছে; এদিকে ফিচুক্কো সে সব মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে ওদের সব চিঠিপত্র সকলকেই দেখিয়েছে, যে যখন দেখতে চেয়েছে তাকেই দেখিয়েছে। তারপর তার অসুখ করলো, বাঁচবার আশা ছিলো না। ঠিক এমনি সময়ে মার্থা-মাসি আর তেরোসিনা তার ঠিকানায় মোটা অঙ্কের টাকা পাঠিয়েছিলো—সে তখন তা জানতেও পায়নি।

কিছু টাকা তার অসুখে উবে গিয়েছিলো, বাকিটা সে গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছিলো তার লোভী আত্মীয়দের হাত থেকে। সে-টাকা এখন সে তেরেসিনাকে ফিরিয়ে দেবে। চায়নি, এ-টাকা সে চায়নি। দয়ার দান ব'লে যে তার অপমান হয়েছে তা নয়—তেরেসিনার পিছনে সে তো কতই খরচ করেছে—আর এখন তো দেখতে পাচ্ছে যে এ বাড়িতে ঐ টাকা ক'টার থাকা না-থাকায় কিছুই এসে যায় না। এতগুলি বছর সে অপেক্ষা করেছে, না-হয় আরো অপেক্ষা করবে। তেরোসিনার আর্থিক স্বচ্ছলতায় এইটেই বোঝা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতের পথ তার খুলে গেছে, তবে আর দেরি কেন? বাবা কথাটা শুনে ফেলেছে তাদের অবিশ্বাস অতিক্রম ক'রে সেই পুরোনো অঙ্গীকারের উদ্‌যাপন এখনো কি হবে না?

ফিচুক্কো উঠে দাঁড়ালো। মনে-মনে যে-সিদ্ধান্তে সে পৌঁছেছে, কেন

তারই সমর্থনে তার কপালে কয়েকটা ফোঁটা-ফোঁটা রেখা ফুটলো। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে আবার ফুঁ দিয়ে সে অসহিষ্ণুভাবে পা দিয়ে মেঝে ঠুকতে লাগলো। বাটলার তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললে, 'কী, শীত করছে? রান্নাঘরে যাও না, ওখানে বেশ আরামে থাকবে।'

বাটলারের নবাবি হাবে-ভাবে মিচুক্কোর কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগলো, তার সদুপদেশ শুনে একটুও খুশি হ'লো না। আবার ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলো। খারাপ লাগছিলো তার, ভাবনা হচ্ছিলো। একটু পরেই দরজায় বেল জোরে বেজে উঠলো। চমকে উঠলো মিচুক্কো।

'দোরিনা, মাদাম এসেছেন' বাটলার তারস্বরে ব'লে উঠলো, তারপর তার কোটটি দু'হাতে ধ'রে গায়ে চড়াতে চড়াতে ছুটে দরজা খুলতে গেলো। মিচুক্কো তার পিছন-পিছন আসছিলো, সে বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি আসছো কেন? বোসো গিয়ে, আমি মাদামকে আগে খবর দিই।'

দরজার পিছন থেকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'উঁ-উঁ-উঁঃ!' তারপর একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলো, মস্ত মোটা, চুলে কলপ। চোখ পর্যন্ত শাল মুড়ি দিয়ে আধো ঘুমের মধ্যে থপথপ ক'রে সে এগিয়ে এলো। মিচুক্কো বড়ো বড়ো চোখে তার দিকে তাকালো, সে-ও কপাল থেকে চোখ বের ক'রে অচেনা লোকটিকে দেখে নিলে।

'মাদাম এসেছেন,' মিচুক্কো তাকে আর-একবার খবরটা জানিয়ে দিলে। দোরিনা হঠাৎ যেন জেগে উঠে বললে, 'খাই—।' শালটা দরজার পিছনে ছুঁড়ে ফেলে সে তার বিপুল দেহটিকে দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে চললো।

একে তো বাটলার তাকে ওখানেই বসিয়ে রেখে গেলো, তার উপর সেই কলপ-মাখা বিকট মূর্তি! মিচুক্কোর এতক্ষণের প্রতীক্ষা হঠাৎ যন্ত্রণাময় আশঙ্কায় পরিণত হলো। ধ'রা-খাসির কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেলো—'খাবার ঘরে! দোরিনা খাবার ঘরে!' একটু পরে বাটলার আর

সোফিয়া খুড়ি-খুড়ি নরম ফুল হাতে নিয়ে তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ওদিককার ঘরে, দরজা দিয়ে মাথা বের ক'রে সে সেদিকে তাকালো। লম্বা ঝুলওয়ালা কালো সাদা কোর্তায় অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁদের কথাবার্তা গোলমালের মতো শোনাচ্ছে। দৃষ্টি অস্পষ্ট হ'য়ে এলো তার। তার হৃদয় যত উদ্বেল, তার মন ততই বিস্ময়-বিমূঢ়—সে বুঝতেও পারেনি কখন তার চোখ জলে ভ'রে গেছে। একটি দীর্ঘ উচ্চহাসি তার বুকের মধ্যে ব্যথার মতো এসে লাগলো—অন্ধকারে চোখ বুজে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে যেন সেই আঘাত সামলে নিলে। কার হাসি? ডেরেসিনার? হা ঈশ্বর! ওখানে, ও-ঘরে ব'সে অমন ক'রে সে হাসছে কেন?

একটা চাপা চীৎকার শুনে সে চোখ খুললো। তার সামনে মার্থা-মাসি দাঁড়িয়ে। তাকে আর চেনা যায় না। মাথার টুপি সে এখনো খোলে নি, দামি মখমলের ক্লোকটির ভারে যেন নুয়ে পড়েছে। এ কী হতচ্ছাড়া বুড়ির মতো চেহারা হয়েছে তার।

'মিচুক্কো! তুমি!'

মিচুক্কো প্রায় ভয় পেয়ে ব'লে উঠলো, 'মার্থা-মাসি…'

বুড়ি যেন দিশেহারা হ'য়ে বলতে লাগলো, 'কী কাণ্ড! কখন এলে তুমি? একটা খবর তো দিতে হয়! তোমার কিছু হয়নি তো? এক্ষুণি এলে? সন্ধ্যেবেলা?…তাই তো…তাই তো…'

'আমি এসেছিলাম…'কী বলবে ভেবে না পেয়ে মিচুক্কো আমতা-আমতা করতে লাগলো।

মার্থা-মাসি ব্যস্তভাবে বললো, 'তাই তো, মুশকিল হ'লো। একটু বসো তুমি—দেখছো তো কত লোকজন এসেছে—আজ ডেরেসিনার জয়ন্তী, জয়ন্তী উৎসব…একটু…একটু বোসো এখানে…'

মিচুক্কো বলতে চেষ্টা করলো, 'মাসি, তুমি…তুমি যদি বলো, আমি না

হব···চলেই যাই।' কথাগুলো তার গলায় যেন আটকে-আটকে গেলো, স্বর বন্ধ হ'য়ে এল তার।

'না, না, বোসো বোসো একটু,' মাসি তাড়াতাড়ি বললে। আসলে ভালো মানুষ বেচারা, কিন্তু কী করবে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

মিচুক্কো বললে, 'এখন···এই রাত্তিরে···কোথাও যাবার জায়গাও নেই আমার।'

দস্তানা-পরা হাতে মিচুক্কোকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে মার্থা-মাসি বেরিয়ে গেলো, তাকে খাবার ঘরে ঢুকতে দেখে মিচুক্কোর মনে হ'লো যেন একটা গহ্বরের মুখ হাঁ ক'রে তাকে গিলতে আসছে। খাবার ঘরটি হঠাৎ চুপচাপ। তারপর সে শুনতে পেলো, স্পষ্ট শুনতে পেলো ভেরেনিকার গলা, 'আমি এক্ষুণি আসছি—এক মিনিট।'

আবার দৃষ্টি অস্পষ্ট হ'লো। সে আসছে তাকে দেখবে। কিন্তু ভেরেনিকা এলো না, খাবার ঘরের কলরব নতুন ক'রে আরম্ভ হ'লো। কয়েক মিনিট পরে—মিচুক্কোর মনে হ'লো এক যুগ পরে—মার্থা-মাসি আবার এলো। এবারে তার টুপি, দস্তানা, ক্লোক, সব ছেড়ে এসেছে, অতটা দিশেহারা ভাবও আর নেই। মাসি বললে, 'এখানেই বসা যাক, কেমন? আমি বসি তোমার কাছে।···ওরা সব ডিনারে বসেছে কিনা। তুমি আমি এখানেই একটু খেয়ে নেবো···কত কথা মনে পড়ছে তোমাকে দেখে··· বিশ্বাস হচ্ছে না যে সেই তুমি আর সেই আমি···আবার একসঙ্গে··· অনেক লোকজন এসেছে ওখানে, কিছু মনে কোরো না তুমি। বোঝো তো, ইচ্ছে থাকলেও তার উপায় নেই। জীবনে ওকে উন্নতি করতে হবে তো···আর উন্নতি করতে হ'লে এ-সব হবেই। কী-সব এলাহি কাণ্ড —পড়োনি কাগজে? হৈ-চৈ লেগেই আছে। বুড়ো হাড়ে কি এত সয়। কিন্তু আমি আর ক' দিন! কী যে ভালো লাগছে তোমাকে দেখে··· বিশ্বাস হচ্ছে না।'

ঝুঁকির কানে-কানে কে যেন ব'লে দিয়েছিলো, অনর্গল ব'কে যাও, মিচুজোকে ভাবতে সময় দিয়ো না। একটানা অনেকক্ষণ বকবক ক'রে মাসি মেকআপ চুড়িতে মিচুজোর দিকে তাকিয়ে হাতে হাত ধ'রে একটু খানি হাসলো।

যোশিনা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে খাবার টেবিল সাজাতে এলো—তার এক মুহূর্ত সময় নেই, খাবার ঘরে ডিনার আরম্ভ হ'য়ে গেছে কিনা।

মুখ অন্ধকার ক'রে স্নেহনাশীর্ণ গলায় মিচুজো বললে, 'মাসি, সে কি আসবে না? একবার তার দেখা পাবো তো?'

একটু চেষ্টা ক'রে অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠে মাসি বললে, 'বাঃ, তা আসবে না! একটু একা হ'তে পারলেই আসবে—আমাকে তাই বললো তো।

এতক্ষণে যেন পরস্পরকে তারা চিনতে পারলো। সেই চেনার আলো জ্ব'লে উঠলো তাদের হাসিতে, সেই হাসিতে ভর ক'রে সব আড়ষ্টতা, সব আবেগের আন্দোলন পার হ'য়ে তাদের মন-প্রাণ পরস্পরকে স্পর্শ করলো। মিচুজো তার চোখ দিয়ে বললে, 'তুমি সেই মার্থা-মাসি তো?' আর মাসির চোখ বললে, 'আহা, এই তো আমার সেই মিচুজো!' কিন্তু মাসি তার চোখ তক্ষুনি নামিয়ে নিলে, পাছে মিচুজো সেখানে আরো কিছু পড়ে। হাতে হাত ধ'রে বললে, 'খাবে নাকি এখন?'

আহ্লাদের, সুখের স্বরে মিচুজো বললে, 'খাবো না। খিদে পেয়েছে যে!' 'আগে প্রেম বলো। এখানে, তোমার সামনে ব'সে আমার কথা বলতে লজ্জা নেই।' মাসি দুষ্টু-দুষ্টু চোখে তাকিয়ে বুকের উপর ক্রুশের চিহ্ন করতে-করতে চোখ টিপলো।

খাটলার এলো প্রথম কোর্স নিয়ে। মিচুজো তীক্ষ চোখে লক্ষ্য করলো, দেখলো, মাসি কেমন ক'রে খাবারটা তুলে নেয়। কিন্তু নিজে নিতে গিয়ে মনে পড়লো যে অতটা পথ ট্রেনে আসার পর তার হাত এখনো

নোংরো। লজ্জায় লাল হ'য়ে বাটলারের দিকে চোখ তুললো, বাটলার—তার ভঙ্গি এখন বিনয়বিগলিত—মাথা নিচু ক'রে একটু হাসলো, ভাবখানা এইরকম, 'আজ্ঞে যা ইচ্ছা তুলে নিন।' ভাগ্যিস মাসি তাকে উদ্ধার করলে, নয়তো কী উপায় হ'তো। 'মিচুজো, আমি তোমাকে দিচ্ছি।' কৃতজ্ঞতায় তার মনে হ'লো মাসিকে চুমু খায়।

তার পাতে যেই খাবার দেওয়া হ'লো আর বাটলারও বেরিয়ে গেলো, সে তক্ষুনি খুব তাড়াতাড়িতে একবার ক্রুশচিহ্ন ক'রে নিলে। মাসি খুশি হ'য়ে বললে, 'লক্ষ্মী ছেলে।'

এবারে সে সহজ হ'লো, মনটা ভারি ভালো লাগলো তার। বাটলারের কথা, নিজের নোংরা হাতের কথা আর একবারও না-ভেবে সে এমন ভাবে খেতে আরম্ভ করলো যেন জীবনে এর আগে সে কখনো খাবার ছাখেনি। তবু, যখনি বাটলার এ-ঘর ও-ঘর আসা যাওয়া করতে-করতে কাচের দরজাটি খুলেছে, যখনি ও-ঘর থেকে হাসি আর কথার উচ্ছ্বসিত অস্পষ্ট ঢেউ তার কানে এসে লেগেছে, তখনি সংশয়-ভরা দৃষ্টিতে মাসির সস্নেহ চোখের দিকে সে তাকিয়েছে—ওখানে কি লেখা আছে তার প্রশ্নের উত্তর? না, তা তো নেই, বরং মাসির চোখে সে যেন এ-কথাই পড়েছে, 'লক্ষ্মী ছেলে, এখন কিছু জিগগেস কোরো না—বোঝাপড়া পরে হবে।' তারপর দু'জনেই একটু হেসে আবার খেতে আরম্ভ করেছে। কত কথা তাদের। দেশের কথা, দেশের লোকদের কথা—মাসি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কত যে জিগগেস করতে লাগলো তার আর অন্ত নেই।

'একটা ড্রিঙ্ক নাও, মিচুজো।'

মিচুজো বোতলটার দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু সেই মুহূর্তে খাবার ঘরের দরজা আবার খুলে গেলো: খসখসে রেশমি আওয়াজ, দ্রুত পদশব্দ, একটু আন্দোলন, একটু বিদ্যুৎ-চমক, ছোট্ট ঘরটি যেন হঠাৎ আলো হ'য়ে উঠে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

'তেরেসিনা'

চরম বিস্ময়ে তার মুখের কথা ঠোঁটের উপর মিলিয়ে গেলো। এ কী? এ কি স্বপ্ন!

যেন একটা মূর্ছার মধ্যে সে তাকিয়ে রইলো হাঁ ক'রে। তার মুখ জ্বালা করছে, তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। এ কি সেই? এই তেরেসিনা এই রকম? তার বুক নয়, তার কাঁধ নয়, তার হাত নয়··· চিকচিক করছে সাটিন, ঝলমল করছে হীরে। এ কি সত্যিকার মানুষ, এ কি সত্যি?···কী বলছে সে? এই স্বরের কিছুই তার চেনা নয়, না চোখ, না হাসি, না কণ্ঠস্বর। 'কেমন আছো, মিচুচ্চো? তোমার না অসুখ করেছিলো—এখন বেশ সেরে উঠেছো তো? বেশ, বেশ।···আচ্ছা, আবার দেখা হবে। এই তো মা রইলেন তোমার কাছে। ঠিক আছে?' বলতে-বলতে তেরেসিনা ছুটে আবার খাবার ঘরে চলে গেলো।

মার্থা-মাসি মিচুচ্চোকে তার বিমূঢ়তা থেকে টেনে তোলবার চে[ষ্টা] করলো।—'মিচুচ্চো আর খাচ্ছো না যে?'

মিচুচ্চো তার দিকে ফিরেও তাকালো না।

মাসি থালার দিকে দেখিয়ে জোর করলে, 'খাও।'

মিচুচ্চো তার নোংরা কুঁচকোনো কলারের মধ্যে দু' আঙুল চালিয়ে দিয়ে গভীর নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করলে।···'খাবো?' তার থুতনির কাছে আঙুল দিয়ে কয়েকবার নাড়লো, যেন বলতে চায়, 'আর না—সত্যি আর খেতে পারবো না।' স্তব্ধ হ'য়ে সে ব'সে রইলো, দু' [illegible] কয়েক মিনিট আগেকার দেখা স্বপ্নে মগ্ন। তারপর অস্ফুটে বললে, 'কী হয়েছে ও? কী হয়েছে?···'

তার চোখে পড়লো যে মার্থা-মাসি অত্যন্ত হতাশভাবে মাথা নাড়ছে, সে-ও আর খাচ্ছে না, অপেক্ষা করছে যেন।

'আর তো হবে না···না, অসম্ভব,' চোখ বুজে প্রায় নিজের মনে-মনেই

মিচুক্তো আবার বললে।

বোজা চোখের অন্ধকারে সে দেখতে পেলো তার আর তেরেসিনার মাঝখানে অতল গহ্বর। না, না, এ তো সে নয়, তার তেরেসিনা তো এ নয়। সব চুকে গেছে—অনেক, অনেকদিন আগেই।

অনেক, অনেকদিন আগে—আর সে কিনা বুঝতে পারলো এইমাত্র। বাড়ির লোক তাকে এ-কথাই তো বলেছে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। বোকা! বোকা!···আর এখন—এখনই বা এই বাড়িতে নির্বোধের মতো সে ব'সে আছে কেন? যদি ও-সব ভদ্রলোকেরা জানতেন, যদি বাটলারটাও জানতো যে সে, মিচুক্তো বোনাভিনো, দেহের প্রতিটি স্নায়ু জয় ক'রে ছত্রিশ ঘণ্টা ট্রেনে চ'ড়ে অত দূর থেকে এখানে এসেছে, এসেছে এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে যে এখনো সে তার সেই স্বপ্নরূপিনীর ভাবী স্বামী, তাহ'লে ঐ ভদ্রলোকেরা, ঐ বাটলারটা, ঐ বাবুর্চি, দয়, দোরিনা—এদের সকলেরই মুখে হো-হো-হো-হো হাসি কি সহজে থামতো! কী হাসি, কী হাসির উল্লাস, যদি তেরেসিনা তাকে ধ'রে নিয়ে যেতো ঐ খাবার ঘরে, ভদ্রলোকদের সামনে, নিয়ে গিয়ে বলতো, 'দেখুন আপনারা, এই গোবেচারা ছোট্ট মানুষটি, এই বাঁশিওলা—সে আমাকে বিয়ে করতে চায়।' সত্য, তেরেসিনা নিজেই কথা দিয়েছিলো, কিন্তু তখন তো ভাবাও যায়নি যে সে-মেয়ে একদিন এ-ই হবে! এ-কথাও সত্য যে তেরেসিনার এই জীবন মিচুক্তোর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে, এখানে পৌঁছবার পাথেয় সে-ই জুগিয়েছিল—কিন্তু তেরেসিনা কত দূরে, কত দূরে চলে এসেছে, আর সে পড়ে আছে সেখানেই, ঠিক সেই আগের মতোই, রবিবারে পার্কে ব'সে এখনো সে বাঁশি বাজায়। আর কি তার কাছে পৌঁছবার তার উপায় আছে? না, সে-কথাই আর ওঠে না। আর এই যে তেরেসিনা আজ একজন জমকালো ভদ্রমহিলা হয়েছে, তার কাছে তার সেই সামান্য টাকা ক'টা কী? কেউ মনে করেনি তো সেই

নগণ্য টাকা ক'টার বিনিময়ে আজ সে কোনো দাবি জানাতে এসেছে? ছি, ছি, কী লজ্জা! কী লজ্জা! তার মনে পড়লো তার অসুখের সময় তেরেসিনা যে-টাকা পাঠিয়েছিলো সেটা তার পকেটেই আছে। লাল হয়ে উঠলো তার মুখ, লজ্জায় সে যেন ম'রে যাবে। উঁচু-হ'য়ে-ওঠা বুক-পকেটে এক হাত ঢুকিয়ে সে বললে, 'মাসি, সেই যে তুমি আমাকে টাকা পাঠিয়েছিলে, সেটা ফেরৎ দিতেও এসেছিলাম আমি। কেন পাঠিয়েছিলে বলো তো? প্রতিদান? ঋণশোধ? তেরেসিনা তো এখন···এখন তো সে একজন "স্টার"···আমার মনে হয়··না, কিছু না, অসম্ভব! কিন্তু এই টাকাটা—এই টাকাটা কেন—কোন অপরাধে আমার এই শাস্তি? ও-সব চুকে গেছে, ও-বিষয়ে আর একটি কথা না···কিন্তু এই টাকাটা তুমি রেখে দাও, মাসি—সব নেই, কিছু কম আছে, এই আমার যা দুঃখ!'

'কী বলছো তুমি বাছা?' জল-ভরা চোখে মার্থা-মাসি তার কথায় বাধা দেবার চেষ্টা করলো। ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে ব'লে নিচুচ্চো বলতে লাগলো, 'ওটা আমি খরচ করিনি, মাসি। আমার অসুখের মধ্যে আমার আত্মীয়েরা···আমি কিছুই জানতুম না। কিছু কমই রইলো, আমিও তো ওর পিছনে অল্প-সল্প কিছু খরচ করেছিলাম।···ঠিক আছে তা হ'লে?···টাকাটা নাও, মাসি, আমি চললাম।'

'সে কী! এক্ষুণি!' মাসি তাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'একটু বোসো—তেরেসিনার সঙ্গে কথা ব'লে যাও। তোমার সঙ্গে আবার দেখা করবার তার কত ইচ্ছে, বুঝলে না? বোসো তুমি, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

নিচুচ্চো দৃঢ়ভাবে জবাব দিলে, 'না—কী হবে আর। ওখানে ঐ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আছে, ওখানেই থাক, ওখানেই মানায় ওকে। আমি হতভাগা···থাক, ওকে চোখে দেখেছি, সেটুকুই আমার যথেষ্ট, ···বেশ, বেশ, যেতে চাও তো তুমিও যাও, মাসি, তুমিও যাও ওখানে,

সে-ব'সে তাদের হাসি শোনো সে।…আমি ওদের হাসি ঠাট্টার পাত্র হতে চাই না—আমি চললুম।'

মিচুজ্জোর এই আকস্মিক দৃঢ় সংকল্পের সব চেয়ে খারাপ অর্থটিই মালির মনে উদয় হ'লো। মালি ভাবলে যে মিচুজ্জোর এটা ঈর্ষার ভঙ্গি, শোর যন্ত্রণা। সম্প্রতি তার মনে হচ্ছিলো যে তার মেয়েকে দেখে য-কোনো লোক তক্ষুনি ভাববে…যা ভাববে তা মুখে আনা যায় না। এইজন্যেই মালির চোখের জল আজকাল আর শুকোয় না—এত ঐশ্বর্য, এত সমারোহের ভিতরে তার দুঃখের বোঝা অবিশ্রান্ত বহন করে চলেছে সে। ঐশ্বর্য! অথচ এই ঐশ্বর্য—এতে তার বার্ধক্য অভদ্র, অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে উঠলো!

মালি ব'লে ফেললো, 'মেয়েকে আমি তো আর সামলাতে পারি না, মিচুজ্জো।'

'কেন পারো না?' জিগগেস ক'রেই মিচুজ্জো মালির চোখে প্রশ্নের উত্তর দেখতে পেলো। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্তও এ-সন্দেহ তার মনে আসেনি। মুখ কালো হ'লো তা'র। ও, তাই!

মালি যেন আরো ছোট্ট হ'য়ে, আরো বুড়ো হ'য়ে নিজের দুঃখের অতলে তলিয়ে গেলো। দু' হাতে সে মুখ ঢেকে আছে, আঙুলগুলো থর-থর ক'রে কাঁপছে, চোখের জল কিছুতেই আর সামলাতে পারছে না।

কাঁদতে-কাঁদতে মালি বললে, 'তা-ই ভালো বাছা, তা-ই ভালো। তুমি চ'লে যাও। ঠিক বলেছো তুমি, ও আর তোমার নয়। তখন যদি আমার কথা শুনতে তাহ'লে আর…'

'তখন!'

মিচুজ্জো নিচু হয়ে মালির মুখ থেকে জোর ক'রে একখানা হাত সরিয়ে নিলে। কিন্তু সে মুখে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা—ঠোঁটের উপর একটি

আঙুল রেখে, এমন করুণ অসহায় চোখে মাসি তার দিকে তাকিয়ে যেন তার দয়াভিক্ষা করলো যে মিচুকো নিজেকে সংযত ক'রে কঠিন চেষ্টায় কণ্ঠস্বর নরম করলো, অন্য রকম সুরে বললে, 'মাসি, আমি যেমন অপদার্থ, তুমি…তুমিও তা হ'লে তেমনি?…কিন্তু থাকগে ও-সব, আমি এখন চলি…এখন তো আরো বেশি আমার চলে যাওয়ার দরকার।…মাসি আমি একটা মূর্খ, কিছুই বুঝিনি। কেঁদো না, মাসি, কেঁদে কী হবে। টাকা…লোকে ঠিকই বলে…টাকা…'

ছোট্ট আটাচেশ কেস আর ব্যাগটি টেবিলের তলা থেকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় তার মনে পড়লো যে ব্যাগের মধ্যে ভ'রে কয়েকটা কমলালেবু তেরোসিমার জন্য সে দেশ থেকে এনেছিলো।

'শোনো, মাসি—'

ব্যাগের মুখ খুলে ছপছি টাটকা ফলগুলি সে টেবিলের উপর ঢাললো। 'ওখানে যারা এসেছে তাদের মুখের উপর এই ফলগুলি যদি ছুঁড়ে মারি, তাহ'লে কেমন হয়?'

'পাগল নাকি!' মাসি ফোঁপফোঁপ করতে-করতে আর-একবার তাকে শান্ত হ'তে বললো।

তিক্ত হেসে মিচুকো শূন্য ব্যাগটি তার পকেটে ভ'রে রাখলো।— 'বেশ, ছুঁড়বো না। এগুলি ওর জন্যেই এনেছিলাম, এখন তোমাকেই সব দিয়ে যাচ্ছি, মাসি।' একটা লেবু তুলে নিয়ে মাসির নাকের কাছে ধরলো। 'কেমন গন্ধ, মাসি! আমাদের দেশের মিষ্টি গন্ধটুকু পাচ্ছো কি? এর জন্যে আমাকে আবার কাস্টম্‌স্‌-এর ট্যাক্সও দিতে হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! আর না! মনে রেখো, এ শুধু তোমাকেই দিয়ে গেলাম!…আর ওকে, ওকে আমার শুভ-কামনা জানিয়ো!'

আটাচেশ কেসটি তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো, কিন্তু সিঁড়িতে এসেই

দারুণ একটা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। দেশ থেকে অনেক দূরে, মস্ত অচেনা শহরে সে একা, সে পরিত্যক্ত—এদিকে রাত গভীর হ'য়ে আসছে। মোহ ছুটেছে তার, মান লুটিয়েছে ধুলোয়, সে পদচ্যুত, সে অবজ্ঞাত। বাইরের দরজার কাছে এসে দেখলো অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে অচেনা রাস্তায় পা বাড়াবার সাহস তার হ'লো না। পা টিপে-টিপে ফিরে এলো, এক প্রস্থ সিঁড়ি উঠে এসে উপরের ধাপে ব'সে হাঁটুতে কনুই আর হাতে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। বিদায় হ'য়ে যাবার পর, পিনা মার্নিস আবার সেই ছোট্ট ঘরটিতে এলো। দেখলো তার মা একা ব'সে-ব'সে কাঁদছে, এদিকে ওরা সবাই হাসি-গল্প-ঠাট্টায় মশগুল। অবাক হ'য়ে বললে, 'ও কোথায়? চলে গেছে?' মাসি মেয়ের দিকে না-তাকিয়ে শুধু একটু মাথা নাড়লো। পিনা দূরের দিকে তাকিয়ে গভীর একটি নিশ্বাস ছেড়ে অস্ফুটে বললে, 'বেচারা! বেচারা!…' কিন্তু একটু পরেই তার মুখের ভাব বদলে গেলো।

চোখের জল লুকোবার কোনো চেষ্টা না-ক'রে মাসি বললে, 'এই দ্যাখ, এগুলো সে তোর জন্তে এনেছিলো।'

পিনা লাফিয়ে উঠে বললে, 'ট্যাঞ্জারিন লেবু! সিসিলির ট্যাঞ্জারিন! কী সুন্দর!' দু'হাত ভ'রে যে-ক'টা সম্ভব চটপট সে তুলে নিলো।

মাসি আর্তস্বরে বললে, 'এগুলো ওখানে নিসনে, ওখানে নিসনে।' কিন্তু পিনা একটুখানি কাঁধ-বেঁকে ছুটে খাবার ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'কমলালেবু! ট্যাঞ্জারিন লেবু! সিসিলির ট্যাঞ্জারিন!'

—বুদ্ধদেব বসু

কর্তব্যের আহ্বান

পিয়াৎসা মাজিনার উপর সারোপুলেৎসোর ওষুধের দোকান। দোকানের বাইরে একটি টুল পাতা। পাওলিনো দোজিকো টুলটার উপর ধপ করে বসে পড়ল। গরমে মুখ তার লাল, টস্ টস্ করে মাথার ঘাম গালের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। রুমালে ঘাম মুছে দোকানের দিকে তাকিয়ে পাওলিনো সারোপুলেৎসোকে জিগগেস করল :

'দোকানে এসে কেউ আবার বেরিয়ে গেছে না কি?'

'কে, পিপি? না তো, এই এল বলে। কেন?'

'কেন আবার কী? ওকে আমার দরকার, তাই। কেন? ওঁর কাছে আমার এখন জবাব দিহি করতে হবে।'

ঘামে ভেজা রুমালটা মাথার ওপর বিছিয়ে দিয়ে, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পাওলিনো ঝুঁকে বসল। গালে হাত দিয়ে মলিন মুখে একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

পিয়াৎসা মাজিনায় সবাই ওকে চেনে। কিছুক্ষণ পরে একটি পরিচিত লোক ও রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জিগগেস করল—

'এই যে পাওলি যে!'

একটিবার চোখ তুলেই পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে পাওলিনো বিড়বিড় করে বলল—

'থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমায় বিরক্ত করতে হবে না।'

আরেকজন যেতে যেতে বলে—

'পাওলি যে! কী ব্যাপার?'

এবার লোডিকো বাবার উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে, টুলের উপর ঘুরে বসে, আর দোকানের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

'শরীরটা ভালো নেই না কি?' সারো পুলেৎসো ভেতর থেকে প্রশ্ন করে। আচমকা দোকানের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পাওলিনো হাঁপাতে থাকে।

'জাহান্নামে যাও, মরণ হয় না। আমার শরীর ভালো কি মন্দ তোর তাতে কী বাপু। আমি কি তোকে শুধোতে যাই তোর অসুখ করেছে কিনা, কী ব্যাধো, কদ্দিনের ব্যামো? লোকটাকে একদণ্ড চুপচাপ থাকতে দেনা বাবা।'

'বাব্বাঃ, কী মেজাজ,' সারো বলে, 'কথায় কথায় ক্ষেপে ওঠে! পিপির খোঁজ করছিলে তাইতো ভাবলুম...'

মুখ ভেঙচিয়ে গলা কাটিয়ে চিৎকার করে লোডিকো বলে, 'কেন রে বাপু, আমি ছাড়া জগতে আর কারু অসুখ হতে নেই বুঝি? বলি বলি আমার কুকুরের জেলখানি শুরু হয়েছে, আমার মুরগির হাঁপানি... নিজের কাজটি নিয়ে করোতো বাবা, পরের কথায় তোমাকে থাকতে হবে না।'

সারো হাসতে হাসতে বলে, 'এই যে পিপি এসে গেছে।'

পিপি পুলেৎসো ব্যস্তভাবে দোকানের মধ্যে ঢুকে সোজা চিঠির বাক্স খুলে দেখতে লাগল জরুরি চিঠি কিছু আছে কি না।

'এই যে পাওলি।'

প্রতি-অভিবাদন না করেই পাওলিনো জিগগেস করল, 'খুব যে ব্যস্ত দেখছি!'

ডাক্তার পিপি পুলেৎসো দুঃখের সঙ্গে বলে, 'নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই ভাই।' টুপিটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে রুমাল ঘুরিয়ে হাওয়া করতে থাকে। 'মুহূর্ত জিরোবার উপায় নেই, সারাক্ষণ কাজ আর কাজ।'

রাগে ঠোঁট বেঁকিয়ে, ঘুঁষি পাকিয়ে পাওলিনো বলে, 'তা তো বলবেই। মড়ক লেগেছে, দেশ উজাড়। অসুখটা কী শুনি? কলেরা? প্লেগ? ক্যান্সারে তোমার রুগীগুলো টপাটপ মারা যাচ্ছে? মড়ক তো! আমি এদিকে বেঁচে মরে আছি—আমার বেলা কি করছ শুনি? আমার কথাটা আগে-ভাগে তোমায় শুনতেই হবে।...বলি ও সারো, হাঁ করে শুনছিস কী রে? তোর শুধু দাঁড়াবার কাজ নেই বুঝি?'

'নাইবা থাকল তাতে তোমার কি?'

পিপি পুলেথেনোর হাত ধরে ওকে প্রায় টেনে দোকানের বাইরে এনে লোডোভিকো বললে, 'ওখানে কথা হবে না, চল অন্য কোথাও যাই।'

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পিপি জিগগেস করল, 'কথাটা খুব লম্বা নয় তো?'

'হুঁ, অনেক কথা আছে।'

'তাহ'লে ব'লে যাবি ভাই, আমার হাতে সময় খুবই অল্প।'

'তাতো বললেই সময় নেই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কী করব জানো? ট্রামের তলায় পড়ব, নিজের পা-টি ভাঙবো, অর্ধেক দিন তা হ'লে বাধ্য হয়ে আমায় হেকাজত করতে হবে।...রুগী কোথায়?'

'এই এইখানেই। ভিয়া বুস্তেরার উপর বাড়ি।'

লোডোভিকো বললো, 'চলো সেখানে। তুমি উপরে গিয়ে রুগী দেখে এস, আমি নিচের তলায় তোমার জন্য বসে থাকব। তোমার কাজ সারা হয়ে গেলে বেশ আলাপ করা যাবে।'

ডাক্তার অবাক হয়ে রাস্তায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে তাকিয়ে বললে, 'আচ্ছা, ব্যাপারখানা কী বলো তো?'

একটা দারুণ হতাশার ভঙ্গী করে হাতের ঝোলা উল্টে প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাবে পাওলিনো বললে, 'পিপি ভাই, এবার আমার রক্ষে নেই।' সত্যই ওর চোখ জলে ভরে এল।

ডাক্তার বললে, 'কী হয়েছে খোলা বলেই ফেল না। দাঁড়িয়ে পড়লে

কেন, চমকে উঠছ কেন। কী ব্যাপার ঠিক করে বলো তো?' কয়েক পা এগিয়ে আবার ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে পাওলিনো গভীর রহস্যের সুরে বলল, 'দেখো ভাই, বন্ধুভাবে বলছি। তা না হ'লে একটি কথাও বলতাম না। আর তা ছাড়া ডাক্তারের কাছে তো পেট খোলসা করে সব কথা বলা চলে কেমন কি না?'

'তা তো বটেই। কতরকম অসুখ বিসুখের কথা লোকে বিশ্বাস করে আমাদের কাছে বলে—সব গোপন রাখতে হয়।'

'বেশ তাহ'লে ভাই আমার কথাটা তোমাকে বলি। খবরদার কাকপক্ষীও যেন না জানতে পারে।'

থুঁতির ওপর একটি হাত রেখে গম্ভীরভাবে পাওলিনো বলল, 'যাকে বলে একেবারে পাথরের মতো নিস্তব্ধ কেমন?' চোখ দুটো বড় বড় করে ফিগির কানে কানে পাওলিনো বলল, 'জানো পেত্তোর দু-দুটো সংসার।'

ফিগি অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, 'পেত্তো? সে আবার কে?'

লাভিকো চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে তাও জানো না, ক্যাপ্টেন পেত্তো—সেই যে জেনারেল স্টীম-শিপ্ কোম্পানিতে…'

ডাক্তার পুলেৎসো বলল, 'মানুষটাকে চিনি না তো।'

'চেনো না তাকে? বেশ কথা—তাহ'লে তো ভালোই হ'ল। কিন্তু চেনো বা না চেনো, লোকটি নষ্ট। একেবারে পাথরের মতো চুপ…'

পাওলিনোর গলা ধরে উঠল, করুণভাবে বলল, 'দু-দুটো সংসার ভাই, দু-দুটো? একটি এখানে আর একটা নেপল্‌সে।'

'তারপর?'

'উঃ, কথাটা বুঝি খুব ফেলনা হ'ল?' হঠাৎ রাগে মুখ চোখ পাকিয়ে পাওলিনো লোডিকো জিগ্যেস করল, 'বিয়ে করা স্ত্রীকে ফেলে কাপ্তেন টা আর একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘরবাস করছে—সেটা বুঝি কিছু

নয়। হা ভগবান, এরকম অন্যায় কাজ ভদ্রলোকে করে! এ করে তো মেজররা!'

'মেজররাই করে বটে! কিন্তু আমি জানতে চাই এতে তোমার কি এল গেল? এত মাথাব্যথা কেন?'

'আমার কি এল গেল! মাথাব্যথা কেন!'

'হ্যাঁ, এতে রাগ করার কি আছে? পেত্তোভার স্ত্রী তোমার কিছু হয় নাকি?'

রেগে চোখ লাল করে লোভিকো বল্‌ল, 'নাই বা হ'ল। সে বেচারী ভারী কষ্টে পড়েছে জানো? বড় ঘরের মেয়ে, তাকে নির্লজ্জ স্বামীটা কী রকম প্রতারণা করছে জানো? ওর আত্মীয় নাই বা হলুম। এ সব অন্যায় দেখে রাগে সর্ব শরীর জ্বলে যায় না?'

কাঁধের একটা ভঙ্গী করে পিপি পুলেৎসো জিগগেস করল, 'তা না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু আমি কি করতে পারি এতে?'

লোভিকো কোঁস করে বলে উঠল, 'সে কথা আবার বলতে দিচ্ছ কই! নিপাত যাক হতভাগা! কি বিশ্রী গরম দেখছ? গরমে শরীরটা কুটিকাটা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কী বলছিলুম শোনো এখন···এই যে পেত্তোভার কথা বলছিলুম—ভদ্রলোকটি কেবল যে তার স্ত্রীকে ঠকিয়েছে তা নয়। শুনছি দেশমুলুকে তার তিন চারটে ছেলে আর এখানে কেবল একটি সবে ধন নীলমণি। হতভাগা ওর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে না। ও-পক্ষের ছেলেপুলেগুলো আছে তো, তাই ওদের সম্বন্ধে পেত্তোভার কোনো দুর্ভাবনা নেই, ইচ্ছে হ'লেই ত্যাগ করতে পারে। এখানে তো আর সেটি হতে পারবে না। এ-পক্ষে ছেলে হ'লে আইনত তাকে স্বীকার করে নিতে, তার ভরণপোষণ করতে ও বাধ্য। ব্যাপারটা কী করে জানো? আজ প্রায় বছর দুই হয়ে গেল এখানে জাহাজ ভিড়লেই ও সেই দিনই কোনো সামান্য ছুতোয় স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছে করে ঝগড়া

বাবার। তারপর রাত্তির হ'লে নিজের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে একা একা শুয়ে থাকে। পরদিন জাহাজ ছাড়ে, আর এ-পক্ষের যত সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে পেড্রো চলে যায়। একদিন নয় দু'দিন নয়, আজ দু'বছর হ'ল এই রকম চলছে।'

দিদি পুলেৎসোর দুঃখও হয়, হাসিও পায়। বলে, 'আহা বেচারী! আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না—আমি…'

গলার সুরটা নরম করে বন্ধুর হাত ধরে লোভিকো বলে, 'ভাই দিদি, আজ মাস-চারেক হ'ল আমি ঐ ছেলেটিকে—পেড্রোর ছেলেকে—ল্যাটিন পড়াচ্ছি। দশ বছর বয়স, প্রথম বর্গে পড়ে।'

ডাক্তার বল্লেন, 'ও!'

'ভদ্রমহিলার জন্য আমার কি দুঃখ হয় তুমি যদি জানতে? বেচারী কি কান্নাটাই না কাঁদে! যেমনি লক্ষ্মী তেমনি রূপসী! আর কুৎসিত হ'লেও বা একটা কথা ছিল…সত্যি সে ভারী সুন্দর দেখতে। ভেবে দেখ কেমন লাগে, যখন দেখি বেচারীকে ঘরের এক পাশে ফেলে রেখেছে। আমি জানতে চাই কে এমন ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করতো—অন্য মেয়ে হ'লে এতদিন একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিত। ওকে দোষ দেওয়া যায় না। ও এত ভদ্র—এত ভালোমানুষ! ওকে তাই যে করে হোক বাঁচাতেই হবে। বুঝলে তো? ও বেচারী এখন কী মুশকিলেই পড়েছে—যাকে বলে গিয়ে বিপদ—রীতিমতো বিপদ!'

দিদি পুলেৎসো হঠাৎ দাঁড়িয়ে, কড়া চোখে লোভিকোর দিকে তাকান, বল্লেন, 'না, না, ভাই, ও সব কাজ আমার দ্বারা হবে না। আইনের প্যাঁচে আমি পড়তে রাজি নই।'

'আহাম্মক কোথাকার, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, শেষকালে তুমি এই বুঝলে? আমাকে ভেবেছো কী? আমি কি কুচক্রী? তুমি কি ভাবছিলে তোমাকে দিয়ে…ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ভাবতেও ঘেন্না হয়।'

'তাহ'লে আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও শুনি, বুঝিয়েই বলো—' ডাক্তার পুলেৎসো অধীর হয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন।

'যা হওয়া উচিত আমি তাই শুধু চাই।' পাওলিনো লোভিকো উল্টে ফেল্লেন, 'আমি চাই যে পেত্তেল্লা যেন একটি অজগোত্রের স্বামী হয় আর যেন বাড়ি এসে ওর স্ত্রীর একেবারে মুখের সামনে ধড়াম করে শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে না দেয়।' দিদি পুলেৎসো হো হো করে হেসে উঠলেন, 'কি—কি—কি বললে? কি বলছ···হাঃ হাঃ হাঃ··· পেত্তেল্লাকে নিয়ে কি করবো—পেত্তেল্লাকে নিয়ে···ঘোড়াকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব জল খাওয়াতে—হাঃ হাঃ হাঃ···'

পাওলিনো লোভিকো উত্তেজিত হয়ে, ঘুঁষি পাকিয়ে বল্লেন, 'তা হাসবে বই কী ছোটলোক কোথাকার, এদিকে একজনের সর্বনাশ হতে চলেছে আর তুমি হাসছো—বদমাশ বেটা তার সামাজিক কর্তব্য করবে না—আর তুমি ঠাট্টা করছো—একটি মেয়ের আত্মসম্মান এমন কি তার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন—আর তুমি তা নিয়ে তামাশা করছো! আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমি তো একরকম মরেই আছি। এ বিপদ থেকে যদি না উদ্ধার করো, তাহ'লে আমি সমুদ্রের জলে ডুবে আত্মহত্যা করবো—জেনে রাখ।'

হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে পুলেৎসো বল্লেন, 'আমি কী করতে পারি?' এবার পাওলিনো লোভিকো একেবারে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল—ডাক্তারের হাতটা শক্ত করে ধরে বিষণ্ণভাবে বলতে লাগল—'ব্যাপার কী জান? পেত্তেল্লা আজ সন্ধ্যেবেলা এসে আবার কালকেই আর এক মাসের জন্য বেরিয়ে পড়বে—ওর জাহাজ যাচ্ছে স্মার্ণা। দেরি করলে চলবে না, আজই সব ব্যবস্থা করতে হবে, তা নইলে আর হবে না। দোহাই, দিদি আমাকে বাঁচাও—ঐ দুঃখিনীকে রক্ষা করো। একটা পথ তুমি নিশ্চয়ই বাৎলে দিতে পারবে—একটা

কোনো উপায়···খবরদার, হেসোনা বলছি, গলাটা চিপে দেবোনা !··· আরে আরে আমি কি তাই বলছি—হাসো, হাসো, যত পারো হাসো, আমার অবস্থাটা দেখে হাসি তো পাবেই—কিন্তু একটা উপায় তোমাকে বার করতেই হবে—একটা কোনো ওষুধ।'

ইতিমধ্যে পিপি পুলোৎসো তিন্না বুতেরার উপর সেই বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছে—কোনো রকমে হাসি চেপে সে বললে, 'অর্থাৎ কি না তুমি চাও যে আজ রাত্তিরটায় ক্যাপটেন তার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো অছিলায় ঝগড়া না বাধাতে পারে। এই তো ?'

'ঠিক বলেছো···।'

'আচ্ছা শোনো, আমি এখন ওপরে যাচ্ছি। তুমি সোজা সারোর ওষুধের দোকানে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি শিগগিরই ফিরছি।'

'কিন্তু তোমার মতলবটা কী বলতো ?'

'সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি সারোর ওখানে অপেক্ষা করোগে।'

'আচ্ছা, চটপট চলে এসো ভাই'—অনুনয়ের সুরে লোভিকো বললে।

সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়। কী একটা অহেতুক ইচ্ছা পাওলিনোকে টেনে নিয়ে চললে জেটির দিকে—যেখানে পেত্তেরার জাহাজ 'সেক্সতা' এসে ভিড়বে। পেত্তেরাকে ওর দেখা চাই, দূর থেকে হ'লেও ক্ষতি নেই। কেবল চোখে দেখা, আর ওকে উদ্দেশ করে গালাগাল দেওয়া —এ দুটো কাজ ওকে যেন করতেই হবে। সারাদিন ও যে উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়েছে ডাক্তার পুলোৎসোর সাহায্য পেয়ে ভেবেছিল সে বোধটা কেটে যাবে। কিন্তু বৃথা আশা। গিনোরা পেত্তেরার হাতে পাওলিনো কবিরাজের ওষুধ পৌঁছে দিয়েছে। মিষ্টি জিনিসে ক্যাপটেনের

ক্ষতি আছে জেনে ডাক্তার একটা লোশন তৈরি করে দিয়েছে। মিলো-
রার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও এদিক ওদিক পথঘাটগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
এদিকে ওর মানসিক উদ্বেগ বেড়েই চলেছে।

সন্ধ্যা হ'ল। বাড়ি ফেরার নাম নেই। ঘুম ঘুলোয় গেছে। ঘুরছে
তো ঘুরছেই। ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি ধরে গেল। মেজাজ বিগড়ে গেছে
এমন যে লোজিকোর নিজেরই ভয় হচ্ছিল পাছে কারু সঙ্গে ঝগড়া
বেধে যায়। বন্ধুবান্ধবের তো কমতি নেই, তাদের মধ্যে কেউ যদি বা
বেফাঁস কথা বলে ফেলে? বেচারার মনটা বড় সাদা, সেই তো মুশ-
কিল। কোনো কথা চেপে রাখতে পারে না, তাই ওর বন্ধুরা ওকে নিয়ে
সারাক্ষণ মজা করে। ওরা নিজেরা সব চালাক লোক, ভদ্রতার মিথ্যা
মুখোশের তলায় মনের কথা দিব্যি চাপা দিতে পারে। মানুষের গভীর-
তম অনুভূতি, এমনকি গভীরতম বেদনার নিরাবরণ প্রকাশকে ঠাট্টার
বিষয় করে তুলতে ওদের বাধেনা। হয়তো ওদের জীবনে কখনো এই
জাতীয় অভিজ্ঞতা ঘটেনি অথবা ওদের প্রকৃতি এমনি স্থূল যে পাওলিনোর
মতো সাদাসিধে স্বভাব বোঝবার ক্ষমতাটাই ওরা হারিয়ে ফেলেছে।

বাড়ি ফিরে এসেই ও সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল, কাপড়জামা না
ছেড়ে। মিলোরার করুণ মুখখানা থেকে থেকে মনে পড়ছে। সেই যখন
ডাক্তারের দেওয়া ওষুধটা ওর হাতে দিল তখন বেচারীর মুখ কী মলিন
দেখাচ্ছিল। চোখে এমন একটা উদ্বেগের দৃষ্টি—মুখ থেকে সবটুকু লাবণ্য
যেন মুছে গেছে।

মরাগলায় পাওলিনো বলল, 'মুখে হাসি নেই কেন? একটু সেজে-গুজে
নাও। তোমার সেই জাপানী সিল্কের ব্লাউজটা পরে নাও। ওটা পরলে
তোমাকে বেশ দেখায়। দেখো, ও এসে যেন তোমার ব্যাজার মুখ না দেখে।
তোমার ভাবনা-চিন্তা সব ছাড়। সব গোছগাছ করে ফেলেছ তো?
দেখো, যেন কিছুতে খুঁত ধরতে না পারে। আচ্ছা, আমি এখন চলি,

কাল আবার দেখা হবে। কিন্তু তার আগেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একটা কথা। তোমার এই শোবার ঘরের জানালায় রুমাল ঝোলাবার কথা ভুলোনা কিন্তু। সকালে উঠেই আমি দেখে যাব। সংকেতটার কথা ভুলোনা, লক্ষ্মীটি।'

ও বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ছেলেটার ল্যাটিন খাতায় নীল পেন্সিল দিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে দশের মধ্যে দশ বসিয়ে গেল। ছেলেটির এমনিতেই বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম—এই অভাবনীয় আতিশয্যে আরো যেন বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। পাওলিনো ওর পিঠ চাপড়ে বলল, 'ভয় কী রে। বাবা এলে খাতাটা দেখাস; দেখবি কত খুশি হবে। এ-ভাবে লেখাপড়া করে যাস তো দেখিস একদিন বড়ো বড়ো ল্যাটিন পণ্ডিতদেরও তুই ছাড়িয়ে যাবি। অত গোমড়া মুখো কেন? আজ তো ফুর্তি করবার দিন, তোর বাবা আসছে। লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে থাকিস। দেখি নখগুলো—পরিষ্কার আছে তো? বেশ বেশ, ঠিক আছে। নোংরামো করিস না যেন।'

যাবার আগে আবার একদফা পিঠ চাপড়ে বলে গেল, 'সাবাস ছেলে আমাদের সোনা!'

শুয়ে শুয়ে পাওলিনো আবার ভাবছে, 'কিন্তু সেই ওষুধটা। পুলেংগো ব্যাটা বোকা বানায় নি তো। না, না, সেকি হয়। সে এতো করে ডাক্তারকে বুঝিয়েছে ব্যাপারটা কত গুরুতর। নিতান্ত পাজি না হলে পুলেংগো ঠকাবে না। কিন্তু ওষুধটা যদি ঠিকমত না ধরে?'

স্ত্রীর প্রতি ক্যাপটেনের দুর্ব্যবহারের কথা ভেবে ওর সর্বশরীর রাগে জ্বলতে লাগল—অপমানটা যেন ওরই গায়ে বিঁধছে। হ্যাঁ, অপমান না তো কী? পাওলিনো লোভিকোর মতো লোক যে মেয়েকে দেখে মুগ্ধ, যাকে পেলে সে বর্তে যায় তাকে কিনা পেরেল্লার মতো একটা নিতান্ত ছোটোলোক ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখে। কেন পাওলিনো লোভি-কোর মতো লোক অপরের পাতের উচ্ছিষ্ট পেয়েই খুশি—যে মেয়েকে

অপর একজন পায়ে ঠেলে দিলে, তাকে পেয়েই হাতে স্বর্গ পেল। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। লেপ্‌টেনের ঐ যে মেয়েটা ওর স্ত্রীর চাইতে ভালো হ'ল—দেখতে বেশি সুন্দর। একবার ওদের দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে হতো—তাহ'লে ক্যাপটেনের মুখের ওপরেই বলতে পারত—চোখের মাথা খেয়েছ, রুচি বলে পদার্থ নেই—আলোয়ার কোথাকার, কাকে ছেড়ে কাকে! ভালো করে দেখে নাও—এমন স্ত্রীকে ছেড়ে যেতেও মন চায়? নিতান্ত চাষাড়ে কিনা, তাই ওর রূপ তোমার চোখে পড়ে না—ওর ঐ করুণ মুখের মাধুরী! তুমি পশু, তাই এ-সব সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে পার না। আচ্ছা সে-সব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু একটা বেশ্যার সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীর কোনো তুলনা হয়!

রাত্তিরটা যে কী ভাবে কেটে গেল, চোখে এক পলক ঘুম নেই! আর কতক্ষণ বিছানায় পড়ে ছটফট করা যায়। আকাশটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, ভোর হতে দেরি নেই। হঠাৎ ওর মনে হ'ল সিনোরা আর তার স্বামী আলাদা ঘরে শোয়। হয়তো ওর দুর্ভাবনা ঘোচাবার জন্য সিনোরা রাত থাকতেই জানালায় রুমাল ঝুলিয়ে রেখেছে। সিনোরা তো জানে যে কিছুতেই ওর চোখে ঘুম আসবে না। ভোর হতে না হতেই সংকেত-চিহ্নটা দেখতে আসবে। এই ভেবে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ও পেড্রোর বাড়ির দিকে চলল। মনে মনে ওর দৃঢ় ধারণা যে এতক্ষণে নিশ্চয়ই জানালায় রুমাল ঝুলেছে। গিয়ে দেখলে রুমালের চিহ্নমাত্র নেই, বেচারী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। নেই, নেই, কিছু নেই। সব খড়খড়িগুলো বন্ধ, বাড়িটার কেমন যেন পোড়োবাড়ির চেহারা। হঠাৎ ওর মাথায় খুন চেপে গেল। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে নাকি —বাঘের মতো ঘরে ঢুকে পেড্রোর টুঁটি চেপে ধরবে? পর মুহূর্তে দারুণ অবসাদে শাওলিনো হাত পা ছেড়ে ধপ্ করে বসে পড়ল—যেন সত্যিই ও খুন করেছে। কত করে ও মনকে প্রবোধ দিতে লাগল।

বারবারে উঠে লোজিকোর জন্য সংকেত ঝুলিয়ে রাখবে এতটা আশা করা অন্যায়। বেচারী বোধ হয় ব্যস্ত ছিল, সবরই পায়নি।

না, না, হতাশ হ'লে চলবে না; আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। কিন্তু এ কী হ'ল! দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না যেন; পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে!

কোনো রকমে পা দুটো টেনে নিয়ে ও পাশের একটি গলিতে গিয়ে ঢুকল। ভাগ্যিস রাস্তার ওপর একটা কাফে খোলা ছিল—ছোটো-খাটো একটা রেস্তোরাঁ, ভোরবেলায় ডকের মজুরেরা সেখানে এসে আড্ডা জমায়। কাফেতে ঢুকে একটা বেঞ্চের উপর লোজিকো বসে পড়ল। কারুর দেখা নেই। দোকান আছে, মালিক নেই। পেছনের অন্ধকার ঘরটাতে দু'-একটা কথা শোনা যাচ্ছে। ওরা বোধ করি এতক্ষণে উনুনে আগুন দিয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে একটা গুণ্ডা গোছের লোক পাওলিনোর অর্ডার নিতে এল। লোজিকো ওর দিকে প্রথমটায় একটু বিরক্তভাবেই তাকাল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'একটা রুমা···না, না, না, এক কাপ কফি। বেশ কড়া হয় যেন।'

কফি এল। এক চুমুক খেয়ে লোজিকো তড়াক করে লাফিয়ে উঠল—'উহুহু—কী গরম, মুখটা পুড়ে গেল!'

'কী হ'ল তব?'

মুখটাকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করে লোজিকো আর্তনাদ করে উঠল—'উঃ!' রেস্তোরাঁর মালিক এক গ্লাস জল এনে বললে, 'একটু জল খান—ঠিক হয়ে যাবে।'

ওর ট্রাউজারের দিকে তাকিয়ে লোজিকোর মনটা হু-হু করে উঠল—সেখানে কফি পড়ে প্রকাণ্ড একটা দাগ হয়ে গিয়েছে। রুমাল বের করে একটি কোনা জলে ভিজিয়ে খুব করে দাগটার উপর ঘষতে লাগল। আর কিছু না হলেও কোথার উপর ভিজে রুমালের স্পর্শটা বেশ ভালোই

লাগল। ভিজে রুমালটা টেবিলের উপর বিছিয়ে দিতে গিয়ে ওর হঠাৎ আবার রুমালের কথা মনে পড়ে গেল। ট্রের ওপর চাবিটা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কাকে ডেকে। গলির মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই মুখোমুখি দেখা—ক্যাপটেন পেডেজার সঙ্গে!

'এ কী, আপনি যে এ অসময়ে?'

পাওলিনোর মনে হ'ল ওর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গিয়েছে। আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ—আমি···একটু···সকাল-সকাল উঠলাম কিনা···তাই···' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পেডেজা বললে, 'তাই বুঝি ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। কপাল ভালো, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, পরিবার নেই সুতরাং বন্ধনও নেই···একেই বলে সুখের জীবন···'

লোভিকো পেডেজার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারখানা কী। ঠিক ও যা ভয় করেছিল তাই হয়েছে। নইলে এই সকালে বাড়ি ছেড়ে···

ক্যাপটেনের চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। নিশ্চয় হতভাগা আবার ওর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ওকে খুন করতেই হবে। মনের ভাব গোপন রেখে বলল, 'কিন্তু আপনিও যে···

'আমি? আমি আবার কী করলাম?'

'আপনিও এত সকাল-সকাল···?'

'ও, আমি এই সকালবেলা বেরিয়ে পড়েছি কেন তাই জিগ্যেস করছেন? কী বলবো প্রোফেসর সাহেব বিশ্রী কেটেছে রাতটা। যা গরম···'

'কী বলছেন···ভালো ঘুম হয়নি?'

বিরক্তির সুরে পেডেজা বলল, 'একবিন্দুও না। আর, ঘুমুতে না পেলে আমার মেজাজ একেবারে বিগড়ে যায়।'

লোভিকোর সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে উঠল। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল,

'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু রাগটা কার ওপর ? আপনার ঘুম যদি না আসে তাহ'লে অন্য লোকের কী দোষ ?'

'অন্য লোকের দোষ আমি দিয়েছি না কি ? আপনি তো বেশ কথা বললেন, মশাই !'

'কেন, এই তো বললেন ঘুম না হ'লে মেজাজ বিগড়োয়, চটে যান। চটে যান কার উপর ? রাত্রে যদি জবোট গরম হয় তাহ'লে সেটা কি অপর লোকের দোষ ?'

'কেন নিজের উপরেই চটি, সব কিছুর উপরই রাগ হয়। আমি চাই খোলা হাওয়া, চিরটা কাল জাহাজে-জাহাজে কাটিয়েছি কি না। ডাঙা আমার ধাতে সয় না, বিশেষ এই শহরিকালে···সারি সারি বাড়ি, দেয়াল, দুর্ভাবনা···স্ত্রী-পুত্র-পরিবার···'

সোভিকো নিজের মনে ভাবছে যে খুন একে করতেই হবে। বাইরে কিন্তু এখনো সেই বিনয়ের হাসি হেসে বললে, 'স্ত্রীলোকদের আপনার ভালো লাগে না বুঝি ?'

'স্ত্রীলোক ? বেশ মাস্টার, বেশির ভাগ সময়ই তো জাহাজে কাটাই। মেয়েমানুষের মুখ খুব কমই দেখি। এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি··· এখনকার কথা আলাদা। কিন্তু যখন যৌবন ছিল তখন মেয়েদের ভালো লাগত বৈকি ! তবে কিনা যাকে বলে উন্মাদ ভালো লাগা এ আমার কখনো ঘটেনি। ইচ্ছে হ'ল পেলাম। ইচ্ছে না হ'ল পেলাম না।'

'তা সবসময় কি মনকে বেঁধে রাখা যায় ?' (খুন ! খুন !)

'নিশ্চয়। তবে ইচ্ছে নিয়ে কথা। আপনার বেলা উল্টো বুঝি ? সহজেই ধরা দিয়ে ফেলেন তো ? একটু ভঙ্গিমা, সলজ্জ চোখের চাউনি—ব্যস্‌, শ্রীচরণকমলেষু ! কেমন না, সত্যি বলুন দেখি ?'

সোভিকো স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললে।

'সত্যি বলব ? যদি আমার স্ত্রী থাকতো···'

আরে রাখুন মশাই, স্ত্রীদের 'কথা হচ্ছে না। স্ত্রীর সঙ্গে আবার প্রেম কী? আমি বলছিলাম স্ত্রীজাতির কথা।' এই ব'লে পেতেল্লা হো হো করে হেসে উঠল।

'স্ত্রীরা কি স্ত্রীলোক নয়?

'স্ত্রীলোক্ হবে না কেন···তবে সব সময় নয়, কখনো কখনো। কিন্তু মাস্টার, আপাতত আপনার তো স্ত্রী নেই। ভগবান যেন আপনার এই সুখের আইবুড়ো অবস্থা কখনো না ঘোচান। স্ত্রীরা, বুঝলেন কিনা···'

পেতেল্লা লোভিকোর হাতের ভিতর হাত গলিয়ে অনর্গল বকে যেতে লাগল। এদিকে লোভিকোর মন ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলেছে। সে কেবল তাকায় পেতেল্লার মুখের দিকে—ওর চোখ দুটো কেমন ফোলা-ফোলা। চোখের কোণে কালি পড়েছে। তবে কি সত্যিই ওর ভালো ঘুম হয়নি···হয়তো···। এদিকে এক একটা কথায় ভাব-ভঙ্গিতে হঠাৎ মনে আশা হয় বেচারী সিনোরার বুঝি এতদিনে কপাল ফিরেছে। আবার পরক্ষণেই সন্দেহে হতাশায় ওর মনটা দমে যায়। এ যেন দণ্ডে-দণ্ডে মরা। আর সহ্য হয় না। পেতেল্লা হাঁটছে তো হাঁটছেই। ওকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে সমুদ্রের ধারের সমস্ত রাস্তাটা এ মোড় থেকে ও মোড় অবধি ঘুরে তারপর বাড়ির দিকে ফিরতে সুরু করল।

লোভিকো ভাবছে, 'আমি ওর সঙ্গ ছাড়ছি না। ওর সঙ্গে ভেতরে ঢুকি যাবো, দেখবো পেতেল্লা—ওর কর্তব্য করেছে কিনা। যদি না করে থাকে তবে হয় এস্পার নয় ওস্পার।'

পেতেল্লার প্রাণ নেবার জন্য ও দৃঢ়সংকল্প। ওর সমস্ত মনটা নিদারুণ ঘৃণায় বিষে জর্জর। অন্য কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

মোড় ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল পেতেল্লার বাড়ির জানলার দিকে। ও দাঁড়িয়ে পড়ল বাজপড়া মতো—শরীর থেকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখে—এ কী! এক···দুই

…তিন…চার…পাঁচ…পাঁচ-পাঁচটা রুমাল উড়ছে।

পাওলিনো হাঁ করে দেখতে লাগল। আনন্দের আবেগে ওর প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। পিছন থেকে ক্যাপটেন ওকে ধরে ফেলল, নইলে তো পড়েই যাচ্ছিল। 'কী হয়েছে, মাস্টার! অমন করছো কেন?' 'ক্যাপটেন ভাই, কী বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব। কী খুশিই না হয়েছি …সুন্দর কাটল সকালটা…এখন ভারি ক্লান্ত লাগছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ধন্যবাদ, বন্ধু! এবার চলি। যাত্রা তোমার সুখের হোক। বিদায় হই এবার। আবার তোমায় ধন্যবাদ দিই বন্ধু—ধন্যবাদ।' পেত্তোমা তার বাড়ির ভেতর ঢুকতে না ঢুকতেই পাওলিনো বিশেষ উত্তেজিত ভাবে রাস্তার উপর দিয়ে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে লাগল। কী তার উল্লাস; গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে আনন্দে! একেবারে আহ্লাদে আটখানা। চোখমুখের ভাব এমন যেন এক্ষুনি দিগ্বিজয় করে এসেছে। রাস্তায় যাকে পাচ্ছে তাকেই দেখাচ্ছে ডান হাতের পাঁচ-পাঁচটা আঙুল—

—হীরেন্দ্র নাথ দত্ত.

অমর সত্য

'মরে গিয়েও, বুঝলে বন্ধু, মরে গিয়েও মানুষ নিজস্ব একটা আস্তানা চায়। যদি পয়সাওয়ালা মড়া হয় তাহ'লে তো কথাই নেই—বেশ ভালো আস্তানা তার দরকার, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে—মার্বেল পাথরের উপর সুন্দর কাজ করা কবর না হ'লে কি চলে। তার উপর যদি দু'হাতে বিলোবার মতো পয়সা থাকে তাহ'লে তো কবরের ওপর আমার মতো একজন বড় শিল্পীর তৈরি একটা বিরাট…বিরাট…কী বলে কথাটা?…রূপক, হ্যাঁ, একটা বিরাট রূপক বানিয়ে নিতে না পারলে মন ভরবে কেন? সুন্দর পাথরের তৈরি কবর—তার উপর ল্যাটিন ভাষায় লেখা…Hic Jacet…তলায় লেখা মৃত ব্যক্তিটি কেমন মানুষ ছিলেন বা ছিলেন না…চারদিকে ফুলে ফলে ভরা ছোট্ট বাগান… তারপর কুকুর তাড়ানোর জন্যে ঝকঝকে লোহার রেলিং আর তারপর…'

সারা সকাল হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে কনস্তানতিনো পলিজিয়ানির মুখ চোখ লাল, কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। [illegible] চুপ করে থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'আঃ থামো! জ্বালাতন করে মারলে!' গিনো বাত্তি এতক্ষণ বুকের উপর মুখ গুঁজে বকবক করছিল। বন্ধুর বিরক্তিতে সে খাঁকশিয়ার মতো বাঁকানো ছাগলদাড়ি সমেত মুখ তুলে পলিজানির দিকে তাকাল। তারপর, যেন অনেক ভেবে চিন্তে মনস্থির করে বন্ধুর সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করল শুধু একটি মাত্র কথা ব'লে—'গাধা!'

'অনেকক্ষণ এগারোটা বেজে গেছে!' বললুম পনিয়ানি।

গম্ভীরভাবে কল্লি বললুম, 'এবারেও বিশ্বাস করতে পারলাম না। যাক, পড়ো চিঠিখানা।'

পনিয়ানি পড়ে চললুম, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন সিনোরা কম···কম···কী যেন নামটা?'

সত্যি যেন সাহায্য করতে সে খুব ব্যগ্র এমনিভাবে কল্লি বললুম, 'নামটা নিশ্চয় কমন্ড্যাশিয়াস্?'

'কম···না, বোধ হয় কমলাপতি···ঠিক পড়তে পারছি না। "তিনি আর তাঁর মেয়ে আপনাকে কোনো একটা মূর্তি তৈরি করতে দেবার জন্যে দেখা করতে যাবেন। আমার স্থির বিশ্বাস" ইত্যাদি ইত্যাদি। কী, বিশ্বাস হ'ল তো এবার?' পনিয়ানি বললুম। মুখটা আবার বুকের উপর গুঁজে কল্লি আস্তে আস্তে বললুম, 'চিঠিটা নিজের নামে নিজেই লেখনি তো হে?' হাসবে কী কাঁদবে ঠিক করতে না পেরে হতাশ হয়ে পনিয়ানি ব'লে উঠল, 'ইডিয়ট!' কল্লি এবার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আঙুল নেড়ে জবাব দিল, 'উঁহু, হ'ল না। ওই একটি কথা আমাকে বলতে পারবে না—কথাটা আমি রীতিমতো অপমানকর মনে করি। সত্যিকার ইডিয়ট হ'লে কী রকম আমি হতাম জানো? তা যদি হতাম, তাহ'লে আমি আর সবাইকে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতাম—পোশাক পরতাম ভালো; জুতো পরতাম ভালো; আর সুন্দর একটা টাই লাগাতুম, কী রঙের টাই জানো? ওই যে কী বলে—হেলিয়োত্রো, উঁহু, হেলিয়োট্রো—আহা বলো না ছাই—হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে—হেলিয়োট্রোপ রঙের! টাই কি, তোমার মতো ভেলভেটের একটা ওয়েস্টকোটও চড়িয়ে ফেলতে পারতাম···হায়রে, বা আমার কাটা কপাল! যদি তোমার মতো একটা ওয়েস্টকোটও থাকত!···দেখ, এস এক কাজ করা যাক; আমার কথা শুনলে তোমার ভালোই হবে হে, ভালোই হবে। যদি সত্যিসত্যিই

তোমার ঐ বর্ষীয়া ভদ্রমহোদয়ারা আসেন তাহ'লে তোমার এই পরিবার পরিজনকে খুঁটিয়ে দেখলে তোমার সম্বন্ধে তাঁদের খুব ভালো ধারণা হবে না। তার চেয়ে এস আমরা বোঝা করে ফেলি। তাঁরা এসে দেখবেন যে তুমি কাজে একেবারে মগ্ন আর তোমার মাথার ঘাম—কী বলে কথাটা?—ঘামের মাথা—মানে পায়ের ঘাম মাথায় টস্‌টস্‌ করে পড়ছে। একতাল কাদা নাও, তারপর ভাবি যে এখানে আরাম করে শুয়ে আছি, যতটা সম্ভব আমার একটা প্রতিমূর্তি গড়ার চেষ্টা করো, তোমার সেই মূর্তিটার নাম দেওয়া যাবে—"শ্রমিক।" শুধু নামটা দেখেই ন্যাশনাল গ্যালারি আদর করে কিনে নিয়ে যাবে। শুধু বিপদ হচ্ছে আমার এই জুতো জোড়া নিয়ে—বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। তা হোক গে, তুমি ইচ্ছে করলেই মূর্তির জুতো জোড়া নতুন হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কী, ভেব না, আমি তোমায় খোশামোদ করছি, কিন্তু তোমাকে অনায়াসে ভাস্কর দলের মুচি বলা যেতে পারে।'

পলিয়ানি এসব কথায় কোনো খেয়ালই না করে দেয়ালে কতকগুলো কার্টুন ছবি টাঙাচ্ছিল। তার মতে কল্লির জীবনটা একেবারে ব্যর্থ। ও যেন গত যুগের মেজে-ঘেষে-ঝকঝকে-দাঁড়ানো কোনো স্মৃতি। শিল্পী মহলের সেই পুরোনো কায়দা—ঢিলেঢোলা চেহারা, ফক্কুড়ির দিকে ঝোঁক বেশি। সত্যি কথা বলতে কী, এই ফক্কুড়ি কল্লির একেবারে মজ্জাগত। নয় তো, কাজ করার মেজাজ যখন আসে তখন কল্লির মাথা থেকে যা বেরোয়, তা যেমন-তেমন উঁচুদরের ভাস্করের পক্ষেও শ্লাঘনীয়। কল্লির কাজ যে কেমন তা পলিয়ানির নিজেরও কিছু কিছু জানা আছে। কত সময় কোনো মূর্তির মধ্যে কোনো একটা বিশেষ ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় ও যখন গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে তখন কল্লি এসে যেন বড় অবহেলার সঙ্গে বুড়ো আঙুল দুটো দিয়ে এখানে ওখানে একটু টিপে অতি সহজেই ঠিক সেই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছে। তার বোধের মধ্যে

ভাস্করের ইতিহাস সম্বন্ধে পলিয়ানির তুলনায় একফোঁটা বিদ্যেও তার পেটে নেই। তাছাড়া নিয়ম মতো খাদাহার করে চেহারাটা একটু ওর গোছের করা ওর দরকার। যতসব অদ্ভুত ভাবনা ওর মাথায় আর ঐ বিদ্‌ঘুটে পোশাক! সত্যি ওকে এক এক সময় আর সহ্য করা যায় না। পলিয়ানি নিজে বছর দুয়েক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এখন তো বেশ আস্তে আস্তে কাজের মধ্যে ঢুকে পড়ছে…

ঠিক এমনি সময় দরজায় মৃদু দুটো টোকা পড়ল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে পলিয়ানি তখন তার স্কেচগুলো দেয়ালে টাঙাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি মাটিতে নেমে ঘুঁষি পাকিয়ে সে বলল, 'এখনো যাবে না?'

সহসা কোনো লক্ষণই কজির দেখা গেল না, সে উত্তর দিল, 'আহা, তাঁরা আসছেনই না, তারপর না হয় যাওয়া যাবে। তুমি যে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করলে! এমন স্বার্থপর অসভ্যের মতো ব্যবহার না করে, ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

একথার জবাব দেবার মতো মনের অবস্থা পলিয়ানির নয়—কপাল থেকে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ সরিয়ে তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে দিতে গেল।

ঘরে ঢুকলেন সিনোরা কনসা সন্তি—পিছনে তাঁর মেয়ে। মেয়েটির বয়স বেশি নয়, কিন্তু বেশভূষায় সে গভীর শোকেরই প্রতিমূর্তি, মোটা ক্রেপের ঘোমটায় মুখটা ঢাকা। তার হাতে লম্বা একটা পাকানো কাগজ। মা'র পরনে সুন্দর হালকা ধোঁয়াটে রঙের পোশাক—সুগঠিত দেহে মানিয়েছে চমৎকার। চুলে পাক ধরেছে, তবুও যুবতীসুলভ ঢঙেই বাঁধা। মাথায় ভায়োলেট ফুল বসানো ছোট্ট সুন্দর টুপি। মোটের উপর ভদ্র-মহিলাকে দেখেই বোঝা যায় যে বয়স হ'লেও তিনি যে এখনো সুন্দরী এ বিষয়ে তিনি বেশ সচেতন। মেয়ে যখন মুখের ঘোমটা টুপির উপর তুলল, তখন বোঝা গেল যে শোকে কাতর হ'লেও সেও কম সুন্দরী নয়।

আধখিক অভ্যর্থনা-বিনিময়ের পর পশিয়াদি লক্ষ করল যে হাত দুটো পকেটেই ঢুকিয়ে, বিদঘুটে টুপিটা আর নাকের উপর নামিয়ে এনে, একটা আধপোড়া নিভন্ত সিগারেট ঠোঁটের কোণে লাগিয়ে তখনো কল্লি দাঁড়িয়ে আছে। চলে যাবার কোনো লক্ষণই তার দেখা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে মহিলাদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে পশিয়াদি।

সিনোরিনা কনসালভি হঠাৎ যেন অত্যন্ত অবাক হয়ে ব'লে উঠল, 'সিনোর কল্লি? সিন্ত্রো কল্লি? আপনি কি ডাক্তার?'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথার টুপিটা খুলে কল্লি জবাব দিলে, 'ডাক্তার? হ্যাঁ...তা আমাকেও ডাক্তার বলতে পারেন বইকি!'

সিনোরিনা যেন একটু বিরক্ত হ'ল, একটু অপ্রস্তুতও। বল্লে, 'কিন্তু আমি যে শুনলাম আপনি আজকাল আর রোমে থাকেন না?'

'না—আমি এখানেই আছি। ব্যাপারটা কী জানেন, আমি এখন ছুটি উপভোগ করছি।' অভ্যাসমতো কল্লি ব'লেই চল্ল, 'প্রথমে একটা স্কলারশিপ নিয়ে রোমের মতো একটা সুন্দর জায়গায় এসে চিরকাল কুঁড়েমি করেই কাটাবো ঠিক করেছিলাম, তারপর...'

মা মৃদু-মৃদু হাসছিলেন, মেয়ে তাঁর দিকে ফিরে বল্লে, 'এখন কী করা যায়?'

কল্লি জিগ্যেস করল, 'আমি চলে যাব?'

সিনোরিনা তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, 'না, না, আপনি যাবেন কেন—আমিই বরং আপনাকে অনুরোধ করছি, আর কিছুক্ষণ এখানে থাকতে মানে—কারণ—' ব্যাপারটাকে সহজ করে নেওয়ার জন্যে মা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, 'ভগবান কী রকম মিলিয়ে দেন দেখুন!' তারপর পশিয়াদির দিকে ফিরে বল্লেন, 'তা হোক, একটা উপায় করা যাবেই ...আচ্ছা, আপনারা দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা সত্যি সত্যিই খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' পশিয়াদির জবাব

দিতে দেরি হ'ল না।

'হ্যাঁ, এত ব্যস্ত যে এই কয়েক মিনিট আগেই উনি আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন,' বাধা দিয়ে কাকি বললে।

গলার স্বর নামিয়ে পনিয়ামি ধমক দিয়ে উঠল, 'আঃ, চুপ করো না।'

তারপর মহিলাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনারা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? বসুন।' একটু ইতস্তত করে বলে চলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কারণটা জানতে পারি কী?'

সিনোরা কনসালভি সোফায় বসতে বসতে জবাব দিলেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন? আমার মেয়ে যার বাগদত্তা ছিল সে ছেলেটি হঠাৎ মারা গিয়েছে।' দু বন্ধু এক সঙ্গে ব'লে উঠল, 'আহা!'

সিনোরা ব'লে চললেন, 'বুঝতেই পারছেন আমার মেয়ে কত বড় আঘাতটা পেয়েছে। ঠিক বিয়ের আগে! শিকারে গিয়েছিল, সেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বোধ হয় খবরের কাগজে প'ড়েও থাকবেন। ছেলেটির নাম ছিল জুলিয়ো সর্বিনি।'

'ও হাঁ, হাঁ, পড়েছি বটে,' পনিয়ামি বলল, 'কাগজে লিখেছিল বন্দুকের গুলি ছুটে গিয়ে—'

সিনোরা বাধা দিয়ে বললেন, 'গেল মাসের প্রথমে…না, না, তার আগের মাসে…উঁহু, এ মাস নিয়ে তিনমাস হ'ল এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে…ছেলেটি আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও ছিল। তার বাপ আমার সম্পর্কে এক রকম ভাই হতেন—স্ত্রী মারা যাবার পর আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করছিলেন। যাক সে সব কথা, এখন, জুলিয়েত্তা—মানে আমার মেয়ের নামও জুলিয়া'—

মেয়ের নাম ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই পনিয়ামি কেতাদুরস্ত ভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালে।

মা ব'লে চললেন, 'ভাবী স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে জুলিয়েত্তা ভেরানোতে (রোমের সবচেয়ে বড় গোরস্থান) একটা ভালো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করাতে চায়। এখন সেখানে সাধারণ রকম একটা কবর আছে শুধু। সেটা কী রকম হবে এ বিষয়ে ওর নিজের কতগুলো ধারণা আছে। আপনারা বোধ হয় জানেন না, আমার মেয়ের স্কেচিং সম্বন্ধে হাত খুব পরিষ্কার।'
মেয়ে চোখ নামিয়ে লজ্জানম্রকণ্ঠে বাধা দিল, 'মা, মা, আপনারা মা-র কথা শুনবেন না। শুধু সময় কাটানোর জন্যে একটু আধটু…'
মা রীতিমতো আহতভাবে বললেন, 'শুধু আমি কেন, জুলিয়ো-ও তো তোমাকে স্কেচিং ভালো করে শিখতে—'
[illegible] একটু জোর দিয়ে বলল, 'মা, চুপ করো। দেখুন, একটা সচিত্র মাসিক পত্রে এঁর নামে সিনোর কাজির আঁকা কবরের উপরকার স্মৃতিফলকের একটা স্কেচ দেখে আমার ভারী ভালো লেগেছিল, তাই…'
'আর সেইজন্যই আমাদের এখানে আসা'—মেয়ে বলতে দ্বিধা করছে দেখে মা তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করে দিলেন। মেয়েটি বলতে লাগল, 'আমি এই স্কেচটায় কিছু কিছু অদল বদলের কথা ভেবেছি…'
'আচ্ছা, স্কেচটা বলুন তো?' বাধা দিয়ে কাজি জিজ্ঞাসা করল, 'জ্যান্ত মানুষরা তো আমার কোনো আদর করে না। তাই অন্তত মৃতদের থেকেও যদি কোনো অর্ডার আসে এই ভেবে আমি কয়েকটা স্মৃতিফলকের নকশা এঁকেছিলাম—'
[illegible] যে কথাবার্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এটা তার ভালো লাগছিল না। কাজির কথা শেষ হবার আগেই সে ব'লে উঠল, 'মাপ করবেন, আমার এই বন্ধুর কোনো স্কেচ অনুযায়ী স্মৃতিফলক তৈরি করবেন এই কী আপনারা স্থির করেছেন?'
'না, ঠিক তা নয়,' মেয়েটি ঈষৎ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমি চাইছি, এই রকম। আমি স্কেচটার অর্থ যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে

মনে হয় পিলোর ফক্রি দেখাতে চেয়েছেন মৃত্যু যেন জীবনকে তার দিকে টেনে নিচ্ছে।' ফক্রি ব'লে উঠল, 'ও, বুঝতে পেরেছি আপনি কোন্‌টার কথা বলছেন। একটা আবরণের মধ্যে একটা কংকাল, সেইটে, না? আবরণের ফাঁকের ভিতর দিয়ে শুধু কংকালটার অস্থিটুকু শুধু বোঝা যাচ্ছে। জীবনের প্রতিমূর্তি একটি সুন্দরীকে সে আঁকড়ে ধরেছে—আর জীবন চাচ্ছে সেই কংকালের কাছ থেকে—মৃত্যুর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে। সেই স্কেচটার কথা বলছেন তো? ওটা সত্যিই সুন্দর…অপূর্ব!'

এই অদ্ভুত চেহারার শিল্পীর আত্মকেন্দ্রিকতায় পিলোরা দম্পতি একটু আশ্চর্য বোধ করলেও হাসি চাপতে পারলেন না।

পলিয়ানি তাঁকে বল্‌ল, 'লক্ষ্য করছেন, আমার বন্ধুর বিনয়ের অন্ত নেই। এমন বিনয় আপনি যেখানে সেখানে খুঁজে পাবেন না।'

মা তখন মেয়েকে বল্‌লেন, 'আর ভূমিকা না করে তাড়াতাড়ি তুমি যে স্কেচটা করেছ, সেইটা এঁদের দেখিয়ে দাও।'

মেয়ে লজ্জিতভাবে বল্‌ল, 'দাঁড়াও মা, আগে পিলোর পলিয়ানিকে ব্যাপারটা ভালো করে খুলে বলা দরকার। আপনি বুঝতেই পারছেন, প্রতিকৃতি তৈরি করার কথা প্রথম যখন মনে হয়েছিল তখন পিলোর ফক্রিকেই কাজটার ভার দেব ভেবেছিলাম। এর অন্য কোনো কারণ নেই; শুধু ওঁর স্কেচ-এর জন্যে।'

এবারে সে ফক্রির দিকে ফিরে বল্‌লে, 'কিন্তু আগেই বলেছি পাঁচজনের কাছে শুনলাম যে আপনি এখন আর রোমে থাকেন না। কাজে কাজেই আমি নিজেই আমার সাধ্যমতো আপনার স্কেচটাকে এমনভাবে অবলম্বন করলাম যাতে আমার নিজের ইচ্ছে ও ধারণা ওটার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। আমি বোধ হয় আমার কথাটা পরিষ্কার করে বলতে পারছি না, কিন্তু—'

পলিয়ানি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'না, না, আপনি বলুন। আমরা বেশ বুঝতে পারছি।'

সিনোরিনা ব'লে চললেন, 'মৃত্যু ও জীবনের প্রতিমূর্তি দুটির উপর আমি কোনো কারিগরি করিনি। তবে মৃত্যু জোর করে জীবনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই ধারণা আমি বদলে দিয়েছি। আপনার স্কেচ-এর এইটুকু মাত্র বদল করেছি আমি। আমার মনে হয় মৃত্যু জীবনকে জোর ক'রে বাঁধতে পারে নেই, বরং তারুণ্যের কাছে পরাভূত হয়েই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর এই বিবাহ।'

'বিবাহ?' পলিয়ানির কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠল।

'দিনে দিনে আরো কত কী শুনব!' কপ্পি চিৎকার করে উঠল, 'জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর বিবাহ!'

সিনোরিনা একটু নম্র হাসি হেসে বললে, 'হ্যাঁ, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর বিবাহ। শুধু তাই নয়, এই মিলনকে একটা রূপক দিয়ে বোঝাবারও চেষ্টা করেছি। সিনোর কপ্পি যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনি, কংকালটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু কাপড়ের ভাঁজের ফাঁক দিয়ে কংকালের মানে মৃত্যুর হাতটি একটুখানি দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে সেই হাতে একটি বিয়ের আংটি। লজ্জানম্র বিনত জীবন কংকালের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে আংটি পরবার জন্যে।'

'চমৎকার! খুব সুন্দর! এবারে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি,' কপ্পি বাধা দিয়ে উঠল, 'এর সঙ্গে আমার স্কেচের কোনো তুলনাই হয় না। কল্পনা ভাবটি একেবারে নতুন। আংটি!...আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে...সুন্দর!'

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রক্তিম হয়ে সিনোরিনা বললে, 'হ্যাঁ, কিছুটা আলাদা বটে, কিন্তু এটাতো অস্বীকার করা চলবে না যে আপনার স্কেচটা দেখেই এটা আমার মনে এসেছিল আর—'

'ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।' কপ্পি বললে, 'এটা আপনারই, আপনারই

মিরাব, আমার মেয়ের চেয়েও হাজার গুণে ভালো এটা। আমার মনে ওটা কোথা থেকে এসেছিল তা ভগবানই জানেন—'

সিনোরিনা সোজা হয়ে বসে আবার চোখ দুটো নামালে।

মা একটু অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠলেন, 'সত্যি কথা বলতে কী, মেয়ে তার ইচ্ছে মতো সব করছে বটে, কিন্তু আমার এটা একটুও ভালো লাগছে না।'

মেয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। তারপর পনিয়ানির দিকে ফিরে বললে, 'কয়েকদিন আগে আমরা কম্যাণ্ডার সেরাফিনির কাছে গিয়েছিলাম তাঁর মতামত জানতে। তিনি আমাদের অনেক দিনের বন্ধু কিনা—'

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওদের বিয়েতে তাঁরই সাক্ষী হবার কথা ছিল।'

মেয়ে ব'লে চললে, 'তাঁর কাছেই আপনার নাম জানতে পারি। আর তাঁর কথামতোই স্থির করি যে আপনাকেই এই কাজের ভার দেব—'

'না, না, মাপ করুন, সিনোরিনা।' পনিয়ানি তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'আমার বন্ধুকে যখন আপনারা এখানে পেয়েই গেছেন—'

কর্তি রাগের চোটে মাথা দুলিয়ে বললে, 'বাজে কথা বোলো না। তোমার কথা শুনলে পিত্তি শুদ্ধ জ্বলে যায়।'

সে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। পনিয়ানি তার হাত ধরে আটকে রেখে বললে, 'আরে শোনো, শোনো। তুমি রেগে যেই এই কথা ভেবেই তো সিনোরিনা আমার কাছে এসেছিলেন।'

কর্তি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, উনি আমার ডিজাইন সব বলে দিয়েছেন। বেচে খাও আমাকে। উনি এসেছেন তোমার কাছে। আমায় মাপ করবেন সিনোরা, সিনোরিনা, আমাকে এখন যেতে হবে। নমস্কার।'

পলিয়ানি হাত না ছেড়ে বেশ দৃঢ় ভাবেই বল্লো, 'শেষ কল্লি, এই মূর্তি তৈরি করার ভার আমি কিছুতেই নিচ্ছি না। তুমিও নিতে রাজি হলো না। তার মানে কাজটা আমাদের দুজনেরই হাতছাড়া হবে—'

সিনোরা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, তাহ'লে আপনারা দুজনেই করুন না কেন? দুজনে কি মূর্তিটা তৈরি করা যাবে না?'

সিনোরিনা তাড়াতাড়ি বল্লে, 'আমার জন্তে আপনাদের মধ্যে—'

কল্লি ও পলিয়ানি এক সঙ্গে ব'লে উঠল, 'না, না, তা নয়, তা নয়।'

কল্লি বলতে লাগল, 'এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধই নেই, সিনোরিনা। আর তাছাড়া—মানে, তাছাড়া আমার এখন কোনো স্টুডিয়ো নেই। কাজে কাজেই এই মূর্তি গড়ার ভার আমার পক্ষে নেওয়া অসম্ভব। চারদিকে যে যেখানে আছে সবাইকে গালাগালি দেওয়া ছাড়া আমি এখন আর কোনো কাজেরই উপযুক্ত নই। আপনাদের উচিত এই বন্ধুপাগলটিকে জোর করে এই কাজের ভার—'

পলিয়ানি বল্ল, 'বাজে বকে কোনো ফল হবে না কল্লি। সিনোরা যেমন বলেছেন, হয় সেরকম আমরা দুজনে কাজটা নেব আর তা না হ'লে আমি একা এ কাজ কিছুতেই নেব না।'

সিনোরিনার পাশে সোফার উপর যে ভাঁজ-করা কাগজটা ছিল সেইটের দিকে হাত বাড়িয়ে কল্লি বল্ল, 'মাপ করবেন সিনোরিনা, আপনার আঁকা স্কেচটা দেখবার জন্তে আমার ভারী লোভ হচ্ছে। ওটা দেখবার পর বলতে পারব যে কাজের ভার—'

'অসাধারণ কিছু দেখবার আশা করবেন না,' সিনোরিনা কম্পমান কম্পিত হাতে কাগজটা খুলতে খুলতে বল্লে, 'আমি এখনো ঠিক পেন্সিল ধরতেই জানি না…শুধু আমার ভাবটা বোঝাবার জন্তে কয়েকটা লাইন টেনে হেলোমাহুগি করেছি…দেখুন…'

স্কেচটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুল্লি চমকে উঠে চিৎকার করে বল্লে,

'কাপড় পরিয়েছেন?'

'তার মানে?' সিনোরিনা একটু ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন, কাপড় পরাবনা কেন?'

'মাপ করবেন। কিছুতেই না,' কল্লি রীতিমতো গরম হয়ে ব'লে উঠল, 'জীবনের প্রতিমূর্তি সেমিজ পরা!…না, না, তা কখনো হতে পারে না। নগ্ন, নগ্ন! জীবনকে নগ্ন হতে হবে সিনোরিনা—সম্পূর্ণ নগ্ন।'

সিনোরিনা কনসালতি আমতা আমতা করে বললে, 'দেখুন কোনো মত প্রকাশ করবার আগে স্কেচটা আর একবার দেখুন।'

এবারে কল্লি প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'হ্যা, হ্যা আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনি নিজের ছবি এঁকেছেন—জীবনের প্রতিমূর্তি আঁকতে গিয়ে আপনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। (যদিও মানুষের জীবনের চেয়ে আপনি ঢের বেশি সুন্দর।) তাতে কি হয়েছে? যখন এই স্কেচটার কথা আলোচনা হচ্ছে, তখন আমরা চলে এসেছি আর্টের ক্ষেত্রে। আমাদের বিষয় হচ্ছে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর বিবাহ। যখন কংকালের উপর আবরণ দেওয়া হয়েছে তখন জীবনের মূর্তিটা নগ্ন হতেই হবে…সম্পূর্ণ নগ্ন আর অপরূপ সুন্দর। ঐ আচ্ছাদিত কংকালের ভীষণ মূর্তিটার পাশে জীবনের প্রতিমূর্তি এই রকম হওয়াই দরকার। গলিয়ানি তুমি কি বল, নগ্ন হওয়াই উচিত নয়? সিনোরা, আপনার কি মত? সম্পূর্ণ নগ্ন, সিনোরিনা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও এতটুকু আবরণ থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এরকম না হ'লে ঠিক মনে হবে কোনো হাসপাতালের ছবি তৈরি হয়েছে—একটা মূর্তি কাপড়ে মোড়া আর একটা পরানো চাম-কাপড়। আমরা যা বানাবো তাকে তো আর্ট হতে হবে, সিনোরিনা, আর তাই যদি হতে হয় তাহ'লে জীবনকে নগ্ন হতেই হবে।'

সিনোরিনা কনসালতি আর তাঁর মা উঠে দাঁড়ালেন। সিনোরিনা

বল্লে, 'আমি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আপনার মত আমি গ্রহণ করতে পারছি না। আপনি যা বলছেন, আর্টের দিক থেকে তা হয়তো সত্যি—তা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। আমার এই স্কেচটিতে আমি কিছু বলবার চেষ্টা করেছি। অন্ত যে কোনো ভাবে এটা আঁকলে সে কথা বলা হবে না। আপনার মতে চল্লে যে কথা আমি বলতে চাচ্ছি তা আর আমার বলা হবে না।'

'তা কেন? মাপ করবেন, আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না,' কাজি বল্লে, 'আপনার ভুল হচ্ছে এইখানে যে আপনি আপনার দেহটাকে একটা রূপক ব'লে গ্রহণ না করে আপনার নিজস্ব জিনিস ব'লে ভাবছেন। এই ভেবেই আপনি স্কেচ তৈরি করেছেন—কাজে কাজেই যেমন সুন্দর হওয়া উচিত ছিল, তেমনটি হয়নি।'

সিনোরিনা জবাব দিল, 'না, ওটা যে সুন্দর হয়েছে একথা আমি বলছি না। আপনি এখনি যে কথা বল্লেন সেইটেই সত্যি। আমি মূর্তিটিতে কোনো রূপক প্রকাশ করতে চাইনি। আমি আমার নিজের মূর্তি, নিজের ঘটনা, আমার ভবিষ্যতের কর্ম পদ্ধতি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না...যেখানে ছবিটি তোলা হবে সেই জায়গাটার কথা একবার ভেবে দেখুন। না, না, অন্তত সেখানে, আপনি যেরকম বলছেন, জীবনের মূর্তি সেরকম করা অসম্ভব—'

কাজি হাত দুটো উপর দিকে তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে, 'এ শুধু আপনার কল্পনা—'

বিষন্ন মধুর হেসে সিনোরিনা তাকে শুধরে দিলে, 'কল্পনা বলবেন না, বলুন ভাবপ্রবণতা, আর তার সম্মান আপনাকে রাখতেই হবে।'

সঙ্গিয়ানি আর কাজি ঠিক করল যে কন্যাগুলার সেয়াজের সঙ্গে তারা মূর্তি তৈরি করার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে নেবে। একটু পরেই সিনোরা

কনসালভি আর তাঁর শোকাহত মেয়ে পলিয়ানির ইউক্লিড থেকে বিদায় নিলেন।

গিয়ো কম্বি আনন্দের আতিশয্যে ইউক্লিয়োসর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল—গান গেয়ে-গেয়ে।

সপ্তাহ খানেক পরে কনস্তানতিনো পলিয়ানি মূর্তিটার ধাঁচা তৈরি করার জন্যে কয়েকটা সিটিং দেওয়ার কথা সিনোরিনাকে বলতে কনসালভিদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

কম্যাণ্ডার সোরাভির সঙ্গে সিনোরা কনসালভির বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। কম্যাণ্ডারের কাছে পলিয়ানি জেনেছিল, যে সবিনি সেই ভীষণ অ্যাকসিডেন্ট-এর পর মাত্র তিনদিন বেঁচে ছিল—মারা যাবার সময় তার অগাধ পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি সব সিনোরিনা কনসালভিকে দিয়ে যায়। তাই এই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করতে যত টাকাই লাগুক, সিনোরিনা তাতে কার্পণ্য করবেন না।

কম্যাণ্ডার আরো বলেছিলেন যে এই দুর্ঘটনার জন্যে তাঁর নিজের দুশ্চিন্তার আর বিরক্তির আর শেষ নেই—সিনোরিনা কনসালভির ব্যবহারে তা আরো বেড়েই চলেছে। আহা বেচারি, [illegible] দেখলে দুঃখ হয়, কিন্তু ও যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে। [illegible] বলতে কী দেখলে মনে হয় শোকের প্রকাশটা অত্যন্ত বেশি গভীর করে ও যেন এক অদ্ভুত আনন্দ পায়। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ব্যাপারটা আকস্মিক—একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। আর সবিনি সত্যিই সে ছিল ভালো ছেলে—যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি ব্যবহার। মেয়েটাকে ভালোও বাসতো তেমনি, বিয়ে হ'লে দুজনে ভারী সুখী হতো। সেইজন্যেই বোধহয় ভগবান তাকে টেনে নিলেন।

কম্যাণ্ডার সেন্সারির কথা শুনে মনে হয়—সরিসির মতো আরো অনেকেই যে মারা গেছে এ শুধু কম্যাণ্ডারের দুশ্চিন্তা বাড়াবার জন্যে। বিয়ে হবার পর দুজনে থাকবে বলে সরিসি যে বাড়িটা সাজিয়ে রেখেছিল, সেই বাড়িটা পর্যন্ত মেয়েটা ছাড়বে না। ওর ভালো জামাকাপড় সব ও-বাড়িতে নিনোরিনা নিয়ে গেছে; দিনের বেশির ভাগ সময় কাটায় সেখানেই—কিছু কাজে না। শুধু হবে যে জীবন ওবাড়িতে ও কাটাতে পারতো, অকারণে যে জীবন ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেই জীবনের স্বপ্ন দেখে ও অনুতাপে কাটিয়ে দেয় দিনের পর দিন।

যা বলেছিলেন কম্যাণ্ডার তাই হ'ল—পলিয়ানি তাদের নিজেদের বাড়িতে নিনোরিনা কনসালভিকে পেল না। বাড়ির দাসীর কাছ থেকে ভিয়া দি পোর্তা পিনচিয়ানোতে নতুন বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে পলিয়ানি সেদিকে অগ্রসর হ'লো। যে তিক্ত মধুর বাসার ভিতর দিয়ে মেয়েটির দিন কাটছে সে কথা ভেবে পলিয়ানির মনও হয়ে উঠল ব্যথিত। বিয়ের আগেই বিধবা—ভাগ্য বাধা না দিলে কয়েকদিন পরেই যে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হতো, সেই স্বপ্নের মধ্যেই যে সে তার অতৃপ্ত আত্মার শান্তি দিনের পর দিন খুঁজে মরছে—এ কথা ভেবে পলিয়ানির রীতিমতো মন খারাপ হয়ে গেল।

কত আদর মধুর দিনের কথা ভেবে বাগদত্ত দম্পতি কত দোকান ঘুরে ঘুরে একটি একটি করে আসবাব কিনে বাড়িটিকে কত আদরে সাজিয়েছিল—কয়েকটাদিন পরেই তারা দুজনে ওখানে থাকবে। মধুর স্মৃতিতে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায় জড়ানো সেই সব জিনিসপত্র যেমন ভাবে তারা সাজিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবেই পড়ে আছে···আমাদের এই এমন সুন্দর দিনে, মধুর প্রতি ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে পলিয়ানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাতাসে কমলার আমেজমাখানো,

সূর্যের আলোয় বলয়ের ঔজ্জ্বল্য—এবং তার আবহে ভরে ভরে উঠছিল, সামনেই নতুন বাড়িটিতে খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যেখানে সকালবেলাকার রোদ্দুর এসে পড়েছে, সেখানে আজকের দিনে কোন মধুর স্বপ্নের মূর্ছনায় আতুর অবস্থায় ফ্লরিয়েত্তা ক্যাসালভিকে সে একটু পরেই দেখতে পাবে।

পদিয়ানি যখন ঘরে ঢুকল তখন ইজেলএর সামনে বসে বাগদত্ত স্বামীর একটি ছোট্ট ফোটোগ্রাফ থেকে ফ্লরিয়েত্তা একটা বড়ো-স্কেচ আঁকতে ব্যস্ত ছিল। তার মা পাশে বসে ক্যাস্তাভার সেরাত্তির লাইব্রেরি থেকে ধার করা একটা ফরাসী উপন্যাস পড়ছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কী, তার মর্যাদিক স্বপ্নের 'ভালো-বাসার' একা থাকতেই সিন্যোরিনা ক্যাসালভি পছন্দ করতো বেশি—বিশেষ করে মা-র উপস্থিতি তার কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। কিন্তু সিন্যোরার মনে মনে ভয় যে মেয়ের মনের যা রোমান্টিক হাবভাব, কোনোদিন হয়তো বা একটা দুর্ঘটনাই ঘটিয়ে বসবে—তাই তিনি কখনো ওকে একা থাকতে দিতেন না। মেয়ের দুঃখ ভোগের এই একান্ত নির্লিপ্ততায় তিনি পাশে বসে মনে মনে চটতেন—অনেক চেষ্টায় মুখ ফুটে কিছু বলতেন না।

অল্প বয়সে এই মেয়েটিকে নিয়ে সিন্যোরা ক্যাসালভি বিধবা হন—স্বামী একটি পয়সাও রেখে যান নি। জীবনের যত দুঃখদারিদ্র্য খাঁচার মধ্যে পুরে স্বামীবিয়োগের যে দুঃখকে সেই খাঁচায় বন্দী করে রাখতে তাঁর মেয়ে যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তিনি তা কোনো দিনই পারেন নি। অন্য যে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছে তার জন্যে ফ্লরিয়েত্তা কোনো শোক প্রকাশ করবে না এমন কথা তিনি বলেন না। কিন্তু তিনি ও তাঁর বর্ষিষ্ঠ বন্ধু ক্যাস্তাভার সেরাত্তি দুজনেরই মনে হচ্ছে যে মেয়ে যেন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে, তাঁর ধারণা যে ভাবী স্বামী

যে অগাধ বিষয় সম্পত্তি রেখে গিয়েছে তারই সুযোগ নিচ্ছে তাঁর মেয়ে এবং সেই জন্যেই এই অবাধ দুঃখ প্রকাশের বিলাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারছে। জীবনের রূঢ় বাস্তব সত্যগুলির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে—স্বামীর মৃত্যুবেলা বধির হয়ে যাবার আগেই তাঁকে কী রকম যুদ্ধ করতে হয়েছিল সংসার চালানোর জন্যে, তা তাঁর এখনো মনে পড়ে। মেয়ে তো তার দুঃখের সময় অনেক সহজেই দিন কাটাতে পারছে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে করলে মেয়ের এই হাল ছেড়ে দেওয়া বাড়াবাড়িকে হয়তো ক্ষমা করা যায়—বিশেষ এই অবস্থায় —তবে বেশি দিন যদি এরকম না চলে তাহ'লেই হবে। এ কথা তাঁর বন্ধু ক্যাপ্তার সেরাফ্রি প্রায়ই ব'লে থাকেন।

সিনোরার সাধারণ বুদ্ধি প্রখর, জীবনের বহু বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা, তাই তিনি অনেকবার মেয়েকে তার দুঃখবিলাপ সম্বন্ধে সংযত হতে বলেছেন, কিন্তু কোনোই ফল হয় নি। লুসিয়েতা বড্ড বেশি রোম্যান্টিক। বোধ হয়, দুঃখ যত না বেশি, দুঃখ ভোগের সুখ আনন্দটাই তাকে পেয়ে বসেছে, আর তা হয়েছে ব'লেই মুস্কিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগের শক্তি যেমন কমে আসতে থাকে ঠিক তেমনি কোনো বিশেষ ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হতে থাকে। এই দুঃখভোগের যে আনন্দ তারই ফলে জীবন মৃত্যুকে বিয়ে করছে—এই রকম অদ্ভুত একটা ধারণা অবলম্বন ক'রে প্রতিকৃতি রচনা করার কথা ওর মনে এসেছে। তারপর ঐ ওর আর একটা বিশ্রী খেয়াল: ঠিক যেমন ভাবে বাড়িটি ফুলে সাজিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে রেখে দেওয়া। যে বিবাহিত জীবন ও উপভোগ করতে পারল না, সেই প্রায়-সত্য-হয়ে-আসা স্বপ্নের ছোঁয়া দিয়ে আজও সে বাড়িটিকে ঘিরে রাখতে চায়।

পাত্রিজানি দেখা করতে এসেছে দেখে সিনোরা খুব খুশি হলেন।

জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে ভিলা বর্গেসে—চারদিকে বড় বড় সবুজ সুন্দর মাঠ, লম্বা লম্বা পাইনের সারি গভীর নীল বসন্তের আকাশকে প্রায় স্পর্শ করছে—সত্যিই চিত্তহারী।
পলিয়ানি ঘরে ঢুকতেই সিনোরিনা তাড়াতাড়ি উঠে স্কেচটা যাতে ওর নজরে না পড়ে তার চেষ্টা করতে লাগল। পলিয়ানি সামান্য বাধা দিয়ে বললে, 'লুকোচ্ছেন কেন? দিন না দেখি, কী আঁকছেন!'
সিনোরিনা লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, 'সবে মাত্র আরম্ভ করেছি কি না, তাই—'
নিচু হয়ে স্কেচটা দেখতে দেখতে পলিয়ানি বলে উঠল, 'চমৎকার আরম্ভ করেছেন। সত্যিই বেশ ভালো হচ্ছে। সবিনির ছবি, নয়? এই ফোটোগ্রাফটা দেখে এখন তাঁর মুখটা মনে করতে পারছি। আপনার আঁকাতে বেশ চেনা যাচ্ছে—কিন্তু তিনি কি দাড়ি রাখতেন?'
মেয়েটি তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'না, না, দাড়ি রাখতেন না, অন্তত আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর দেখিনি।'
'হুঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছিল।' পলিয়ানি বলল, 'চমৎকার চেহারা ছিল ভদ্রলোকের—চমৎকার।'
সিনোরিনা তার নিজের কথায় বেশ টেনে বলল, 'কিন্তু আমি তো আর ছবিটা নিয়ে এগোতে পারছি না। এই ফোটোগ্রাফটা থেকে বোঝা যায় না—মানে, আমার মনে তার যে ছবি আছে তার সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।'
পলিয়ানি বলল, 'হ্যাঁ, আপনি যা বলতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি আরো বেশি—আরো বেশি···জীবন্ত ছিলেন। আরো বেশি সজীব ছিলেন।' মা বললেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা-বার্তা হবার কিছুদিন আগে আমেরিকায় ঐ ছবিটা তোলা হয়েছিল।'
বিষাদভরা কণ্ঠে সিনোরিনা বলল, 'তার আর কোনো ছবিও আমার

কাছে নেই। দেখুন, আমি যখন এই রকম করে চোখ বন্ধ করি, মরবার আগে যে রকম সে দেখতে ছিল, ঠিক সেই মূর্তিতেই তাকে আমি দেখতে পাই। কিন্তু যে মুহূর্তে ছবি আঁকার জন্যে তুলি হাতে নিই, তখনই তার মুখটা আমি হারিয়ে ফেলি। তখন আমি ফটোটার দিকে তাকাই—মনে হয় এইটাই তার প্রায় জীবন্ত প্রতিকৃতি। আবার স্কেচটা আঁকার চেষ্টা যখন করি তখন আর ফোটোর সঙ্গে কোনো মিলই খুঁজে পাই না। আমার ছবি আঁকার বিষয়ে ক্রমেই আমি হতাশ হয়ে পড়ছি।'

সিনোরা এতক্ষণ একদৃষ্টে পলিয়ানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জুলিয়া দেখ দেখ, তুমি সরিনির থুতনির কথাটা বলছিলে না? দাড়িটা সরিয়ে দিলে থুতনিটা কেমন দেখাবে ভাবছিলে। সিনোর পলিয়ানির থুতনিটা দেখ, তোমার মনে হয় না কি—

পলিয়ানি লজ্জায় লাল হয়ে অল্প একটু হাসল। প্রায় নিজের অজানতে সে তার থুতনিটা একটু উঁচু করল। যেন সিনোরিনা কমলালড়ি ইচ্ছে করলেই মৃদু হাতে তার চিবুকটি তুলে ধরে সরিনির ছবিতে বসিয়ে দিতে পারে।

জুলিয়েত্তা মায় কথায় রীতিমতো লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করছিল। মাথা তুলে সে পলিয়ানির দিকে তাকাতেই পারলে না। তার দুঃখ নিয়ে এরকম ভাবে কথা বলা মা-র কিছুতেই উচিত হয় নি।

কিছু না ভেবেই সিনোরা বলতে লাগলেন, 'আর গোঁফজোড়াও দেখ, জুলিয়া তোমার মারা যাবার কিছুদিন আগে ঠিক এই রকমের গোঁফই রাখতো না?'

সিনোরিনা এবার রীতিমতো আহত বোধ করলে। গম্ভীর গলায় বললে, 'আমরা গোঁফের কথা আলোচনা করছিলাম না, মা। ছবিতে আমি গোঁফ রাখবই না।'

পনিয়ানি জুলিয়েত্তার কথার সঙ্গে একমত হয়ে বল্‌ল, 'না সত্যিই, গোঁফ দিলে ছবিটা ঠিক ভালো দেখাবে না।' কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস মতো নিজের গোঁফে একটু হাত বুলিয়ে নিল, তারপর বল্‌ল, 'দেখুন, সিনোরিনা আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহ'লে আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি। আপনার স্কেচটার এই কোণে কয়েকটা তুলির টান—আপনি কিছু মনে করবেন না তো? পরে আপনি ইচ্ছে করলে মুছে ফেলতেও পারেন। সন্নিনিকে আমার কতটা মনে আছে আপনাকে তা-ই দেখাতে চাই।'

পনিয়ানি চেয়ারে বসে ফোটোগ্রাফটার সাহায্যে জুলিয়েত্তার মৃত বাগ্‌দত্তের ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। খুব মন দিয়ে ওর তুলির দ্রুত টানগুলি লক্ষ্য করতে লাগল সিনোরিনা কনসালভি। তার সমস্ত মন একাগ্র হয়ে আশায় উন্মুখ হয়ে উঠল। কাজটা যত এগোতে লাগল, তত নতুন নতুন তুলির টানে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। পনিয়ানির তুলিও যেন উৎসাহ পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌ল। জুলিয়েত্তা শেষে আর তার মনের ভাব চেপে রাখতে পারল না, ব'লে উঠল, 'বা, দেখ, দেখ। সন্নিনি—একেবারে ঠিক সন্নিনি! বদ্‌লাবেন না, কিছু বদ্‌লাবেন না দয়া করে…ঠিক হয়েছে…আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ…কী সুন্দর আপনি আঁকতে পারেন! চমৎকার!'—চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে পনিয়ানি বল্‌ল, 'একটু অভ্যাস করলে আপনিও এর চেয়ে ভালো আঁকতে পারবেন। আর সন্নিনিকে আমার খুব ভালো মনে আছে কিনা তাই'—বিনয়ের সুরে বল্‌লেও জুলিয়েত্তার অকপট প্রশংসায় ও যে বেশ আনন্দ পেয়েছে সেটা প্রকাশ করতে পনিয়ানি দ্বিধা করল না।

সিনোরিনা কনসালভি তখনো স্কেচটার দিকেই তাকিয়েছিল, যেন দেখে দেখে তার আর আশ মিটছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে বল্‌ল,

'মূর্তিটা—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি হয়েছে⋯ ওঃ, আপনাকে কী ব'লে যে ধন্যবাদ দেবো!'

এই সময়, মরিনির যে ফোটোগ্রাফটা যত্নে ক'রে জুলিয়েত্তা স্কেচ, আঁকবার চেষ্টা করছিল সেটা ইজেল থেকে মাটিতে পড়ে গেল—সে তখন পলিয়ানির আঁকা ছবিটার প্রশংসায় ব্যস্ত, ফোটোগ্রাফটা মাটি থেকে তুলতে আর তার মনে রইল না।

আপনা হতে খসে যাওয়া ফোটোগ্রাফটা মাটিতেই পড়ে রইল—ছবিটার চোখে যেন বিষাদ ফুটে উঠেছে, ও যেন বুঝতে পেরেছে মাটি থেকে আর কখনো তাকে তোলা হবে না।

পলিয়ানি কিন্তু নিচু হয়ে ছবিটা তুলে জুলিয়েত্তার দিকে এগিয়ে দিল। 'ধন্যবাদ,' বলল জুলিয়েত্তা, 'এখন থেকে এই বিশ্রী ফোটোটার আর দরকারই হবে না। আপনার স্কেচটা দেখেই আমি এখন নতুন নতুন ছবি আঁকতে পারব।'

এই সময় সে একবার মুখ তুলে তাকাল। এক পলকে তার মনে হ'ল, ঘরটা যেন আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লম্বা ফরাসি জানলার ভিতর দিয়ে সুন্দর ভিলাটি আর তার চারপাশের বাগানের অপূর্ব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে জুলিয়েত্তা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতদিন দুঃখে তার মন ভারাক্রান্ত ছিল। আজ এই সুন্দর দিনের ঝলমলানো আলো তার মনের গভীরতম পর্যন্ত আলোকিত করে তুলল, তার মনে হ'ল, যে অঙ্কনকে প্রশংসা করার ঐ সাধারণ অভিব্যক্তি যেন তার মনের সব বোঝা সরিয়ে দিয়ে মুক্তির বিজয় বেলায় বাজিয়ে দিয়েছে।

এই পরিবর্তন ঘটল যেন এক মুহূর্তে। মনের ভিতরে কী যে হ'ল, মিলোবিনা কল্পনাশক্তি তার কোনো মানে খুঁজে পেল না। হঠাৎ তার ধারণা হ'ল—চারপাশের নতুনত্বের সঙ্গে সেও যেন নতুন হয়ে উঠেছে—শুধু নতুন নয়, কয়েক মুহূর্ত আগেও যে-দুঃখবোধ তাকে ঘিরে

ছিল, তা থেকে মুক্ত হয়েছে সে। খোলা জানলা দিয়ে তার বুকের মধ্যে ভরাজীবনের একটা নিঃশ্বাস প্রবেশ করে সব কিছু তোলপাড় করে তুলেছে। শুধু ভিতরে নয়, বাইরে, চারপাশের যেসব জিনিসকে প্রাণহীন বলে সে এতকাল জেনে এসেছে, যেসব জিনিসের একটুকু স্থানান্তর সে ঘটায় নি, তার মৃত্যু-স্বপ্নের পাহারায় তাকে সাহায্য করবে ব'লে সেই সব জিনিসগুলোও যেন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেছে।

পলিয়ানি তার মা-র সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়িটির এবং তার চারপাশের দৃশ্যের প্রশংসা করছে—শুনিয়েতা শুনল, মনে হল, কী মধুর কণ্ঠস্বর লোকটির! মা পলিয়ানিকে বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন, মনের মধ্যে ঝড়ের দোলা নিয়ে মেয়েও তাঁদের পিছন পিছন ঘুরতে লাগল। সত্যি সত্যি এই প্রায়-অচেনা লোকটি তার মরণ-মোহের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তাকে আবার জীবন্ত করে তুলল নাকি?

মনের এই আকস্মিক ভাবটি এত প্রবল হয়ে উঠল যে যখন তারা শোবার ঘরের কাছে এল তখন সে কিছুতেই সেই ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারল না। লক্ষ্য করল যে তার মা আর পলিয়ানির মধ্যে যেন ঘরটি নিয়ে একবার দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। আর সে নিজেকে সামলে রাখতে পারল না—একেবারে ভেঙে পড়ল কান্নায়।

যে দুঃখে সে এতদিন বহুবার ভেঙে পড়েছে সেই দুঃখই তার চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়তে লাগল। কিন্তু এবারে সে যেন এক অস্পষ্ট উপায়ে বুঝতে পারল যে তার কান্নাও কোথায় যেন বদলে গেছে—আগের মতো তার কান্নার স্বর বুকের ভিতর দুঃখের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলল না, যে সব স্মৃতি-ছবি প্রতিবার কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখের উপর ভেসে উঠতো আজ আর তাদের দেখা মিলল না। এটা সে আরো স্পষ্ট বুঝতে পারল, যখন তার মা তাড়াতাড়ি এসে আগেকার মতো সেই

একই কথায় তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, মনে জোর আনতে বললেন। এই রকমের সান্ত্বনা আজ তার মোটেই ভালো লাগল না। অনেক চেষ্টা করে সে জোর করে কান্না থামিয়ে ফেলল। পলিয়ানি যখন তার মনটা বিক্ষিপ্ত করবার জন্যে বুকল্যাণ্ডের উপর তার স্কেচ্-এর অ্যালবামটা দেখাতে বলল, তখন সে যেন কৃতজ্ঞ বোধ করল।
পলিয়ানি স্কেচ্গুলোর পরিমিত প্রশংসা করল, নতুন নতুন ইঙ্গিত দিল, ভুলগুলো দেখিয়ে দিল। প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিতে গিয়ে দুজনে আলোচনায় মেতে উঠল। সব শেষে তুলিরেখায় অসাধারণ দক্ষতার কথা উল্লেখ করে পলিয়ানি তাকে ভালোভাবে ছবি আঁকা শিখতে বলল। এই দক্ষতায় অপব্যবহার করা পাপ হবে, রীতিমতো পাপ। ছবিতে রং দেবার চেষ্টা সিনোরিনা কখনো করেছেন? করেন নি? সত্যি! কিন্তু কেন? স্কেচ্ করায় যাঁর এমন সুন্দর হাত, এমন উৎসাহ, তাঁর পক্ষে জিনিসটা মোটেও শক্ত হবে না।
ছবি আঁকা শেখানোর ভার নিতে রাজী হ'ল সে। সিনোরিনাও শিখতে রাজী হলেন। ঠিক হ'লো পরের দিন থেকেই নতুন বাড়িতে শেখানোর কাজ আরম্ভ হবে—বাড়িটি বোধ হয় তাদের ডেকে নেবার জন্যে আনন্দে উন্মুখ হয়েছিল।

প্রায় দু'মাস পরে, পলিয়ানির স্টুডিয়োতে সিয়োঁ কাঁদি সোফার উপর লম্বা হয়ে প'ড়ে ছিল। স্টুডিয়োর ভিতরে একটা বিরাট পরিবর্তন—কাজটি সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। একটা পুরনো মূর্তির ভগ্নাবশেষ, দু'পাশের কাঁধে সেফটি-পিন্ দিয়ে এঁটেছে কাঁদি। পাইপ টানতে টানতে সে সামনে কাঠের কালো টুলটার উপর একটা কংকালের সঙ্গে অদ্ভুত কথাবার্তা বলছিল। এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে মডেল করার জন্যে কংকালটা ও চেয়ে এনেছে।

কংকালটার মাথার খুলির উপর একটু বেঁকিয়ে একটা কাগজের টুপি সে পরিয়ে দিয়েছে। দেখাচ্ছে যেন কংকালটা সৈনিক—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তার-কর্ণেয়াশলি নিয়ো কল্পি পাইপ টানার ফাঁকে ফাঁকে যে উপদেশ দিচ্ছে, তাই শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

'আচ্ছা শিকারে কি তোমার না গেলেই চলত না? বুঝতে পারছ, কী একটা বিশ্রী গোলমালের মধ্যে তুমি পড়ে গেছ! কথাকার ভূতের মতো হয়েছে চেহারা—কাঠির মতো পা···সমস্ত দেহটা একরাশ হাড় ছাড়া আর কিছু নয়। বাজে কথা থাক—তুমি কী এখনো মনে করছ যে জীবনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে? দেখ, দেখ জীবন তো পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকিয়ে দেখ। কী সুন্দর করে আমি তাকে গড়েছি—যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য। তুমি বুঝি এই ভেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করছ, যে ঐ মেয়েটি সত্যিই তোমাকে বিয়ে করতে চায়? হ্যাঁ, লজ্জিত মধুর আনত ভঙ্গিতে তোমার গা ঘেঁসে সে দাঁড়িয়েছে তা সত্যি; তোমার জন্যে ঝাপসি-ঝাপসি চোখের জল ফেলেছে তাও সত্যি। কিন্তু বিয়ের আংটির কথা একবার ব'লে দেখ না—সেটি আর হবে না। ঐ সব বাজে ধারণা মাথা থেকে তাড়াও···তার চেয়ে বরং এক কাজ করো, মেয়েটির পিছনে পয়সা খরচ করো, তোমার সর্বস্ব ফেলে দাও। কী বললে?···ব্যাগভর্তি সব টাকাকড়ি আগেই ফুঁকে দিয়ে দিয়েছ! তা'হলে আমি আর তোমার জন্যে এখন কী করতে পারি বলো?···থাক, থাক, আমাকে আর শোনাতে হবে না, কী বিপদে তুমি পড়েছ! আমি আগেই জানতাম তোমার কী দুর্দশা হবে? জানো তো, পৃথিবীটা ভারি বিশ্রী জায়গা, কাউকে বিশ্বাস করার জো নেই··· তুমি জানো বোধ হয় সম্প্রতি কী ঘটেছে, জানো না? তিনি ছবি আঁকা শিখছেন—কে? কে আবার, জীবন, জীবন গো! কে শেখাচ্ছে বলো দেখি? কনস্তানতিনো পম্পিয়ানি! হাঃ, হাঃ, হাঃ—কী? ব্যাপারটা একটু

ঘোরালো মনে হচ্ছে, না? ঠাট্টার সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে? যদি তোমার অবস্থায় আমি পড়তাম তাহ'লে কী করতাম জানো? আমি পলিয়ানিকে তুরন্ত করতে বলতাম···আজ সকালে কী হয়েছে শুনেছ? আমার উপর কড়া হুকুম···তিনি পছন্দ করেন না, তাঁর বিশেষ বারণ, জীবনকে আমি নবরূপ দিতে পারব না। এখন পলিয়ানি আসলে গাধা হ'লেও, ডাক্তার তো? সে জানে যে আগে নগ্ন মূর্তি না তৈরি করলে কোনো কাপড়চোপড় পরানো যায় না। এখন মজার ব্যাপারটা শোনো। তার প্রিয়ার মুখ এই সুন্দর নগ্ন মূর্তিটার উপর বসাতে দিতে পলিয়ানি রাজী ছিলেন না। সকালে তিনি স্টুডিয়োতে ঢুকেই—দেখ নি তাকে তুমি?—বুঝলে, স্টুডিয়োতে ঢুকেই টুলের উপর দাঁড়িয়ে দু'চারটে টানেই ঐ মূর্তির যে মুখ আমি তৈরি করেছিলাম, সেটাকে একেবারে খারাপ করে দিলে। কেন এটা করল বলো তো, বন্ধু? আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, করছ কী? আধ মিনিটের মধ্যে ওকে আমি কাপড় পরাচ্ছি। নগ্ন রাখব না কিছুতেই।' কে শোনে কার কথা? ব্যাপারটা কী জানো! এখন ওরা জীবনের নবরূপ দেখতে চায়—নগ্ন, আদিম জীবন। আমার প্রথম চেষ্টা যা ছিল, সেই যে—জীবন হবে একটা রূপক, সেই ভাবটাই এখন ওরা গ্রহণ করেছে। কাজে কাজেই জুলি-য়েত্তার নিজের মূর্তি তৈরি করার কথা এখন আর উঠছেই না। ব্যাপারটা উলটে গেছে···এখন তুমি ওকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে···আর সে চাইবে তোমার কাছ থেকে পালাতে। বোঝো এখন! বলতে পারো বন্ধু, শুধু-শুধু তোমার শিকারে যাবার কী দরকার ছিল?'

—কমলা রায়

শাস্তি

গ্রামের নিচেকার খাড়াই খড়ি-পাথরের পাহাড় বেয়ে দুটি যুবক উঠছিল। লোহার কাঁটা-লাগানো বুটগুলো পিছলে যাচ্ছিল ব'লে হাত আর পা দুই-ই তাদের ব্যবহার করতে হচ্ছিল। খুব তাড়াতাড়ি ওঠার জন্যে দম প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল তাই হাঁপাতে-হাঁপাতে পিছল পথটাকে গালাগালি করছিল তারা। গ্রামের প্রবেশ-পথের সামনেই ছোটো একটা কুয়ো। তার চারপাশে একদল মেয়ে গল্প করছিল। পাহাড়ের পাশ দিয়ে তাদের দু'জনের টকটকে লাল দুটো মুখ দেখা যেতেই মেয়েরা ঘাড় ফিরিয়ে চাইল: ওরা সেই দু'ভাই নয়তো? তাইতো, নেলি আর সাবো ভরতোরিচি! আহা বেচারারা! কিন্তু এই ব্যস্ততার কারণটা কী?

ছোটো ভাই নেলির আর এক পা নড়বার ক্ষমতাও ছিল না। মেয়েদের কথার জবাব দেবার জন্যে এবং একটু দম নেবার জন্যে সে দাঁড়াল। সাবো কিন্তু তার হাত ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে চলল [illegible]

যাবার সময় নেলি ব'লে গেল, 'আইরল্যান্ডের [illegible] কথা বলছিলুম—সম্পর্কে আমাদের ভাই!' হাত দুটো উপরে তুলল সে, যেন প্রার্থনা করল ঈশ্বরের কাছে।

আতঙ্ক ও ভয়-মেশানো স্বরে মেয়েদের দল আর্তনাদ করে উঠল। তাদের একজন প্রশ্ন করল, 'কে করেছে এ-কাজ?'

'কেউই না! ভগবানের মার!' দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল নেলি। চাদনি-চকে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ি। তারা ব্যস্তভাবে সেদিকে এগিয়ে গেল।

পায়ে এক জোড়া পুরনো চটি, শার্টের বোতামগুলো খোলা আর আস্তিন দুটো গুটোনো—এই অবস্থায় ডাক্তার সিনোরো নপিক্কোলো ঘরময় পায়চারি করছে। ঘুমের অভাবে চোখ দুটো ফোলা-ফোলা আর জলে ভারি। তার ফোলা গালের উপর অযত্ন কদিনের দাড়ি জমেছে। প্রায় বছর নয়েকের একটি মেয়ে তার কোলে, একেবারে কংকালসার। ভুগে-ভুগে তার রঙ হলদেটে হয়ে গেছে।

গত এগারো মাস ধরে স্ত্রী তার একেবারে শয্যাশায়ী। যে-মেয়েটি কোলে ছিল তাকে বাদ দিয়ে এ-সংসারে আরো ছ'টি ছেলেমেয়ে। মেয়েটিই বড়। ছেলেগুলো যেমন দুরন্ত তেমনি নোংরা। বাড়িটাও অসম্ভব অগোছালো : মেঝের কাচের বাসনের টুকরো, ফলের খোসা আর রাশিরাশি ময়লা, চেয়ারগুলো ভাঙা, আরামকেদারায় বসার জায়গাগুলোয় গর্ত, কে জানে কতদিন বিছানা পাতা হয়নি, বিছানার চাদরগুলোও কুটিকুটি হয়ে এসেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়—বাচ্চা শয়তানগুলো বিছানার উপর বালিশ নিয়ে লড়াই-লড়াই খেলে।

কোনো-এক-দিন যেটা বসার ঘর ছিল তার দেয়ালের উপরকার শুধু একটি ছবি এখনো অক্ষত। ডাক্তার সিনোরো নপিক্কোলো ডিগ্রিটা পাবার কিছুদিনের মধ্যেই একটি ছবি তোলা হয়েছিল। তখন সে তরুণ। সেই ছবিটাকেই বড় করে এখানে টাঙানো হয়েছে। ছবিতে তাকে দেখাচ্ছিল পরিপাটি, এমন কি শৌখিন, খুব ফুর্তিবাজ আর হাসিখুশি।

চটি ফটফট করে ছবিটার কাছে গিয়ে ভেংচি কেটে মেয়েটিকে তুলে ধরে বলল, 'দেখলে তো গিগিনে!'

'গিগিনে' তার ডাক-নাম। অনেক, অনেক দিন আগে ক্যাম্পাস্তে চাইলে মা তাকে ঐ নামে ডাকত। তার মা-র আদুরে-ছেলে ছিল সে। অনেক আশা করা হয়েছিল তার উপর। সবাই ভেবেছিল ভবিষ্যত তার উজ্জ্বল।

চাষী দু'জনকে দেখে প্রায় খ্যাপা কুকুরের মতো সে তেড়ে গেল।
'কী দরকার তোমাদের ?'
হাতে টুপি নিয়ে তখনো হাঁপাতে-হাঁপাতে গায়ো তরতোবিচি বল্
'ডাক্তারবাবু, আমাদের এক ভাই—আহা বেচারা—প্রায় মর
বসেছে।'
'ছোকরার কপাল ভালো বলতে হবে। উৎসবের ব্যবস্থা করেছ
চেঁচিয়ে উঠল ডাক্তার।
'না-না ডাক্তারবাবু···সে মরতে বসেছে···হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়ল·
কী যে অসুখ কিছুই বুঝছি না। মস্কেলুগায় এক আস্তাবলে পা
রয়েছে।'
এক পা পিছিয়ে ভীষণ রেগে ডাক্তার বলল, 'মস্কেলুগায় ? হা ভগবান
সে জানে পথ ধরে গেলে জায়গাটা গ্রাম থেকে পাক্কা সাত মাইল-
আর সে কী পথ!
'আজ্ঞে হাঁ। দোহাই আপনার, যত শিগগির হয় আসুন।' অনুনয় কর
বলল তরতোবিচি। 'মেটুলির মতো সে কালো হয়ে গেছে আর এম
ফুলেছে যে দেখলে ভয় করে। দোহাই আপনার, আসুন।'
'কী! হেঁটে যেতে হবে নাকি ?' আবার চিৎকার করে উঠল ডাক্তা
'পায়ে হেঁটে দশ মাইল ? মাথা খারাপ নাকি ? একটা ঘোড়ার ব্যব
কর, বুঝলে ? তোমাদের খচ্চর নেই ?'
'আমি দৌড়ে গিয়ে এখুনি জোগাড় করছি,' তাড়াতাড়ি তরতোবি
উত্তর দিল। 'কারুর কাছ থেকে ধার করে আনছি।'
ছোটো ভাই মেনি বলল, 'আমি ততক্ষণ তাড়াতাড়ি গাড়িটা কামি
আসি।'
এমনভাবে ডাক্তার তাকাল যে পারলে তাকে এখুনি গিলে ফেলে।
'আজ রোববার কিনা ডাক্তারবাবু,' অপ্রস্তুত হয়ে মেনি জানাল, '

যাবার বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে গেছে কিনা …'

হেসে আত্মবিস্মৃত হয়ে ডাক্তার বল্‌ল, 'বটে! তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো? ধর তা হ'লে এটাকে।'

ব'লে রুগ্ন মেয়েটাকে তার কোলে গুঁজে দিল। তারপর অন্য ছেলে-মেয়েদের, যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, এক-এক করে তার দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগল, 'আর এটাকে,' 'আর এটাকে,' 'আর এটাকে,' 'আর এটাকে'…'গর্দভ কোথাকার,' শেষে আবার বল্‌ল, 'গর্দভ কোথাকার।'

যেন চলে যাবার জন্যেই সে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ফিরে এসে রুগ্ন মেয়েটাকে আবার কোলে নিয়ে তাদের বল্‌লে: 'দৌড়ে একটা খচ্চর জোগাড় করে আনো। এখুনি যাবো।'

তার ভাই-এর পিছন-পিছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে নেলি তরতোরিচি আবার হাসতে লাগল। তার নিজের বয়স কুড়ি, আর আমুৎসার, যার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছে, বয়স ষোলো। ভারি সুন্দরী সে। সাতটা ছেলেমেয়ে? তা-ও যথেষ্ট নয়। সে চায় বারোটা, পুরো এক ডজন! অবশ্য এ-কথা সত্যি যে ঈশ্বরদত্ত সবল দুটো হাত-ছাড়া তাদের জীবিকা উপার্জনের আর কোনো উপায়ই নেই, কিন্তু হাসিমুখে যে-কোনো কাজ করতে সে প্রস্তুত। তার দুটো জিনিস ভালো লাগে: কাস্তে চালাতে আর গান গাইতে। কাজ করতে-করতে গান বাঁধতে পারে বলে লোকে তাকে 'লায়লা' (কবি) ব'লে ডাকে। পরোপকারী আর সর্বদা হাসিখুশি ব'লে সবাই যে তাকে পছন্দ করে—এ-কথাটাও সে জানে। সব সময়েই সে হাসে, সবাইকেই বিলোয় তার হাসি—এমন কি আকাশ-বাতাসকেও। রোদে পুড়ে এখনো তার চামড়া তামাটে হয়নি। তার একমাথা কোঁকড়ানো গাঢ় সোনালি রঙের চুল দেখে মেয়েরা পর্যন্ত হিংসে করে। উজ্জ্বল নীল চোখ মেলে একটি

বিশেষ ভঙ্গীতে সে তাকাতে জানে। সেই চাউনির সামনে কত মেয়ে যে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে তার ঠিক নেই।

তার দূর সম্পর্কের ভাই জাফর অসুখে সে রাতন থাকতে পড়েছে। আরো দুর্ভাবনা হয়েছে সুৎসার জন্যে। মেয়েটা নিশ্চয়ই বেজায় চটে থাকবে—বেচারা দু'দিন ধরে এই রবিবারের জন্যে কী ভাবেই না অপেক্ষা করে আছে। আজকের দিনে অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্যেও তো তারা একসাথে থাকতে পেতো। কিন্তু কী করেই বা সে কিছু না-করে চুপচাপ থাকতে পারে? তা হ'লে যে পাপ হবে। বেচারা জুবৈরলাল্লুর জাফ। তারও বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল—আর একেবারে হঠাৎ কিনা তার মাথায় এই বাজ ভেঙে পড়ল! মস্কেলুসার লোপেসের জমিতে গাছ ঝাঁকিয়ে বাদাম পাড়ার কাজে সে বাহাল ছিল। তার আগের দিনটা ছিল শনিবার। হঠাৎ আকাশটা মেঘে ভারি হয়ে এল। তাই ব'লে শিগগিরই যে বৃষ্টি হবে এমন মনে হ'ল না। দুপুরের দিকে লোপেস মিত্র বলল, 'ওহে ছোকরারা শুনছো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মেঘটা জল ঢালতে সুরু করবে। বাদামগুলোকে ভিজে জমিতে ফেলে রাখতে চাই না। বাদাম-পাড়া থামাও।'

যে-মেয়েরা ফলগুলো জড় করছিল তাদের ডেকে সে আদেশ দিলে পাহাড়ের পাশের গুদামে গিয়ে খোসা ছাড়াবার কাজে লাগতে। যে-সব পুরুষরা গাছ থেকে বাদাম পাড়ছিল, সে-দলে জুবৈর আর সাতো তরতোবিচিত্ত ছিল। তাদের দিকে ফিরে সে জানাল, 'ইচ্ছে হ'লে তোমরাও মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে খোসা ছাড়াতে পার।'

উত্তরে জুবৈরলাল্লুর জাফ বলল, 'আমি যাবো বটে, কিন্তু রোজকার মজুরি পঁচিশ সনতো আমাকে দিতে হবে।'

'না, শুধু আধ-দিনের জন্যে ঐ হিসেবে পাবে,' 'বাকী আধ দিনের জন্যে মেয়েরা যেমন আধ দিনে পায়, সেই হিসেবে দেবো।'

ঘোর অধিকার, সন্দেহ নেই। পুরুষরা নিজেদের কাজ করে পুরো দিনের যে মাইনে পায় তা কেন যে পাবে না তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আর সত্যিই, এদিকে দিনে তো বৃষ্টি হ'ল না, এমন কি রাত্রেও না।

'এক দিনে আধ দিয়া এই হিসেবে আপনি মাইনে দেবেন?' চিৎকার করে উঠল ক্লুইরুনাল্লুহ আর। 'বেশ, ভালো! কিন্তু কাজ আমি করবো না। আমি পুরুষের পোশাক পরি, মেয়েদের ঘাঘরা তো আর পরি না! একদিনে পঁচিশ সেন্টো এই হিসেবে আমার আধ দিনের মাইনে চুকিয়ে দিন। আমি চললুম।'

সে অবশ্য গেল না, তার ভাইয়ের জন্যে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল। একদিনে আধ দিয়া এই হিসেবে মেয়েদের সঙ্গে খোসা ছাড়াবার কাজ করতে তারা রাজী হয়েছিলো। দাঁড়িয়ে দেখতে আর অপেক্ষা করতে করতে অল্পক্ষণেই তার বিরক্তি ধরে গেল তাই কাছা-কাছি এক আস্তাবলে গিয়ে সে রইল ঘুমিয়ে। সঙ্গীদের সে বলে গিয়েছিল ফেরার সময় তাকে যেন ডেকে নিয়ে যায়।

মাত্র দেড় দিন ধরে তারা বাদাম-গাছ ঠেঙিয়েছিল ব'লে কল অনেক বাড়তি হয়েছিল। মেয়েরা তাই প্রস্তাব করল সন্ধের দিকে কিছু বেশি কাজ করে, বাকী রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরের দিন রাত থাকতে উঠে গ্রামে ফিরে যাবে। এ প্রস্তাবে সবাই রাজী হ'ল। তাদের জন্যে সোপেস এক গামলা বরবটি আর কয়েক বোতল মদ দিল আনিয়ে। রাতদুপুরে কাজ শেষ হবার পর বাদামের খোসা জমিতে স্ত্রী-পুরুষ সবাই শুয়ে পড়ল। শিশিরে তখন খড়গুলো ভিজে, যেন সত্যি-সত্যিই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

'সায়রা, আমাদের গান শোনাও!'

আর দেরি গানের পর গান বেঁধে চলল। চাঁদটা এলোমেলো মেঘে

কখনো ঢাকা পড়ছে, কখনো মেঘ থেকে বেরিয়ে আসছে, কখনো সাদা, কখনো কালো সেই মেঘ। চাঁদটা যেন তার মুৎসার মুখ, তাদের প্রেমের আনন্দ আর বেদনার মতো কখনো যেন হাসছিল, কখনো আসছিল কালো হয়ে।

মুইরলান্দ্র আর সেই আস্তাবলেই প'ড়ে ছিল। ভোর হবার আগে তাকে জাগাতে গিয়ে সারো দেখল সে মরে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে রয়েছে আর তার সমস্ত শরীর ফুলে উঠেছে কালো হয়ে।

নাপিতের দোকানে বসে নেলি তরতোমচি এই গল্পটাই বলছিল। গল্পটা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে নাপিত তার থুতনির কাছে খানিকটা কেটে ফেলল। ছোট্ট একটুখানি ক্ষত, মাথা ঘামাবার মতো কিছুই নয়। সেই মুহূর্তে দরজায় দেখা গেলো মুৎসাকে, সঙ্গে তার মা আর মিতা মুমিয়া—ফলে লোকটার অসাবধানতা সম্বন্ধে অভিযোগ করার সময় পর্যন্ত সে পেল না। মুইরলান্দ্র ডাক্তর সঙ্গেই মিতা মুমিয়ার বিয়ের ঠিক হয়েছিল। বেচারি তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল নিজের পোড়াকপালের কথা ভেবে।

মেয়েটি তার ভাবী স্বামীকে দেখবার জন্যে হজেলুসায় যাবে ব'লে বায়না ধরল। বহু কষ্টে নেলি নিরস্ত করল তাকে। মেয়েটিকে কথা দিল সন্ধের আগেই তাকে দেখতে পাবে—যেমন করেই হোক তাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে তারা। সেই মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে সারো এসে জানাল ডাক্তার রওনা হচ্ছে। আর এক মুহূর্তও সে দেরি করতে রাজী নয়। মুৎসাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে নেলি তাকে অনুনয় করে বলল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে: রাত্রির আগেই সে ফিরবে, তাকে কত কথাই না তার বলার আছে…

বাস্তবিক অদ্ভুত রাস্তাটা। কয়েকটা গভীর খাদের ধার দিয়ে যাবার সময় ডাক্তার নিশ্চিকোনো জীবনের আশাই প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, যদিও রাস্তার ধারে তার একপাশে ছিল পাহাড়, অন্য পাশে দেখি। নিচে শস্যক্ষেত, জলপাই আর বাদামের বাগান-ভরা বিরাট বালভূমি-উপত্যকা। ফসলের গোড়াগুলো হলদে, মাঝে মাঝে খানিকটা জমির রঙ কালো—সার তৈরির জন্যে সেখানে আবর্জনা পোড়ান হয়েছে। অনেক দূরে সমুদ্র দেখা যায়, কটকটে নীল তার রঙ। ডুমুর, ঝাউ, জলপাই আর অ্যাকেশিয়া গাছের ফিকে গাঢ় নানা ধরনের চির-সবুজ রঙ চোখে পড়ে, বাদাম গাছের চুড়োগুলো কিন্তু ইতিমধ্যেই পাতলা হতে আরম্ভ করেছে। তাদের চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত বড় পাহাড়ের মতো বাতাসে-উড়ে-আসা মেঘ। কিন্তু বাতাস থাকা সত্বেও অসহ্য গরম। রোদে ফেটে যাচ্ছে পাথরগুলো। মাঝে মাঝে ধুলোয় ঢাকা ফণিমনসা ঝাড়ের ওপাশ থেকে ডাহুক আর নীলকণ্ঠ পাখির পরিষ্কার ডাক কানে আসে। শব্দ শুনে বাচ্চাটা ভয়ে কান খাড়া করে উঠল।

'ভারি পাজি জানোয়ার। ভারি পাজি!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল ডাক্তার। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল জানোয়ারটার মাথার দিকে। সবুজ কাপড়ের ছাতাটা কাঁধ থেকে ক্রমশ সরে যাওয়ায় তার মুখে রোদ এসে পড়ল। তবু সেদিকে তার খেয়াল নেই।

তারা দু'ভাই সাহস দেবার জন্যে বলল, 'আপনি ভয় পাবেন না। আমরা তো রয়েছি।'

নিজের জন্যে ডাক্তারের অতটা ভয় ছিল না—কিন্তু গাধা-বাচ্চাটার কথা ভেবেই সে ভয় পেল। ঐ সাতটা অসহায় জীবের জন্যেই তার নিরাপদে থাকা দরকার।

তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে দু'ভাই গল্প জুড়ল। ফসলের কথাই তারা পাড়ল: গম আর বরবটি কী রকম ভাল হয়েছে এবার; আর বাদাম

পাটের কথা তো সবাই জানে, এ-বছর তো কিছুই ফলেনি—এক বছর অন্তর তাদের ভালো ফলন হয়। আর কলাই! কলাইয়ের কথা না-বলাই ভালো—এ-বছরের গোড়ায় কুয়াশা লেগে তার বাড় বন্ধ হয়ে গেছে, বড় হতে পারেনি। চাষীরা আলু দিয়ে যে তাদের লোকসান পুষিয়ে নেবে সে আশাও নেই, সে অঞ্চলের প্রত্যেকটা আলুর গাছকেই কী-এক রোগে ধরেছে…

'কী সুন্দর ভবিষ্যৎ!' মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক্তার শুধু বলতে লাগল।

ঘণ্টা হাঁটবার পর বলার মতো সব কথা শেষ হল। এখান থেকে অনেকটা পথ সোজা চলে গেছে—পুরু সাদা ধুলোয় ঢাকা। খচ্চরের খুরের শব্দের সঙ্গে চাষী দুজনের লোহার নাল লাগানো বুটের শব্দ মিশতে লাগল। নিজের মনেই লায়লা গান ধরল—কিন্তু থামল চট করে। কোনোদিকে জনমানবের দেখা নেই। রবিবার ব'লে চাষীরা সব উপরের গ্রামে রয়েছে। কেউ বা গির্জেয় যাবে, কেউ বা কেনাকাটা সারবে, কেউ বা করবে ফুর্তি। মরেদুগায় সম্ভবত ঘুইরলান্দুর [illegible] কাছে কেউ-ই নেই। কে জানে এখনো সে বেঁচে আছে কি না। সম্ভবত তাকে মৃত্যুর মুখে একা রেখে সবাই চলে গেছে…

আর সত্যিই দেখা গেল সেই দুর্গন্ধময় আস্তাবলের দেয়ালের পাশে একলা পড়ে আছে সে, সারো আর লেলি যেমনটি তাকে রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থায়। সর্বাঙ্গ ভীষণ ফুলেছে, মুখ দেখে আর চেনবার জো নেই। শব্দ করে অতি কষ্টে নিশ্বাস নিচ্ছে। খড় রাখবার তাকের পাশের জানলা দিয়ে রোদ এসে তার মুখে পড়েছে, সে-মুখ কোনো মানুষের ব'লে মনে হয় না। সবটা এতো ফুলেছে যে নাকটা আর দেখাই যায় না; ঠোঁট দুটো কালো আর সাংঘাতিক ফোলা। সেই ঠোঁট দুটোর ভিতর দিয়ে হাপি খাবার মতো করে নিশ্বাস

পড়ছিল। শব্দ শুনলে মনে হয় যেন রেগে গর্জন করছে। এক টুকরো খড় তার কালো কোঁকড়ানো চুলে আটকে গিয়ে রোদে ঝকঝক করছে।

তাকে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তারা তিনজন দরজায় থমকে দাঁড়াল। যেন আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে। খচ্চরটা আস্তাবলের গা ঘেঁষে মেঝের উপর খুর ঠুকে নাকের ভিতর দিয়ে শব্দ করতে লাগল। তারপর সারো তাড়াতাড়ি মরণাপন্ন লোকটির কাছে গিয়ে সস্নেহে বলল, 'জুইরলা! জুইরলা! এই দেখ ডাক্তার এসেছে!'

নেলি জানোয়ারটাকে খড়-গাদার তাদের কাছে বাঁধবার জন্যে নিয়ে গেল। দেয়ালে একটা দাগ, যেন আরেকটা জন্তর ছায়া—সাধারণত যে-গাধাটাকে এখানে বেঁধে রাখা হয় এটা তারি—সারাদিন সে দেয়ালের চুনে গা ঘষে।

জাককে জাগাবার চেষ্টা আর-একবার করা হ'ল।

হাঁপানি থামিয়ে কোনো রকমে চোখ মেলল সে। আতঙ্কে ভরা তার চোখ দুটো টকটকে লাল, চারদিকে কালো রেখা। বীভৎস মুখটা হাঁ করে সে ঘড়ঘড় শব্দ করতে লাগল, মনে হ'ল তার স্বর বুঝি গলার কাছে এসেই বন্ধ হয়ে যাবে।

'আমি···ম'রে গেলাম···'

'না, না,' আর্ত স্বরে তাড়াতাড়ি জবাব দিল সারো। 'এই দেখ ডাক্তার তোমাকে দেখতে এসেছেন। আমরা তাঁকে নিয়ে এসেছি। তাঁকে দেখতে পাচ্ছো?'

মুমূর্ষু জাক কাতর স্বরে বলল, 'গ্রামে···নিয়ে চল···ও মা, মাগো···' বহু কষ্টে হাঁপাতে-হাঁপাতে কথাগুলো সে বলল। দুটো ঠোঁট এক করতে পারল না।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমরা নিয়ে যাবো। আমরা একটা খচ্চর এনেছি।

এই দেখো,' দ্রুতস্বরে জানাল সাবো।

'তোমাকে আমি কোলে করে নিয়ে যেতে পারি ডুইরলা,' তার পাশে তাড়াতাড়ি এসে ঝুঁকে পড়ে নেলি বলল। 'ভয় পেয়ো না—তুমি সেরে উঠবে।'

নেলির স্বর শুনে ডুইরলাসুদ্ধ জাক ধীরে-ধীরে মাথা ফিরিয়ে টকটকে চোখে স্থিরভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি। তারপর হাত বাড়িয়ে তার ভাই-এর কোমরে বাঁধা নিজের লাল রুমালটা মুঠো করে ধরল।

'আরে কে…তুমি নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি। আমি নেলি। কিছু ভেব না। কেঁদো না ডুইরলা, কেঁদো না।…তোমার কিছুই হয়নি।'

রোগীর বুকের উপর সে হাত রাখল। জাক ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে লাগল কাঁদতে, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুল না। কয়েক মুহূর্ত ধরে নিষ্ফল চেষ্টা করে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মাথা ঝাঁকানি দিল, শেষটায় এক হাত বাড়িয়ে নেলির মাথাটা ধরে নিজের কাছে টেনে আনল।

'আমাদের একই দিনে বিয়ে হবার কথা ছিলো…,' সে বলল।

তার গলা থেকে হাতটা খুলতে-খুলতে নেলি উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই—একই সঙ্গে আমাদের বিয়ে হবে, তাতে কোনো ভুল নেই।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করছিল। অসুখটা যে 'গ্ল্যাণ্ডার্স' সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ রইল না। 'আচ্ছা বল তো,' সে প্রশ্ন করল, 'কোনো ঘোড়া-বাছুরে কামড়েছে ব'লে কি মনে পড়ছে?'

জাক মাথা নাড়ল। 'ঘোড়া বাছুর?' প্রশ্ন করলে সাবো।

সেই দুই নিরক্ষর চাষীদের ডাক্তার তার সাধ্যমতো ব্যাপারটা বোঝাল। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো জানোয়ার গ্ল্যাণ্ডার্স রোগে মরেছে আর তার মৃতদেহটা কোনো খামারে ফেলা হয়েছে। অথবা মাছি এসে

বসেছে তার উপর। সেই মাছিগুলোর মধ্যে একটা উড়ে এসে জাকব দেহে ঐ রোগের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে।

ডাক্তারের বোঝাবার সময় জাক দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। তারা কেউ জানলোও না যে মৃত্যুর বাহনটি সারাক্ষণ সেখানেই রয়েছে। এতো ছোটো যে প্রায় দেখাই যায় না। সে আর কেউ নয়—ঘরের দেওয়ালে বসে-থাকা ছোট্ট একটা মাছি। এমনিতে মনে হয় বুঝি চুপচাপ বসে আছে কিন্তু কাছে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে মাঝে মাঝে সে তার ছোট্ট শুঁড়টা বার করে চুষছে, নয় তো সামনের পা দুটো বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ঘষে চটপট পরিষ্কার করে ফেলছে।

ডাক্তার তখনো কথা বলছিল, হঠাৎ মাছিটাকে হুইরলামুহ্ দেখতে পেল। এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে।

একটা মাছি···হয়তো এটাই, হয়তো নয়—কে জানে? এখন তার মনে পড়ছে বটে কাল যখন বসে-বসে ভাবছিল জোসেফের বাগানের খোলা ছাড়িয়ে কতক্ষণে তার ভাইরা আসবে, একটা মাছি তখন ভারি বিরক্ত করেছিল তাকে···সেটাই কি?

হঠাৎ মাছিটাকে সে উড়ে যেতে দেখল। চোখ ফিরিয়ে সে লক্ষ্য করতে লাগল কোথায় সেটা যায়।

ওই যা! সেটা যে দেলির গালে বসল। গাল থেকে নিঃশব্দে সেটা দুই ক্ষিপ্র লাফ মেরে থুতনির উপর, তারপর নাপিতের ক্ষুরে যেখানটায় কেটে গিয়েছিল, ঠিক সেখানে বসে পেটুকের মতো খেতে লাগল।

অত্যন্ত মন দিয়ে সেটাকে দেখতে-দেখতে হুইরলামুহ্ জাক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'ল। তারপর বহু কষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করে মুমূর্ষু স্বরে প্রশ্ন করল, 'একটা মাছি?···একটা মাছির পক্ষে এটা সম্ভব···?'

'নিশ্চয়ই, কেন একটা মাছি পারবে না?' উত্তরে বলল ডাক্তার।

আর কোনো কথা না বলে হুইরলামুহ্ জাক মাছিটাকে দেখতে লাগল।

এদিকে ডাক্তারের কথায় নেলি এমন তন্ময় হয়েছিল যে মাছিটাকে তাড়াবার কোনো চেষ্টাই করল না। জাক আর শুনল না। ডাক্তার যে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে, এতে সে খুশি হয়ে উঠেছে। কারণ নেলি পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে তার কথা শুনছে, তার সমস্ত মন পড়ে আছে সেই কথার দিকে। ফলে মুখের উপরকার মাছিটাকে সে লক্ষ্যই করছে না। কী মজা! এবারে সত্যিই তাদের বিয়ে হবে এক সঙ্গে…। তার তরুণ ভাই-এর নিটোল স্বাস্থ্য আর রঙিন ভবিষ্যৎ দেখে একটা গভীর ঈর্ষা আর ভোঁতা বিদ্বেষে ভরে উঠেছিল তার মন—কেবলি মনে হচ্ছিল এই সুন্দর জীবন অকস্মাৎ যেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

শেষে এক সময় নেলির মনে হ'ল যেন কিছু একটা তাকে কামড়াচ্ছে। হাত তুলে মাছিটাকে সে তাড়িয়ে দিল, তারপর থুতনির যেখানটা কেটে গিয়েছিল সেখানটা টিপতে লাগল। জাকের দিকে ফিরে দেখল একদৃষ্টিতে তার দিকে সে তাকিয়ে আছে। রুগ্ন লোকটির বীভৎস ঠোঁট দুটো এক বিশ্রী হাসিতে কুঁকড়ে উঠতে দেখে তার একটু অস্বস্তিই হ'ল। কিছুক্ষণ তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর, যেন নিজের অনিচ্ছাতেই জাক ব'লে ফেলল, 'ওই মাছিটা··

নেলি বুঝল না। তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল, 'কী বললে?'

'ওই মাছিটা···' জাক আবার বলল।

'কোনটা? কোথায়?' আতঙ্কিত হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে নেলি প্রশ্ন করল।

'ওই যে ওখানটায়···যেখানটায় তুমি ঘষছো।···ওটা যে মাছি—আমি দেখলুম ওটা মাছি—' বলে জাক বীভৎসভাবে হাসতে লাগল।

ডাক্তারকে নেলি তার থুতনির কাটা জায়গাটা দেখাল।

'এখানটায় কী হয়েছে বলুন তো? ভীষণ জ্বলছে···'

জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা করে ডাক্তার যেন বেশ ভয়ই পেয়ে গেল। তারপর আরো ভালো পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন নিয়ে গেল বাইরে। সারো চল্‌ল তাদের পিছনে।

তারপর কী হ'ল? গভীর উৎকণ্ঠায় কাঁপতে-কাঁপতে কুইরলাবুড়ু আর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু কিছুই জানতে পারল না। অস্পষ্টভাবে সে শুনতে লাগল বাইরেকার কথাবার্তা। হঠাৎ ব্যস্তভাবে সারো ঘরে ঢুকে কুইরলার দিকে না তাকিয়েই খড়টাকে তুলে তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে গেল। সে বিড়বিড় করছিল, 'হা ভগবান! আমার নেলি…আমার ছোট্ট নেলি…'

তা হ'লে সত্যিই তাই! তারা তাকে কুকুরের মতো মৃত্যুর মুখে একা ফেলে চলে গেল! কোনো রকমে কনুইতে ভর দিয়ে উঠে দুবার সে ডাকল, 'সারো…সারো…'

সব চুপ। কোথাও কেউ নেই।

নিজেকে আর সে কনুই-এর উপর ভর দিয়ে খাড়া রাখতে পারল না, মেঝের উপর পড়ল আছড়ে। গ্রামের এদিকটা যে কী রকম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সেটা যাতে লক্ষ্য করতে না হয় সেজন্যে কিছুক্ষণ সে খড়ের বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে রইল—কী ভয়ংকর স্তব্ধতা! হঠাৎ তার সন্দেহ হ'ল সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন নয়তো? জ্বরের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখছে না তো? কিন্তু দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার সেই মাছিটাকে সে দেখতে পেল, একই জায়গায় আবার এসে বসেছে।

ঠিক, ঠিক! ওই তো ওখানেই রয়েছে ওটা!…

মাঝে মাঝে তার ছোট্ট শুঁড়টা বের করে সে দুলছে, নয় তো তার সামনের পা দুটো বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ঘষে ঘষে চটপট পরিষ্কার করে ফেলছে।

—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[illegible]

ঝিয়ের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে সিনোরা মানজুনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচা গেল।' রোম থেকে কবে চিঠি এসে পৌঁছবে সিনোরা তারই দিন গুনছিলেন। এরিয়ো মোরিকে উনি ব'লে দিয়েছিলেন এমিলিয়ার ছেলেপুলে হ'লেই যেন সব খবর দিয়ে চিঠি লেখে। এ সেই চিঠি।

তাড়াতাড়ি পাঁসনেটা পরে তিনি চিঠি পড়তে সুরু করলেন। জামাই টেলিগ্রাম করে আগেই জানিয়েছিল যে মেয়ে খুব কষ্ট পেয়েছে, যদিও ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। এখন চিঠি পড়েই বোঝা গেল সত্যিই বিপদের সম্ভাবনা ঘটেছিল; এমন কি শেষ পর্যন্ত ধাত্রীবিদ্যার বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তারও ডাকতে হয়েছিল। মোরি আরও লিখেছে যে পাছে শ্বশুর-শাশুড়ির ভাবনা বাড়ে তাই আগে সব কথা সে জানায়নি। এখন অবশ্য অন্য কথা, কারণ ভালোয়-মন্দয় ব্যাপারটা তো চুকেই গেছে। অনুযোগ করেছে যে এমিলিয়া তার কথা না মেনে চলাতেই এমন হ'ল। মোরি বারণ করা সত্ত্বেও একেবারে শেষদিন পর্যন্ত আঁটসাঁট জামা আর হিল-তোলা জুতো পরতে সে ছাড়েনি।

'কি কথাই লিখেছে, হিল-তোলা জুতো পরতে ছাড়েনি, নিরেট বুদ্ধু কোথাকার।' যত চিঠি পড়েন সিনোরার তত বিরক্তি বাড়ে। কটমট করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন। হাতের কাছে কাউকে পেলে যেন মনের ঝাল মিটিয়ে নেন।

'বোকাটা কী লিখেছে দেখ। খোকার ধাইমা রোমের লোক হ'লে চলবে

যায়। ব্যবসা করে উনি যে প্রচুর অর্থ জমিয়েছেন তাঁর ধারণা সম্ব
এই প্রেরণাদায়ক। একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে সিমোরা বললেন, '(
লোকটি কে শুনি?'

'তিতা মাকরোর বৌ।'

'তিতার বৌ? ওই দাগী চোরটার?'

'চুপ করো।'

'ওই লোক ক্যাপাবার সর্দারটার বৌ?'

'বাজে বোকোনা বলছি।'

'জেলখানার কয়েদীর বৌ শেষকালে...'

'আমায় একটু বুঝিয়ে বলতে দাও তো। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি আর কত হবে? ভগবান তোমাদের মাথায় মস্তিষ্কের বদলে গোবর পুরে দিয়েছেন। আজকালের সামাজিক ব্যবস্থায়...'

অবাক হয়ে সিমোরা জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মধ্যে আবার সামাজিক অবস্থার কথা এল কী করে?'

'আসে বৈ কি, রীতিমতো আসে। এই ধরোনা, আমরা যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাকে বলে বুকের রক্ত জল করে দুটো পয়সা জমিয়েছি, আমাদের সামনে এখন কী রয়েছে জানো? একটা অনিশ্চিত সংকটময় ভবিষ্যৎ। মাথায় ঢুকছে কথাটা?'

'কী যে বলছো তার মাথামুণ্ডু নেই।'

'তা তো বলবেই। সাধে যদি তোমাদের মাথায় গোবর পোরা।'

রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে সিমোর অসহিষ্ণুভাবে একটা চেয়ার টেনে স্ত্রীর চেয়ারের কাছে গিয়ে বসলেন। চাকরেরা পাছে আড়ি পেতে কথা শুনে ফেলে সেই ভয়ে কর্তা গলা নামিয়ে বলতে শুরু করলেন—

'মাকরোকে জুতির কারখানা থেকে তাড়িয়েছিলাম কেন জানো? ওর মাথায় জনজাগরণের ভূত ঢুকেছিল বলে।'

'ওতে আর তোমার পায়ের জামাই যোসিতে কী তফাৎ বলো তো? তবু মেয়ে দিতে বাধলো না তোমার ওই সোশ্যালিস্ট উকিলটার হাতে?' সিনোর অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেন? আমায় দুটো কথা বলতে দেবে কি না? যোসির হাতে মেয়ে দিয়েছি কেন—এই তো? প্রথমত যোসি চমৎকার ছেলে তাই—দ্বিতীয়ত যোসি সোশ্যালিস্ট তাই। বিয়েটা আমার প্ল্যানের সঙ্গে এত সুন্দর খাপ খেয়েছিল ব'লেই মত দিয়েছিলাম। যে সব মজুরেরা আমার কারখানাগুলোয় কাজ করে তারা আমায় এত খাতির করে কেন জানো। ঘটে বুদ্ধি নেই তো জানবে কেমন করে। যাক গে সে সব কথা—এমিলোর সঙ্গে এ ব্যাপারটির কোনো যোগ নেই। আমি বলছিলাম তিত্তা বাক্কোর কথা। রুটির কারখানা থেকে সিনুর তো তাকে তাড়িয়ে। হতভাগা বেকার হয়ে হ্যা হ্যা করে ঘুরে বেড়াল। তারপর যেই না বাড়াবাড়ি শুরু করল—অমনি ধরেন, তারপর কালাপানি। এখন আমি যে কথা বলতে চাই সে হ'ল এই: আমি বড়লোক সত্যি—কিন্তু আমারো তো হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে। তাই আমি ঠিক করেছি যে বাক্কোর বৌটিকে আনিয়ে নেব—একটা থার্ডক্লাশ টিকিট কেটে পাঠিয়ে দেব রোমে—সেখানে গিয়ে মেয়েটা আমার নাতির দাসীবৃত্তি করুক।'

সিনোর মাস্কানি আরো অনেক যুক্তি দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে গেলেন। সিনোরের গালের উপর ছিল অদ্ভুত একটা আঁচিল। স্বামীর অকাট্য যুক্তির কাছে যখনই হার মানবার সম্ভাবনা হয়, তখনই সিনোরা ওই কিম্ভূতকিমাকার আঁচিলটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টির নিচে বিবেকবান সিনোরের কথা শুকিয়ে যায়, তিনি থামে বকতে শুরু করেন। উনি যথাসময়ের অনেক আগেই আলোচনা চুকিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ঝিকে ডাকলেন—

'সিসিকে বলো এখুনি এসে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

সিসি একাধারে কোচোয়ান ও চাকর। গায়ে কোট নেই, শার্টের হাত গুটোনো। সিসি এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। কর্তার কাছে তলব পড়লে সিসি দাঁত বের করে হাসে—ওটা তার স্বভাব। ওর বুদ্ধির উপর প্রথম থেকেই সিনোরের কেমন একটা আস্থা জন্মে গেছে।

'ভিত্তা মাকরোর বৌ কোথায় থাকে জানিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, বুঝেছি'—সিসি বললে। একটা বোকাটে হাসিতে ওর মুখচোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিসির বুদ্ধির তারিফ করার মতো অবস্থা সিনোরের ছিল না। 'কী বুঝলি, হতভাগা?' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

সিসি এমন একটা সলজ্জ ভঙ্গি করল যেন কর্তা তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। বললে, 'ওকে গিয়ে বলব হুজুর।'

'বলগে এখুনি এখানে আসতে, ওর সঙ্গে কথা আছে।'

কিছুক্ষণ পরেই সিনোর তাঁর চাকরের অদ্ভুত তৎপরতার প্রমাণ পেলেন। তিনি ও সিনোরা তখনও খাওয়া শেষ করেননি, এমনি সময় খাওয়ার ঘরে একটি মেয়ে এসে ঢুকল। কোলে তার দুমাসের শিশু। এ আর কেউ নয়—ভিত্তা মাকরোর বৌ আন্নিজিয়া।

সিনোরের পায়ের কাছে পড়ে মেয়েটি বলতে লাগল, 'কর্তাবাবুর দয়ার শরীর। আপনার হাত দুটি দিন, একবার চুম্বন করি।' ইতিমধ্যে আর ফিরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখছে। তারই সামনে দাঁড়িয়ে সিসি, মুখে তার আকর্ণবিস্তৃত আহ্লাদের হাসি।

সিনোর মানজুনির মুখে বন্দের রেখা ফুটে উঠল। এই হঠাৎ আবির্ভাবে তিনি যেমন অবাক হয়েছেন, বিরক্তও হয়েছেন তেমনি। ভ্রূ কুঁচকে তিনি হাত সরিয়ে নিলেন, দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেরোও বলছি এখান থেকে। সিসি, তুমি যেয়ো না। এদিকে এসো। একে কী বলেছ বলো দেখি?'

আরিচিয়া তখনও হাঁটু গেড়ে বসেই আছে। 'সিনি বলছিল তিতা ফিরে আসছে, আপনি তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনছেন?'

কথা শুনে সিনোর লাফিয়ে উঠলেন। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি রাসকেলটাকে!'

সিনি ততক্ষণে পিট্টান দিয়েছে।

করুণভাবে সিনোরার দিকে তাকিয়ে আরিচিয়া আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'তাহলে কথাটা সত্যি নয়?'

অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো গেল যে, সিনোর মাস্কানির এ বিষয়ে কোনো হাত নেই। ইচ্ছে থাকলেও তিনি তিতাকে ছাড়িয়ে আনতে পারেন না। সিনোর ওকে বুঝিয়ে বললেন, 'দেখ, আমার রুটির কারখানা থেকে তিতাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু তুমি তো নিজেই দেখেছ ওর কত অপরাধ আমি মুখ বুজে সয়ে গেছি। সয়েছি কেন? তোমার দিকে তাকিয়ে। ছেলেবেলায় তুমি আমার বাড়িতেই মানুষ হয়েছ। এরমিনিয়ার তুমি খেলার সঙ্গী ছিলে। এ সব কথা কি আমি ভুলতে পারি?'

সিনোর কথা বলছেন, এদিকে সিনোরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরিচিয়াকে পরখ করে দেখছেন। ভাবছেন: হ্যাঁ, দাইয়ের পোশাকে ওকে মানাবে ভালো, লাল রুমালে সোনালি চুল বাঁধা গায়ে মাসের্থ উর্দি চড়ানো—বেশ ভালোই দেখাবে। উনি যেন কল্পনার চোখে ওর শহুরে সজ্জা চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

সব কথা শুনে আরিচিয়া যেন আকাশ থেকে পড়ল। নিজের শিশুটিকে ওদের চোখের সামনে ধরে বললে, 'আমার খোকা—তার কী হবে? তাকে কে দেখবে?'

শিশুটিকে বুকে চেপে বেচারী আবার কাঁদতে শুরু করলে। 'বাছা আমার, বুঝলি রে, তোর বাবা আর ফিরে আসছে না!' জলভরা চোখে সিনোরার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওর বাবা ওকে দেখেইনি, আমাদের

খোকন সোনাকে দেখেইনি।'

'এরসিলিয়া তোকে যে মাইনে দেবে তাই থেকে কিছু খরচ কর
তোর ছেলেকে দেখবার লোক ঢের মিলবে।'

'সিনোরা এরসিলিয়ার কাছে আমি তো খুশি হয়েই যতাম, কিন্ত
যে অনেক দূর সেই রোম।'

সিনোর মান্জনি ব'লে উঠলেন, 'দূর আবার কী রে। এ হ'ল রে
শীমারের যুগ। গাড়িতে চেপে বসলেই হ'ল, দেখতে দেখতে রোম-
পৌঁছে যাবি।'

আরিচ্চিয়া বললে, 'আজ্ঞে সে তো ঠিকই। আমি পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়ে
মানুষ। কী জানি, কোথায় পথ হারিয়ে ফেলব। গাঁ ছেড়ে কোনে
দিন এক পা বেরুইনি। আর তা ছাড়া কত্তা তো জানেন আমি আ
আমার শাশুড়ি এক বাড়িতে থাকি। বেচারা বুড়ো মানুষ, তাকে এক
ফেলে যাই কী করে? তিনি মারে মারে বলে গেছে আমি যেন ও
মা-র দেখাশুনো করি। কী কষ্টে যে থাকি কী বলব? এদিকে আমা
এই খোকা, ওদিকে সত্তর বছরের ঐ থুথ্‌রে বুড়ি। কিছুদিন ধরে
ভাবছি, কারু হাতে ছেলেটার ভার দিয়ে কোথাও একটা কাজে লাগি
অভাবের সংসার; এটা ওটা বিক্রি করে কোনোমতে চালাচ্ছি। এ ভাবে
চললে কিছুদিন পর আর কুটোটিও থাকবে না। বিয়ের সুময় তিনি কত
সাধ করে ঘর সাজিয়েছিল। এমন কিছু দামি [illegible] নয় কিন্তু সখে
জিনিস তো। ফিরে এসে ও যখন দেখবে বাড়িঘর একদম ফাঁকা, আমি
তখন ওকে কী বলব? কিন্তু বুড়ি কি আমাকে কাজ করতে দেবে
ওর মা দেমাক, চাকরির কথা কানেই তুলবে না। তবে সিনোর
এরসিলিয়ার কাজে যদি লাগি···আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, শাশুড়িবে
একবার বলে দেখি।'

'কিন্তু জবাবটা জরুরি চাই। কালকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।'

আরিচিয়া বড় কাঁপরে পড়ল। 'কালকেই? আচ্ছা যেতে পারব কি
পারব না কালকেই জানাব।' এই ব'লে চলে গেল।

তাছেই একটা গলিতে ভয়া থাকে। ইতিমধ্যে সিসির কল্যাণে বিদ্যে
গুজব পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে তিস্তা ছাড়া পেয়েছে। তিস্তার
বুড়িমা তাদের ছোট্ট একতলা বাড়িটার এক কোনায় শীতে জড়সড় হয়ে
আগুন পোয়াচ্ছে। পাড়ার মেয়েরা তার চারদিকে ভিড় করে এসে
দাঁড়াল। সবাই একবাক্যে সিনোর মানজ্রুনির গুণ গাইতে শুরু করে
দিল। 'কী তাঁর দয়ার শরীর!' বুড়ির মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে
পড়েছে। মাঝে মাঝে এক-আধবার হুঁ-হাঁ শব্দ করছে সেটা খুশিতে
না বিরক্তিতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চোখে কেমন যেন
ঝিমেছে বুড়ি।

ইতিমধ্যে আরিচিয়া এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। ওর কাছে সব
কথা শোনার পর সিনোরের গুণগান এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। বুড়ি
এবার মুখ তুলে পড়শীদের দিকে তাকাল। চোখে তার কী তীব্র ঘৃণার
দৃষ্টি। মানজ্রুনি কী প্রস্তাব করেছে শুনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।
ওকে জিগ্গেস করল, 'কী জবাব দিলি?'

আরিচিয়া কাতর দৃষ্টিতে পড়শীদের দিকে তাকাল। ভাবখানা এই—
তোমরা ভাই, বুড়িকে বুঝিয়ে বলো, এ কাজটা ছাড়া আমার পক্ষে
উচিত হবে না।

গাওড়ির কথার উত্তরে বলল, 'আমি বলেছি তোমাকে জিগ্গেস করে
জানাব।'

বুড়ি রেগে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওসব হবে না, কিছুতে হবে না বলে দিচ্ছি।'
আর একবার অনুনয়ের দৃষ্টিতে পড়শীদের দিকে তাকিয়ে আরিচিয়া
বললে, 'আমি তো চাইনে যেতে, কিন্তু'…

এবার দু-একজন এসে বুড়িকে বোঝাতে লাগল—বৌ যদি এ সুযোগ

হাতছাড়া করলে তবে বড় বোকামি হবে। কাজটা নিলে ওদের তিনটি প্রাণীর একটা হিল্লে হয়।

ওদের মধ্যে একজন এসেছিল কোলে ছেলে নিয়ে। ছেলেকে মাই দিতে দিতে সে বলে উঠল, 'তুই কিছু ভাবিসনি, তোর ছেলেকে আমি দেখব।' এই কথা ব'লে ছেলেটার মুখ থেকে বোঁটাটা খুলে মাই উঁচু করে ধরে টিপল। ফিন্‌কি দিয়ে দুধের ফোয়ারা মুখে চোখে এসে পড়তে লাগল। কাণ্ড দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি।

কিন্তু বুড়ি সহজে টলবার পাত্র নয়। পড়শীদের কারুর কথায় কান দিল না। গলা চড়িয়ে চিৎকার করে বৌকে বলল, 'যাস্ তো আমার মাথা খাস্। আমার কথা না শুনিস তো ভাল হবে না ব'লে রাখছি। আমার শাপে তোর সর্বনাশ হবে।'

এন্‌রিকো যোশি এসেছে স্টেশন-এ—নেপল্‌স-এর ট্রেন আসতে দেরি নেই। যোশি লোকটা বেঁটে, কাঁধ দুটো উঁচু—রোগা শরীর। দেখলেই মনে হয় যকৃতের দোষ আছে। শীর্ণ মুখ দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন। অপেক্ষা করতে করতে ওর বিরক্তি ধরে গেছে। ক্রমাগত পাঁসনেটা নাকের উপর সোজা করে বসবার চেষ্টা করছে। ক্ষণে ক্ষণে পকেট হাতড়াচ্ছে। সবটা মিলিয়ে কেমন একটা অস্থির ভাব। কোট আর ওভার-কোটের পকেটগুলো খবরকাগজে ঠাসা।

একজন রেল কর্মচারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা মশাই, নেপল্‌স-এর ট্রেনটা কখন আসবে—বলতে পারেন?'

'প্রায় চল্লিশ মিনিট লেট।'

'বলেন কী, মশাই। হবেই তো, সাধে বলে ইতালিয়ান গাড়ি যাচ্ছেতাই ব্যাপার।'

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত সে যেমন-তেমন একটা জায়গায় বসে পড়ল। একটা বেঞ্চিও খালি নেই।

'শেষকালে কিনা একটা বাইরের খবরদারি করতে হবে। তিনি কখন এসে পৌঁছবেন তার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। যাচ্ছেতাই ব্যাপার!'

এরমিলিয়া আজ প্রায় বছর দুই হ'ল রোমে আছে, ওদের বিয়ের পর থেকেই। না চেনে রাস্তাঘাট, না চেনে কিছু। বাড়ির সাধারণ জিনিসটুকু কিনতে যাবার সাহস নেই। দু'পা বাইরে বেরুতে গেলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে—ও যেন সিসিলির দেহাত থেকে সবে কাল শহরে এসেছে। ঘরে বসে বসে ওর একমাত্র কাজ দোরিকে গালাগাল দেওয়া। সকাল থেকে শুরু হয়, ঘুমুতে যাবার আগে পর্যন্ত। একঘেয়ে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ সুরে গাল দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ওর গালাগালগুলোর মধ্যে কোনো অর্থ নেই, যুক্তি নেই। এইটাই দোরির কাছে সব চাইতে ক্লান্তিকর। ওর বিরক্তির আর একটা কারণ হ'ল এরমিলিয়ার ঈর্ষা, এ তার প্রেমের ঈর্ষা নয়, নিছক বদমেজাজ।

দোরি বসে বসে ভাবছে, 'ও মনে করে ওকে ভালোবাসি না। কী করে বাসব? ইচ্ছে করে খোঁচা খুঁচনো ওর যেন স্বভাব—তাতেই ও আনন্দ পায়। একটা মিষ্টি কথা নয়, একটু আদর না...সারাক্ষণ সন্দেহ! ঝগড়াটে, বিষমুখো! কি দেখেই যে ওকে বিয়ে করেছিলাম, এখন তাই ভাবি। যাচ্ছেতাই ব্যাপার!'

নাকের ডগায় চশমাটা বসিয়ে পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ টেনে পড়তে সে শুরু করলে।

এদিকেও সব তাতেই বিরক্তি। বৌএর সঙ্গে বনে না—কাগজ পড়েও স্বস্তি নেই। এক একটা খবর পড়ছে আর ক্রমাগত আউড়ে চলেছে, 'যাচ্ছেতাই ব্যাপার!' তবু পড়তে ছাড়ে না। রোম, মিলান, নেপল্‌স, তুরিন, ফ্লোরেন্স—এই সব শহরের নামকরা খবরকাগজগুলো সারাক্ষণ

ওর পকেটে-পকেটে। প্রত্যেকটি কাগজ আগাগোড়া না পড়া পর্যন্ত ওর খাবার হজম হয় না। ও বলে, 'কাগজ পড়া আমার লিভারের ওষুধ।' ডাক্তার বলে ঠিক তার উল্টো কথা। বসে বসে পড়াশুনো করেই নাকি ওর যকৃতের দোষ হয়েছে। মোহিনী ভাবে পড়াশুনা ছেড়ে ও যদি দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের মধ্যে ডুবে থাকত তাহলে সেটা ওর লিভারের পক্ষে খুব বেশি ভালো হতো না। এমিলিয়ার সঙ্গে সময় কাটানোর চাইতে খবর কাগজ পড়া অনেক ভালো।

'হতচ্ছাড়া ট্রেনটা নেপলস থেকে আসবে না কি?' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ল: সর্বনাশ, এক ঘণ্টা উতরে গেছে! ও তাড়াতাড়ি যাত্রীদের বেরুবার গেট-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কোথায় মেয়েটা? বেশ কিছুক্ষণ আগে নিশ্চয় পৌঁছে গেছে—কোথায় গেল? বাড়ির ঠিকানাও তো জানে না।

খুব ভাগ্য বলতে হবে চট্ করে খুঁজে পাওয়া গেল। লগেজ ঘরে উঁকি দিতেই দেখে আমিলিয়া তার বাক্সটির উপর বসে হাপুসনয়নে কাঁদছে। লগেজবাবুরা ওকে প্রবোধ দিয়ে বলছেন থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে খবর দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

'আমিলিয়া!'

মোহিনীর গলা শুনে অমিলিয়ার ধড়ে যেন প্রাণ এল। আনন্দে অধীর হয়ে কাঁপতে লাগল—প্রায় মোহিনীর ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে আর কি! 'আর একটু হলেই একেবারে হারিয়ে যেতাম। ভাগ্যিস জামাইবাবু এসেছিলেন!'

'শ্বশুর মশাই আমার বাড়ির ঠিকানাটাও তোমাকে বলে দেন নি? এক টুকরো কাগজে লিখে দিলেই পারতেন।'

কান্নার ধাক্কাটা সামলে, চোখের জল মুছতে মুছতে আমিলিয়া বলল, 'আমি তো পড়তে জানি না তাই বোধ হয় দেননি।'

'যাচ্ছেতাই ব্যাপার। ঠিকানাটা হাতে থাকলে যে-কোনো গাড়িওলা তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারত। আবার কষ্ট করে এতদূর আসতে হোত না। কপালে জোগাড়ি ছিল, তা নইলে আর আসি। গ্র্যাটিকবেই বলেছিলুম দেখলুম এর গাড়ি কখন এল টেরও পাইনি।'
ঘোড়ার গাড়িতে বসতে বসতে সাবধান করে দিল, 'খবরদার তোমার এই কান্নাকাটির খবরটা এবিগিনিরা যেন টের না পায়, জানতে পেলে সামান্য ব্যাপার নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাবে।'
এব্রিয়ো আর একটা খবরের কাগজ বার করে পড়তে শুরু করে দিল। খাব্রিচ্চিয়া বেচারী শরীরটাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে কোণ ঘেঁষে বসেছে। ধনিদের সঙ্গে একলা এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে যাওয়াটা ওর কাছে অভাবনীয় ব্যাপার। বেচারী লজ্জায় ভয়ে জড়সড়। অধিকন্তু এ ভাবটা শিগ্‌গিরই কেটে গেল। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, দৈনন্দিন জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে কোনো কালে বেরোয় নি। রেলে স্টীমারে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নানা বিচিত্র ব্যাপার দেখে বেচারী একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। ওর ভাবনা চিন্তা সব গুলিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত রোমে পৌঁছে ও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। এখনও থেকে থেকে মনে পড়ছে—সমুদ্রে কী ঢেউ আর রেল গাড়ি কি ছুটটাই না দিল। প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এসেছে চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। এই এক নতুন রাজ্যে এসেছে। ইচ্ছে হ'ল এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে, কিন্তু এত লাজ ভালো করে তাকাতেও পারছে না। রোম হ'ল তীর্থস্থান, কত লোক পুণ্যি করতে আসে। জায়গাটা ভালো করে দেখতে হবে। তা অনেকদিন তো থাকব। ঢের সময় পাওয়া যাবে। এখন আর ভাবনা নেই, সঙ্গে চেনা লোক রয়েছেন আর এক্ষুনি তো সিনোরিনার সঙ্গে দেখা হবে। ওর চোখের উপর গাঁয়ের ছবি ভেসে ওঠে—ওর খোকাকে, ওর বুড়ি শাশুড়িকে মনে পড়ে। জোর করে ভাবনাগুলো সরিয়ে দিতে চায়।

এখন খবির মুর্খতা ও দুর্ভাবনা দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চায় না।

যোরি হঠাৎ জিগ্যেস করলে, 'জাহাজ যখন নেপল্‌স্‌-এর বন্দরে পৌঁছল, কেউ তোমাকে নিতে এসেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন বাবু এসেছিলেন। চমৎকার ভদ্রলোক। আপনাকে তাঁর নমস্কার জানাতে আজ্ঞা করেছেন।'

'আজ্ঞা করেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অনুরোধ করেছেন বলো।'

'আজ্ঞে আমি সামান্য লোক—আমাকে কি অনুরোধ করতে পারেন?'

এমিলো অধীর হয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে লাগল। শুধু পাতা ভর্তি হাইপাশ ওষুধের বিজ্ঞাপন।

'আজ্ঞে আমায় কিছু বলছিলেন?'

'নাঃ, ও কিছু নয়।'

আরিকিয়া একটু অবাক হয়ে গেল। 'প্যালার্মোতেও এক ভদ্রলোক এসেছিলেন স্টেশনে আমাকে স্টিমার অবধি পৌঁছে দিতে। চমৎকার মানুষ।'

'তিনিও আমাকে নমস্কার জানাতে আজ্ঞা করেছিলেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

যোরি খবরের কাগজটা নামিয়ে পাসনেটা নাকের উপর ঝুলিয়ে জিগ্যেস করল, 'তোমার স্বামী? তার খবর কী?'

আরিকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, 'এখনও ছাড়া পায় নি। সেই কালাপানিতেই আছে। আপনি তো রোমে থাকেন—আপনি যদি রাজাকে…'

যোরি বাধা দিয়ে বললে, 'ও সব রাজা-বাদশার কথা আমার কাছে বোলো না।'

াঘ্রিচিয়া অন্নদারে দুয়ে বললেন, 'আপনি রাজাকে দু'কথা বললেই সব
ক হয়ে যাবে।'

াপ্পি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, খবরের কাগজটা মুচড়ে জানলা দিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে দিল, 'যাচ্ছেতাই ব্যাপার! তুমি ভেবেছ তোমার সাধের
ঝাঁটিকেই শুধু দ্বীপান্তরে পাঠান হয়েছে! কাকে যে কখন পাঠায়
ার ঠিক নেই। একদিন আমাকেই হয়তো পাঠাবে।'

াঘ্রিচিয়া অবাক হয়ে গেল, কথাটা তার বিশ্বাস হ'ল না। 'সেখানে
ভদ্রলোকদেরও পাঠায় নাকি?'

র অজ্ঞতা মোরির অসহ্য মনে হয়। চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি চুপ করো তো!'
ে মনে তারে সিসিলিতে দাস মনোভাব এমন মজ্জাগত যে তথাকার
ছোটোলোকদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগানো অসাধ্য ব্যাপার। ওর
নটা নষ্ট হয়ে যায়।

াড়ি ভিয়া সিস্টিনায় মোরির বাড়ির দরজায় এসে থামল।

ফকাও খাট, উপরে লাল রঙের চাঁদোয়া খাটানো। লেস্ লাগানো
াবিশের উপর মাথা এলিয়ে—এরসিলিয়া শুয়ে আছে। ওর রঙ যেন
াশি হয়ে গেছে—প্রসবের পর ক্লান্ত শীর্ণ চেহারা।

াঘ্রিচিয়া ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল।

সিনোরিনা, সিনোরিনা, এই তো আমি এসে গেছি। এতো শিগ্গির
তোমার কাছে চলে আসতে পারব স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন কেমন আছ?
ব কষ্ট হয়েছে না? কী রোগাই হয়ে গেছ! চেনা যায় না। কী করবে
বল, সবই ভগবানের ইচ্ছা। মেয়েদের কপালে দুঃখ লিখেছেন, কেউই
পারে কি করে?'

'হাইপাশ বকিস্‌নে। সব মেয়েমানুষের এক রা। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই
দুঃখ পেতে হবে। অদৃষ্টের দোহাই দিতে দিতে কী দশা হয়েছে দেখতে

পাগলা ? পুরুষগুলো ভাবে তাঁরা হলেন প্রভু আর আমরা তাঁদের বাঁদী। আছি তাঁদের হুকুম তামিল করতে। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। সারাক্ষণ ভাবতে হবে কিসে তাঁরা খুশি হন, কিসে তাঁদের আরাম হবে। তাঁরা যে হলেন কর্তা। ঝাঁটা মারো !'

বলাবাহুল্য এব্রিয়োকে লক্ষ্য করেই এসব বাক্যবাণ। সে রেগে মেগে তার খবরের কাগজটি মুড়ে ঘর ছেড়ে পালাল।

আরিজিজিয়া বেচারি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'আহা পুরুষদেরও তো দুঃখ কষ্ট আছে।'

'আহা কী আমার দুঃখ রে—খাও দাও আর ফুর্তি কর। ওদের একটু উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। যত সব এক চোখো—'

'তা যা বলেছ। ওদের তো আর পেটে ধরতে হয় না।'

'শুধু কি তাই ? সারাজীবন হাড় জ্বালিয়ে মারে। সমস্ত জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার।'

পাশের ঘরে এব্রিয়ো মোরির গলা শোনা গেল, 'মরুকগে, জাহান্নমে যাক।'

পরমুহূর্তেই শোনা গেল আর একজন কে বলছে, 'আজ্ঞে এই যে আমি কী করতে হবে বলুন।'

এরমিনিয়া হো হো করে হেসে উঠল। আরিজিজিয়াকে বললে, 'আমার এক ঝি আছে। ও কানে খাটো, ভালো শুনতে পায় না। কারু গলার আওয়াজ পেলেই ও মনে করে বুঝি ওকে ডাকছে।' এরমিনিয়া হাঁক দিয়ে ডাকলে, 'মারগেরিটা।'

কালো বুড়ি ঝিটা মুখ কালো করে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল। মুখে অপ্রতিভ ভাব, কারণ পাশের ঘর থেকে মোরি চোখ লাল করে ওকে প্রায় তেড়ে এসেছিল।

এরমিনিয়া বললে, 'মারগেরিটা, এই আমাদের নতুন দাসী, এক্ষুনি এ

পৌঁছল। ওকে ওর ঘর দেখিয়ে দাও তো।' আম্রিজিনাকে বল্লে, 'যা চানটান করে আয়। ধোঁয়া কালি মেখে তো ভূত সেজে আছিস।'

আম্রিজিনা থাবা বাড়িয়ে আরশিতে মুখ দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাপুরে কী চেহারা হয়েছে!'

রেলের ধোঁয়ার অমনিতেই ওর মুখ কালচে হয়ে গিয়েছিল, তার উপরে সেই যে স্টেশনে বসে কেঁদেছিল তখন চোখের জল আর কালিতে মিশে মুখে দিব্যি এক পোঁচ রঙ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চান করতে যাবে কি! তখনো যে সিনোরিনাকে পথের কাহিনী কিছু বলা হয়নি। ওর আর তর সয়না, তক্ষুণি বলতে হবে। রেলে কীভাবে কোথায় কি ঘটেছিল হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে আদ্যোপান্ত সব বলতে লাগল। কালো ঝিটা হাঁ করে ওর কাণ্ড দেখছে। 'বলব কী ভাই, বাজার বুকে ছুঁ করে গিয়ে মাই দুটো টনটন্ করতে লাগল। ফেটে পড়ে আর কি। যন্ত্রণায় আমি কেঁদেই ফেলেছিলাম। গাড়ির সব লোক জিগ্গেস করতে লাগল, ব্যাপার কী, কী হয়েছে? আমি কি ছাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি? শেষটায় ওরা সব বুঝতে পারলে। তার পরে হ'ল কী জানো? একটা বদ ছোকরা ফস করে বলে উঠলো, তা ভাবনা কী, আমি চক্‌চক্ করে খেয়ে দেবখন। ছোঁড়াটা যেন মজা পেয়ে বললো, হাত বাড়িয়ে দিল আমার বুকের দিকে। আমি তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, বললুম, তাহ'লে আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ব। ভাগ্যিস আমার পাশে এক বুড়ো বসে ছিল। পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে পর বুড়ো আমাকে আর এক কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে একটি মেয়ে তিন মাসের এক বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে— রোগা চিমড়িতে চেহারা। সেই বাচ্চাটাকেই বসে বসে মাই দিলুম। ব্যথাটা আস্তে আস্তে কমে গেল।'

এবসিলিনা এখন পুরোপুরি সহজে হয়ে গেছে। আম্রিজিনার সেরো কথাবার্তা ভাবভঙ্গি ওর ভালো লাগছিল না। বল্লে, 'হয়েছে হয়েছে।

এখন যা ছুটে, চান সেরে আয়। পরে বাবা-মা'র খবর শুনব'খন। 'না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

'কিন্তু আমাদের সোনামণি,' খোকন? ওকে একটিবার দেখে নিই, তার পরেই যাচ্ছি।'

দোলনাটা দেখিয়ে দিয়ে এরসিলিয়া বললে, 'খোকন ওখানে আছে। কিন্তু তোর ঐ নোংরা হাতে মশারিটা তুলবে কেন। মারগেরিটা, এদিকে এস তো, খোকনকে দেখিয়ে দাও।'

চারদিকে রঙবেরঙএর ফিতে লেসের ছড়াছড়ি। মাঝখানে বাচ্চাটা শুয়ে আছে, মুখটা লালচে, বিদ্ঘুটে চেহারা। কী বিচ্ছিরি দেখতে! গাড়িতে যে বাচ্চাটাকে মাই দিয়েছিল তাকেও হার মানিয়েছে। মুখে বললে,'বাঃ কী মিষ্টি দেখতে। কেমন লক্ষ্মীটির মতো ঘুমুচ্ছে। তুমি দেখে নিও ছেলেকে কেমন জোয়ান করে দি। আমার খোকাও ঠিক অমনি ছিল—ঠিক ঐটুকু দেখতে এখন যদি ওকে দেখ'—আন্নিচ্চিয়া হঠাৎ থেমে গেল। খোকার কথা বলতে গিয়ে ওর চোখ জলে ভরে উঠল, গলা ধরে এল। 'যাচ্ছি এবার, এই এলাম ব'লে।' ঝিয়ের সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল।

ওর ইচ্ছে ছিল তক্ষুণি এসে বাচ্চাকে মাই দেয়; বাড়ির কর্তারও তাই মত। কিন্তু এরসিলিয়ার তো সব কিছু নিয়েই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বাধানো চাই। তাই সে বললে, 'উঁহু, সে হবে না। আগে ওর বুকের দুধ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।'

আন্নিচ্চিয়া হেসে বললে, 'কেন, ডাক্তারের কী দরকার? দেখছ না আমার শরীর? কোনো দিন অসুখ বিসুখ করেনি।'

বাস্তবিক দেখবার মতো ওর স্বাস্থ্য। মুখে গোলাপি আভা। স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি।

এরসিলিয়া কটমট করে ওর দিকে তাকায়। ও ভেবেছে আন্নিচ্চিয়া ইচ্ছে

রে বাচ্চার কান্নাটা পেয়েছে তবু নিজেকে তার স্বামীর চোখে
াহির করবার জন্যে। বললে, 'ডাক্তার চাই, এক্ষুনি—ডাক্তার নিয়ে
এস।'

ামি আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ডাক্তারের জন্য বেরিয়ে
গল।

াক্তার আসতে আসতে সেই সন্ধ্যে। এদিকে আরিচিরার মাই ফুলে
ঠে আবার সেই আগের মতো ব্যথা। ওদিকে বাচ্চাটা খিদের
চাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই খাবে না, মায়ের বুকে দুধ নেই কিনা।

এরিয়োর ইচ্ছে ছিল ডাক্তারের পরীক্ষার সময় কাছে থাকে কিন্তু স্ত্রী
তাকে দূর করে দিলে, বললে, 'হাঁ করে কী দেখছ? দেখবার কিছু
নেই। যাও, মায়গেরিটাকে বল এক গ্লাস জল আর একটা চামচে
নিয়ে আসতে।'

চুলের রঙ কটা দেখছি—হুঁ কটা চুল।' ডাক্তারের ঐ এক স্বভাব।
একটা কথাই তিন চার বার আওড়াতে থাকে। বড্ড ভুলো মন।
কোনো বিষয়ে মনঃসংযোগ করা তার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার। ফ্যাল
ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। আরিচিরা লজ্জায়
লাল হয়ে উঠল।

হাঁ রঙ, কটা চুল, কেমন কিনা? কী বলেন সিনোরা, কটা চুল তো?
ঘি বাড়ন্ত বলিষ্ঠ গড়ন, সুন্দরী···যুবতী। বাচ্চাটা বেশ ভালো···
লিষ্ঠ—বাড়ন্ত, কেমন কিনা। কিন্তু রোগা হলেই যেন ভালো হতো।
রোগা পাইয়ের দুধ ভালো। দেখি, একবার ভালো করে দেখা যাক।'
আরিচিরার বুডিসটা উপর দিকে তুলে ধরে গলার প্রান্তিকলো টিপে
টিপে দেখতে লাগল। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে তার বুকের বোতাম-
লো খুলতে লাগল। আরিচিরা তো হতভম্ব, লজ্জায় তর সমস্ত শরীর
টা দিয়ে উঠেছে। ও হাত দিয়ে মাই দুটো ঢাকতে যাবে ডাক্তার বলে

উঠল, 'সরিয়ে নেন—হাত সরিয়ে নেন।

ব্যাপার দেখে এরসিলিয়া খিল খিল করে হেসে উঠল।

'হেসে উঠলেন যে, সিনোরা, হাসছেন কেন?'

'পাড়াগেঁয়ে ভূতটাকে দেখুন। লজ্জায় ভয়ে জড়সড়।'

'লজ্জা? লজ্জা কী? আমি যে ডাক্তার।'

'লজ্জা—অচেনা পুরুষের কাছে। আর জানেন তো আমাদের সিসিলির মেয়েরা এখানকার শহুরে মেয়েদের মতো অত সভ্য নয়।'

'ওঃ বুঝেছি, বুঝে নিয়েছি। লজ্জা সরম একটু বেশি, কেমন কি না। কিন্তু ডাক্তারের কাছে লজ্জা কী? মাইটা একটু টিপে দু'এক ফোঁটা দুধ ফেল তো এই চামচেটার মধ্যে। তোমার খোকার বয়স কত?'

আম্রিজিয়া অতি কষ্টে চোখ তুলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল।

'এই দু'মাস হ'ল কোলে এসেছে।'

'কোলে এসেছে? তার মানে? জন্ম দিয়েছ বল। ছেলে আবার আপনা থেকে কোলে আসে নাকি? জন্ম দিতে হয়। প্রসব করতে হয়, তাতে দোষটা কী?'

দুধ পরীক্ষা করে ডাক্তার চলে যাবার পর আম্রিজিয়া ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। যেন অত্যধিক পরিশ্রমে ওর সমস্ত শরীরে অবসাদ এসেছে।

ছি, ছি, ছি, ছি, লজ্জায় মরি! কী বিশ্রী ব্যাপার!

পরমুহূর্তে কান্না শুনে এরসিলিয়ার খোকাটিকে কোলে তুলে ও মাই দিতে লাগল। 'আয়, কোলে আয় বাছন, পেট ভরে দুদু খা।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এরসিলিয়া আবার কটমট করে তাকাল। সোনালি চুল মাঝখানে সিঁথি, দু'কানের দু'পাশে গোল করে খোঁপা বাঁধা। ঐ সোনালি চুলের বেষ্টনীর মধ্যে ওর নিটোল মুখ আরো যেন সুন্দর দেখাচ্ছে। আবার ফাঁক দিয়ে ঈষৎ দেখা যাচ্ছে ওর সুগঠিত স্তন—ধবধবে সাদা। এরসিলিয়া বিরক্তির সুরে বলে, 'রাত-কাপড়টা সরিয়ে

লে না? কী বুদ্ধি! খেতে খেতে যে ঘুমিয়ে যাবে।'

পেটে খিদে পেয়েছে, আগে খেয়েনিক। কেমন সুন্দর চুকচুক করে খাচ্ছে।'

বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে ও পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ও ঘরে ওদের দুজনের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। চমৎকার বিছানা, সুন্দর আসবাব-পত্র। সব দেখে ওর বিস্ময়ের অন্ত নেই। তা হবে না! রোম তো। এখানকার ব্যাপারই আলাদা। সুন্দর ধবধবে পরিষ্কার বিছানা ওর জন্যও পাতা হয়েছে। আম্রিজিয়া থমকে দাঁড়ায়। দু'বছর আগেকার ওর সেই বাসর শয্যার কথা মনে পড়ে। সেই প্রথম ওর ভর্তার সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া। দূর সিসিলির সেই ছোট্ট বাড়িটির ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে। ভিত্তোকে তখনো বাউণ্ডুলেপনায় ধরেনি। কত সাধ করে নতুন সংসার পেতেছিল। আজ সেই ঘরটির কী হতছাড়া চেহারা। আসবাব বলতে দুটি মাত্র চেয়ার। শাশুড়ি ও শিশুকে নিয়ে এক বিছানায় পাশাপাশি করে শোওয়া।···বুড়ি তো সমস্ত খাটটা এখন একলাই দখল করবে। লুৎসি হয়তো পড়শীদের কাছেই থাকবে। আহা বেচারি, অল্প বয়সে মা-ছাড়া ঘরছাড়া! সেই পড়শী মেয়েটা কি লুৎসির দিকে তেমন নজর দেবে। হয়তো এক পাশে ফেলে রাখবে—নিজের বাচ্চাকে খাইয়ে দাইয়ে সামান্য যা বাকি থাকবে ততটুকুই দেবে। একা মা-র কোল দখল করেছিল, এখন পরের ছেলের এঁটো খেয়ে সে বাঁচবে। আম্রিজিয়ার বুক ঠেলে উঠতে থাকে। পাছে আবার কেউ টের পায় তাই জোর করে চোখের জল মুছে ফেলে। নিজের মনকে বোঝাতে চায়। লুৎসির ঠাকুমা তো কাছেই থাকবে। নাতির অনাদর হলে সে কি ছেড়ে কথা কইবে—পষ্টাপষ্টি পড়শীর মুখের উপর দু'কথা শুনিয়ে দেবে। তা যাই বল ভিত্তোরই তো মা, ভেতরে ভেতরে মনটা ওর ভালো। কিছুদিন পর নিশ্চয় বৌয়ের উপর ওর রাগ পড়ে

যাবে—বুঝবে আরিজিনা যা করেছে, সাত-পাঁচ ভেবেই করেছে, ভতো আর সাধ করে শাশুড়ির কথা অগ্রাহ্য করেনি। বাড়ি বসে থাকলে না খেয়ে মরতে হত।

ও যে শাশুড়ি আর ছেলের মুখ তাকিয়েই রোমে এসেছে—নিজে সুখে থাকবে ব'লে নয়—একথাটা নিজের কাছে প্রমাণ করতে পারলে ও যেন বেঁচে যায়। যদি সম্ভব হ'ত তা হ'লে আরামের শয্যা ছেড়ে মেঝের উপর শুতে পারলেই ও যেন বেশি খুশি হ'ত। আর সত্যিই এত ঐশ্বর্য তো ওর জন্যে নয়—সবটাই ওই খোকাটির জন্যে। ও যদি বাড়ির সামান্য কুকুরটার মতো মেঝের উপর শুতে পায় তা হ'লেই যথেষ্ট। মুৎসি বেচারী আর তিজ্জার বুড়ি মা ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটাবে আর ও করবে বাবুগিরি, তাও কি কখনো হয়।

দু'দিন পরে দরজি যখন ওর জন্য নার্স-এর পোশাক নিয়ে এল তখন ওর আরো মন খারাপ হয়ে গেল। এত সুন্দর য়ুনিফর্ম ও পরবে কোন লজ্জায়—রঙিন সিল্কের রিবন, জামার উপর সুন্দর ছুঁচের কাজ, রুপোর চিরুনি—এ যেন নাচের সাজ! এ প'রে ওকে রাস্তায় বেরুতে হবে?

এরমিনিয়া ইতিমধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। আরিজিনার রকমসকম দেখে ও রেগে আগুন।

'আহা তাকানো দেখ! ঠিক যা ভেবেছিলাম। রোমের [illegible] যেমন কাপড়-চোপড় পরে তোকেও তাই পরতে হবে। [illegible]-সাদা মন-সাধার কথা শুনতে চাইনে—যেখানকার যা নিয়ম তাই মেনে চলতে হয়।'

আরিজিনা কর্ত্রীকে খুশি করার জন্য তাড়াতাড়ি বলল—'আমি কি তাই বলেছি দিদি। তোমার আজ্ঞা ঠেলতে পারি! আমি শুধু বলছিলুম আমার জন্যে এত বাজে খরচ করার কি দরকার ছিল। তা ছাড়া তুমি তো জানোই দেশে আমরা—'

ানে রাখিস এ তোর সিলিলি নয়—এ হ'ল রোম। তা ছাড়া পোশাকটা
তা তোকে বেশ মানিয়েছে।'

া সত্যি। টকটকে লাল সিল্কের জামা পরে ওর চুলের সোনালি আভা,
ার ডাগা-ডাগা চোখের নীল মাধুরী—আরো যেন খুলেছে। এরসিলিয়া
াবে ওকে নিয়ে যদি রাস্তায় বেরোয় তা হ'লে কর্ত্রীর চাইতে দাসীর
েকেই রাস্তার লোকে নজর দেবে বেশি। তা ঠিক—দাসী বৈ তো নয়।
ীর চাইতে ওর অহংকারটা প্রবল হ'য়ে ওঠে—সুন্দরী দাসী তো
বার জোটে না।

রসিলিয়া একদিন বেরুল ঘোড়ার গাড়ি চড়ে সঙ্গে দাসী, তার কোলে
াকা। বেচারী আয়িচ্চিয়া নতুন পোশাক পরে এই প্রথম বাইরে
রুলো। লজ্জায় ও লাল হয়ে গেছে, চোখ তুলে চাইতেই পারছে না।
কালের খোকাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে।
রসিলিয়া দেখলে যে রাস্তায় সবাই চোখ ফিরিয়ে দাসের দিকে
াইছে।

মুখ নিচু করে আছিস কেন, কেউ তোকে ধরে খেয়েছে না কি? তাকা
কাথাকার!'

আয়িচ্চিয়া চেষ্টা করে চোখ তুলে তাকাতে। ক্রমে নতুন শহর দেখবার
ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসে, লজ্জা কেটে যায়। এরসিলিয়া যেদিকে আঙুল
দেখায় সে দিকেই ও ছেলেমানুষের মতো গোল গোল চোখ করে দেখে।
কী চমৎকার, এমন সুন্দর শহর কখনো দেখিনি।' বাড়ি ফিরে আসবার
অনেকক্ষণ পরেও ওর সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল না। পা দুটো কাঁপছে,
মাথা ঝিম ঝিম করছে, কানে যেন তালা লেগেছে। একটা ছোটখাটো
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ও যেন কোনো রকমে প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে এসেছে।
এ যেন অন্য এক জগৎ—ওদের সেই সিসিলির পাড়া-গাঁ থেকে একেবারে
আলাদা। দূরে এক মায়াপুরীতে ও যেন পথ ভুলে এসে পড়েছে।

'—মা গো মা—কী চমৎকার—কী সুন্দর !'

ঠিক সেই মুহূর্তে বোরি তার স্ত্রীর হাতে একটি চিঠি দিল—সিসিলি থেকে এসেছে। পিনোরা মাস্কানি লিখেছেন। আরিচিয়ার প্রথম মাসের মাইনে বাবদ এরমিলিয়া যে-আগাম টাকা পাঠিয়েছিল মাকড়োর বুড়ি মা তা ফেরত দিয়েছে। ও বলেছে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে খাই, না খেয়ে মারা পড়ি, সে ও ভালো, তবু ও-পাপের টাকা চোখেও দেখতে চাইনে। ইতিমধ্যে যে পড়শীর হাতে আরিচিয়া ছেলে দিয়ে গেছে সে এসে নালিশ করে গেছে হতচ্ছাড়ী বুড়ি তাকে একটি পয়সাও দেয় নি এমন কি লুংগির জামাকাপড় কেনবার জন্যেও না। পিনোরা আরো লিখেছেন—যে এরমিলিয়ার পাঠানো টাকা থেকে অর্ধেক টাকা উনি পড়শীর হাতে দিয়েছেন। আর বলে দিয়েছেন সে যেন বুড়িকে রোজ কিছু খেতে দেয়—নইলে সে তো না খেয়েই মারা পড়বে। পড়শী যেন এমন ভাব করে যে সে নিজের থেকেই দয়া করে বুড়িকে দুটি খেতে দিচ্ছে। বুড়ির যা মেজাজ! এরমিলিয়া যেন এবার থেকে অর্ধেক টাকাই পাঠায়—বুড়িটা তো টাকা নেবে না। শেষে লিখেছেন যে এরমিলিয়ার স্বামীর কথা মতো চলতে গিয়েই এই গোলমালটা হ'ল। চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে এরমিলিয়া বলল—

'তোমার কি কখনো বুদ্ধি হবে না ? কেন তুমি মাকে লিখতে গেলে ?'

'আমি কি ওই ক্ষ্যাপা বুড়িটার ছেলের বৌকে পাঠাতে মাথার দিব্যি দিয়ে লিখেছিলাম ? তোমার মা দেখি আমার ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছেন !'

'চাপাবেন না তো কী—একশোবার চাপাবেন। সিসিলি থেকে খাই পাঠাবার কথা তুমি লেখনি ? আজ তোমার জন্যে এই কাণ্ডটা ঘটল। তোমার তো ভারি বয়েই গেল। হাঁ করে বাগীর রূপ গিলছ। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে ?'

বোরি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—

কী বলছ তুমি ? আমার ছেলের দাসীকে দিয়ে…'

হ্যাঁ গো হ্যাঁ ঐ দাসীই।—করো না, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করো।'

আলবৎ চেঁচাবো। কে চুপ করে সইবে তোমার ওই বাজে কথা ? চুলের দাসী দিয়ে ছিংলে…তোমার মাথা খারাপ হতে আর বাকী নেই।'

আর তোমার মাথাটি খুব ঠাণ্ডা বুঝি ? মাথা নেই তার মাথা গরম ! এখন কী করা যায় সেইটে বল। টাকাটা যে ফেরৎ দিলে—'

ওর শাশুড়ি যে টাকাটা নিতে চাইছে না সে কথা ওকে বুঝিয়ে বলবে না ?'

'ক্ষেপেছো ? ওকে আমি সে কথা বলতে যাই আর কি। তা হ'লে ও একেবারে ঘাবড়ে যাবে।'

রাগে বিরক্তিতে অধীর হয়ে মোরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত তাহলে এতদূর গড়ালো ! মোরি তার খোকার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না—আদর করা তো দূরের কথা। এমন অদ্ভুত সন্দেহ কে কবে দেখেছে ! খোকাকে আদর করলে এরসিলিয়া ভাববে যে দাসীকে সোহাগ করছে ! একদিন তো স্পষ্ট ব'লেই ফেলল।

'খোকা যখন আমার কোলে থাকে তখন তো হাসাও বাড়াও না। আর দাসীর কোলে থাকলে আদিখ্যেতার অন্ত নেই—কী আদরের ঘটা !'

এ ধরনের কথায় এরিয়ো দুঃখও পায় যেমন তার রাগও হয় তেমনি।

'খোকা তো তোমার কাছে কখনো থাকে না।'

সে কথা সত্যি। খোকা তার মার কোলে দু'দণ্ড থাকতে চায় না, কাঁদতে থাকে আর কেবল তার ছোট্ট দুটি হাত বাড়িয়ে আমিলিয়ার কাছে যেতে চায়। বোধ হয় এরসিলিয়া ওকে ঠিকমতো সামলে

ধরতেই পারে না। ছেলে কোলে করার অভ্যেস নেই ব'লে যে এমনটা
হয় এ কথা মনে করা ভুল। আসলে ওর শারীরিক ভয় পাছে খোকাটা
ওর দামী ক্রেপিংগাউন নষ্ট করে দেয়।

বাড়ির বাইরে এরসিলিয়া বড় একটা বেরোয় না, লোকজন কালেভদ্রে
ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। তা হ'লে কী হবে। পোশাক পরিচ্ছদে
অজস্র দু'হাতে খরচ করে আর তাও ওর কিছুই পছন্দ নয়। কিছুতে সন্তু
হওয়া ওর ধাত নয়, সব তাতে ওর অরুচি, এমনকি, নিজেকেই যেন ও
ভালো লাগে না। ওর ধারণা ও অসুখী। তা হয়তো সত্যি। কিন্তু সেজন্য
অন্য লোককে দোষী করলে চলবে কেন। এর জন্য দায়ী ওর নীরস
কটুস্বভাব—ওর ঝগড়াটে প্রবৃত্তি। এদিকে ওর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে
মনের মতো মানুষ যদি ও পেতো—এমন কেউ যে ওকে ভালোবাসতো
ওকে বুঝতো—তা হ'লে ওর বুকের ভিতরটা এমন খাঁ-খাঁ করতো না
খোকার প্রতিও এরসিলিয়ার মনে বিতৃষ্ণা এসেছে—যাকে ছেড়ে
দাসীকে চায় ব'লে। কাজ নেই, কর্ম নেই, একঘেয়ে দিন কাটে—এমন দি
নেই যেদিন ও কান্নাকাটি করে না। খোরি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে ও
চোখ লাল। দেখেও দেখেনা। পারতপক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তাও বলে
না। কিছু ব'লে করে যে এরসিলিয়ার মন পাবে, এমন আশা সে ছেড়ে
দিয়েছে। জীবনটাকে উপভোগ করার ক্ষমতাটাই এরসিলিয়া হারিয়ে
ফেলেছে—সে জানেনা মানুষ নিজে যদি সুখী না হয় তা হ'লে কে
তাকে সুখী করতে পারে না। আর এরসিলিয়ার চাইতে খোরি নিজে
বা কোন সুখে আছে। ওর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকাটাই তো দুঃ
বিশেষ। কী বিশ্রী জীবন—সারাটা দিন ওর আপিস-ঘরে বন্দী। তাছা
মাঝে মাঝে ওর সোশ্যালিস্ট বন্ধুরা আসে, তাদের সঙ্গে গল্পগুজব
আলোচনায় তবু মনটা একটু হালকা হয়।

সিনোর কেলিটিনুসিয়ো ডামিয়েন্তি খোরির কর্মচারী। আধবয়সী লো

উকিলের মুহুরী। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় বেশি রাফি-
চেল্লিকে বসবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। সমবেত ভদ্রলোকদের কারো হুকুম
সেলাম করে মুহুরী বেরিয়ে আসে, বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দেয়।
দরজার বাইরে তার অন্ত মূর্তি, নাচের ভঙ্গীতে পা ফেলতে ফেলতে,
হাত কচ্লাতে কচ্লাতে, কলপ-করা গোঁফে তা দিতে দিতে বাইরের
ঘরে এসে একটা বেঞ্চ-এর উপর বসে। সিসিলির সুন্দরী নারীটির প্রতি
ওর ভারি লোভ! ইতিমধ্যে ভাব করার চেষ্টা হয়ে গেছে:

'আমার নামটা কী বলো তো? আমার নাম ফেলিচিস্সিমো (ভাগ্যবন্ত)।'
আরিজিজিয়া ঠাট্টাটা ঠিক যেন বুঝতে পারে না। মুখ ঘুরিয়ে নেয়।
সিনোর রাফিচেল্লি আপন মনেই আক্ষেপ করে।

'—কী নামই রেখেছিল বাপ-মা—ফেলিচিস্সিমো। পোড়াকপাল
আমার!' বাপ-মা যখন এমন গালভরা নামটা দিয়েছিলেন তখন তাঁদের
আশা ছিল ছেলে এককালে ভাগ্যবন্ত হবে। কী চমৎকার কপাল—
খুদকুঁড়ো কুড়িয়ে বেড়ানোকে কি সৌভাগ্য বলে! দিনমজুরী জোটে
আট লিরা মাত্র। কোনোরকমে সংসার চালাবার পক্ষে এ-পয়সাটা
নিতান্ত যৎসামান্ত নয়। তব কিন্তু এতে কুলোয়না। কারণটা খুবই
সাধারণ—স্ত্রীলোকের প্রতি ফেলিচিস্সিমোর একটা সহজাত দুর্বলতা
আছে। এটা তর খেয়াল নয়—আবেগ; কিছুতেই ঘুচলনা। স্ত্রীলোক
দেখলে ও আর ঠিক থাকতে পারে না।

এই আরিজিজিয়ার কথাটাই ধর না—বসে চইচম্বুর! দেখলেই জিভে
জল আসে। মেয়েটা শুধু যে খাপসুরৎ তা নয়—আদব কায়দাও জানে।
বাইরের ভড়ংটা কিন্তু ঠিক রেখেছে। হ্যাঁ ভড়ং নয় তো কি। দাই
মাত্রেই যে নষ্ট মেয়েমানুষ সেকথা কে না জানে, পাঁচ ভাতারের ব্যাপার
—ভুলে গিলেই হ'ল।

মুহুরী বাবুর মিউনো চাউনি আর লাম্পট্যের বিকৃত ভঙ্গি আরিজিজিয়ার

চোখে যে পড়েনি তা নয়। হাসিও পায় রাগও হয়। অদ্ভুত লোকটা—বয়স ঢাকতে পারে না অথচ কলপ লাগিয়ে চুলটা এখনও তরুণ রাখবার চেষ্টা। বোধ হয় মাথা খারাপ—আর তা যদি নাও হয় তো খারাপ হতে খুব বেশি দেরি নেই।

একদিন আরিজিয়া বৌদির ছেলেটিকে ধরে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করাচ্ছে। খোকার নাম হয়েছে লিওনিদা। ও নামটা আরিজিয়ার মুখে কিছুতে আসেনা—এই দু'মাসেও রপ্ত হয়নি। ও তাই নামটা সহজ করে খোকাকে ডাকে লোনিদা।

বাবিচেল্লি খুনসুটি করে বলে: 'ও দাসী, কী তোমার বুদ্ধি! লোনিদা নয় গো, লি-ও-নি-দা!'

'ও নাম আমার মুখে আসে না।'

'আচ্ছা বল তো দেখি কেলিচিস্‌লিযো। ও নামটা কার জানো? আমার।'

আরিজিয়া খোকাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে: 'ও রকম নাম আবার হয় না কি?'

বুড়ী বাবু উদাসভাবে আপন মনে বলে, 'না হ'লেই ভালো ছিল।'

বেঞ্চিতে বসে বসে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে। পাশের ঘরে তখন জোর আলোচনা চলছে। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে: শোষক সম্প্রদায়ের অবিচার···সর্বহারাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য···আন্দোলন···সভা সমিতি···প্রোগ্রাম···ইত্যাদি। এ সব কথা সে শুনেও শোনে না, ও শিকারী বিড়ালের মতো বাড়ির ভিতরের দরজাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ভেসে আসে করুণ সুরে গাওয়া ছেলে ঘুমানো ছড়ার দু চারটা ছত্র। আরিজিয়া এরগিনিয়ায় খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ছেলেটি ইতিমধ্যে বুকের দুধ পেয়ে দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে। ওকে দেখে দেখে আরিজিয়ার বুৎসির কথা মনে পড়ে, গান গাইতে গাইতে ওর গলা ধরে আসে। বুৎসি যদি এই ছটা মাস বা

বুকের দুধ পেত তা হ'লে কী মোটাসোটাই না হত। কে জানে বাছা আমার কেমন আছে। মাঝে মাঝে ও ঘরে লুৎসিকে দেখে—রোগা ডিগডিগে, হাত কিরকির করছে, গলাটা সরু লিকলিকে, প্রকাণ্ড মাথাটা টলমল করে একবার এ-কাঁধে একবার ও-কাঁধে লুটিয়ে পড়ছে। আরিস্তিয়া কাৎরে ওঠে, তারে ওর হাত পা পাথরের মতো জমে যায়। হা ভগবান, আমার বাছার এমন দশা কে করলে। ঘরে তাড়াতাড়ি ছেলেকে দুধ দিতে যায় আর লুৎসি ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কী তীব্র বিদ্বেষের দৃষ্টি, ঠিক ওর বুড়ি শাশুড়ীর মতো। বিশ্রী স্বপ্ন—আরিস্তিয়া ভয়ে শিউরে ওঠে। সারারাত ঘুম হয় না। শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে থাকে—লুৎসির ওই তিরস্কারের চাউনিটা ওর বুকে যেন কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে।

এরমিলিয়ার কাছে ওর দুর্ভাবনার কথা জানাতে আরিস্তিয়া ভয় পায়। ঘন ঘন দেশের খবর, লুৎসির খবর জানতে চাইলে বিরক্ত হয়, রাগ করে। বোধহয় ভাবে যে নিজের ছেলের প্রতি এত যার টান, সে কি পরের ছেলের তেমন করে যত্ন নেবে। এবে তার মিথ্যে সন্দেহ আরিস্তিয়া বুকে হাত দিয়ে তা বলতে পারে। অমন কথা ওর অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না—সোনিয়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যত্নের মধ্যে কিছু ত্রুটি কোথাও হয়নি—কেমন সুন্দর মোটাসোটা চেহারা হয়েছে।

দেশে ও যে সিনোরিনাকে চিনতো আজকালকার এরমিলিয়া তা থেকে একেবারে আলাদা জীব। আরিস্তিয়া যে এককালে ওর খেলার সাথী ছিল সেকথা একেবারে যেন ভুলেই গেছে—এমন ব্যবহার করে যেন ও দাসীর চাইতেও অধম, কর্ত্রীকে খুশি করতে কত্তো চেষ্টার ত্রুটি করে না। মাঝেমধ্যিটা মনে সেই কালো ঝিটা নিজের হবার পর থেকে ও বাকির সব কাজ খুশি হয়েই করে। খোকাকে মানুষ করার কাজ

ছাড়াও এতগুলো উপরি কাজ অথচ একটি দিনের জন্যেও অনুযোগ করেনি। ও জানে এরসিলিয়ার খুঁতখুঁতে স্বভাব—একটুতেই বিরক্ত হন। তাই ওর সারাক্ষণ চেষ্টা সিনোরিনার মেজাজ যেন না বিগড়োয়। ওর মুখে সারাক্ষণ ওই এক কথা—

'এই যে সিনোরিনা, এই যে আমি। সব ঠিক হয়ে যাবে…কিছু ভেবো না। এত কাজ করে অথচ এরসিলিয়ার দিক থেকে এক ফোঁটা দরদ নেই। একটা দিনের ঘটনা বলি। সিসিলির ডাক এসেছে। পিওনের হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে আরিজিয়া ছুটে গেল কর্ত্রীর কাছে:

'সিনোরিনা! সিনোরিনা!'

'বলি হয়েছে কী, এত চেঁচামেচি কেন? যেন যুদ্ধ জয় করে এসেছে!'

এরসিলিয়ার বকুনি শুনে ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠি পড়া শেষ করে এরসিলিয়া যখন চিঠিগুলো খামের ভিতর পুরছে তখন ভয়ে ভয়ে আরিজিয়া জিগগেস করে: 'মুৎসির কিছু খবর নেই চিঠিতে?'

'হ্যাঁ, লিখেছে তোর ছেলে ভালো আছে।'

'আর বুড়ি? আমার শাশুড়ী?'

'সেও ভালো আছে।'

এই সামান্য দুটি কথায় ওকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সঙ্গে আর কোনো খবর নেই তো? আহা ও যদি নিজের হাতে চিঠি লিখতে পারত! নিজের অজ্ঞতাকে ধিক্কার দেয়। বাড়ি ছেড়ে এলে পর মন খুব খারাপ হবে সেকথা আরিজিয়া বুঝেছিল। কিন্তু এতো কেবল মন খারাপ নয়—এ যেন দণ্ডে দণ্ডে মরা!

ও নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। কিছু দিনের মধ্যেই তো সোফিয়ার সাত মাস পূরণ হবে। দোরি ঠিক করেছে ন' মাসে বুকের দুধ ছাড়াতে হবে। সুতরাং আর কটা দিন মাত্র ধৈর্য ধরে থাকা। আর দুটি

যাক নরক যন্ত্রণা! অদৃষ্টের লেখা—ঠেকিয়ে রাখবে কী করে। যা ঠেকান যাবে না তাকে মেনে নেওয়াই ভালো।

যেদিন মোনিকার সাতমাস পূর্ণ হয়েছে সেদিনই আবার ওর প্রথম ফুল-কাত দেখা দিয়েছে। বাড়িতে যেন উৎসবের ধুম। আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় আম্রিচিয়ার মনও খুশিতে উঠেছে ভরে। অন্তরালে সেদিনই যে ওর সর্বনাশের আয়োজন হচ্ছিল এমন আশঙ্কা ওর ভুলেও মনে হয়নি।

বাইরের দরজার ঘণ্টা বাজল। আম্রিচিয়া ভাবল পিয়ন এসেছে বুঝি এক ছুটে দরজা খুলতে গেল। আজ হয়তো বা মিসিসিপির ডাক এসেছে। দরজা খুলে দেবার পর কী যে ঘটল ওর কিছু মনে নেই। মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগে ও বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। জ্ঞান ফিরে এলে পর দেখে মাকড়ো দাঁড়িয়ে, বুটসুদ্ধ পা তুলেছে ওর বুকের উপর লাথি মারতে। রাগে সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন মুছে গেছে।

'হারামজাদী! কোথায় তোর মনিব?'

আম্রিচিয়ার কান্না শুনে সিনোর মোরি, এরমিলিয়া আর রাফিয়েলি দৌড়ে বাইরের ঘরে এল। মোরির কোটের কলারটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল—'আমার ছেলে মরে গেছে—জানো সে কথা?'

আম্রিচিয়ার দিকে ফিরে দাঁড়াতে সে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল।

'কুৎসি মরে গেছে, আর ফিরবে না। নবাবপুত্র কী করবেন এখন—ক্ষতিপূরণ করবি না ছেলের বদলে ছেলে দিবি?'

ভয়ে এরমিলিয়ার মুখ চুন—বলল, 'লোকটা পাগল হল না কি?'

মোরি ছোট্ট মানুষটি—আচমকা ডিভান থেকে হাত নেড়ে নিজেকে মুক্ত করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে দরজার দিকে ধাক্কা দিল। বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'বেরিয়ে যাও বলছি। বেরোও আমার বাড়ি থেকে!'

'মুখ সামলে কথা বলো। আমি কারো পরোয়া করিনা। যা ছিল স
গেছে—জীবনে যারা আমার নেই। যা পাপের তিথিতি হয়েছে, প্রে
গেছে মরে। আমার কী? আমি পিপপির খাচ্ছি না। আগে তোর গা
খুচু দি তারপর এই হারামজাদীকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টে
নিয়ে যাবো।…ওঠ বলছি হতচ্ছাড়ী!'

হট্টগোল যখন পুরোদমে চলছে তখন একটা ফাঁকে থাবিতেরি গিয়েছি
বেরিয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, সঙ্গে দুটো পুলিশ। উত্তেজনা
তখনো বোরি কাঁপছে—পুলিশকে বলল, 'নিয়ে যাও ওকে, ঘাড় ধরে
নিয়ে যাও। বদমাশটা বাড়ি বয়ে আমার অপমান করতে এসেছিল…
শাসাতে এসেছিল।'

পুলিশ দুটো শক্ত করে মাকরোকে ধরল। ও চেঁচাচ্ছে, 'আমার বৌকে
চাই—ওকে আমি ছাড়ব না।'

চেঁচাচ্ছে আর ধস্তাধস্তি করছে। পুলিশরা শেষ পর্যন্ত ওকে হিঁচড়ে
টেনে নিয়ে চলে গেল। বোরি ওদের পিছনে পিছনে থানায় গিয়ে
তিভার নামে নালিশ রুজু করে এল।

পরদিন সিমোর মানক্রনির চিঠি এল—যথাসময়ের বহু পরে। চিঠিতে
বুৎসির মৃত্যু ও মাকরোর বুড়িমার অসুখের খবর আছে, তিভার
উল্লেখ নেই।

বোরি প্রথমে ভেবেছিল লোকটা বোধ হয় দ্বীপান্তর থেকে পালিয়ে
এসেছে। পরে শুনল ওর জন্য মা হাসপাতাল থেকে দরখাস্ত করায়
পুলিশের কর্তৃপক্ষ ওর শাস্তির বাকী কয়মাস মকুব করে দিয়েছেন।
রোমের পুলিশ তিভাকে সিসিলি চালান করে দিল। সাবধান করে
দিল—তিন বছর নজরবন্দী থাকবে, বাড়াবাড়ি করলে আবার সেই
কালাপানির পারে পাঠান হবে।

ভিতার হাতে পিরিচ, তার উপর মুৎসির মৃত্যু সংবাদ, এই দুই ঘটনার সংযোগে আম্রিকিয়ার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তিন দিন তীব্র জ্বর, ঘোর বিকার, মনে হল পাগল হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে যেন ঘোর কেটে গেল, একটু একটু করে ও প্রকৃতিস্থ হয়ে এল। বক্তের পরেকার প্রশান্তি অথচ থমথমে ভাবটা এখনো কাটে নি। ওর চোখ চেয়ে থাকে কিন্তু দেখে না। কেউ কিছু বললে মাথা নাড়ে কিন্তু কথাটা বুঝেছে ব'লে মনে হয় না। এর চেয়ে যেন আগের সেই অবস্থাটাই ভালো ছিল।

অসুখ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। বাধ্যে পড়েই ছেলেটাকে দুধ ছাড়াতে হ'ল। বাড়িতে হুলুস্থুল ব্যাপার। একটি দিনের জন্যে ছেলেটির দেখাশুনো করে নি, এখন এরসিলিয়ার কাছে সে থাকবে কেন। দুটো রাত তো ঘুমতেই দিলে না—সারাক্ষণ কাঁদন খাইবার জন্যে। এক মুহূর্তের স্বস্তি নেই—এর উপর আবার গৃহস্থালীর কাজ, নতুন ঝিকে খাটানো। আম্রিকিয়াকেও একটু আধটু তো দেখতে হয়! এরসিলিয়ার মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেছে। হরদম যোরিকে বকছে। সে বেচারী খবর কাগজ হাতে এদিকে ওদিকে ঘুর ঘুর করছে, বুঝতে পারছে না কী করবে।

'কিছু করতে হবে না কি?'

'ন্যাকামি রাখো! চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? দেখতে পাচ্ছ না একা কত কাজ সামলাচ্ছি। সংসারের কাজ, খোকার দেখবৎ, এর উপর যদি ওই বজ্জাত মেয়েটার দেখাশুনো করতে হয় তো আমার সইবে না ব'লে দিচ্ছি। বাড়ি থেকে দু'পা বেরিয়ে গিয়ে একটা কোনো অনাথ আশ্রমে বা হাসপাতালে ওকে ভর্তি করে দাও গে। বুঝেছ, হাঁ করে তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না!'

এমিলো ওর কথা শুনে অবাক, বললে, 'ওকে পাঠাবে অনাথ আশ্রমে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ! দরদ যে উপচে পড়ছে, সোহাগ ধরে না। যত মায়ামমতা

ওই দাসীটার জন্যে, আর আমি বুঝি বানে ভেসে এসেছি। রাতের পর রাত চোখে ঘুম নেই, চুলটা আঁচড়াবার পর্যন্ত সময় পাইনা—সে তো তোমার চোখে পড়ে না। খেটে খেটে হাড় কালি। আমি বাড়ির সবাই-কার বাঁদী—না। সেরে উঠুক বাঁদী—তখন দেখে নেবো। দূর করে দেবো—ও পাপ বিদেয় না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

শাসালো বটে, কিন্তু কাজে খাটাতে পারল না। আমিরজিয়ার শরীরটা যখন সারবার মুখে তখন একদিন কথায় কথায় জানিয়ে দিল ওর সাত-মাসের মাইনে বাবদ অনেকগুলো পয়সা জমেছে।

সোনিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমিরজিয়া বলল, 'টাকা পয়সা নিয়ে আমি কী করব দিদি। খোকাই আমার সর্বস্ব ধন।' সোনিয়া আবার ওর কোলে ফিরে এসেছে। খুব পায়না কিন্তু ঠিক সেই আগের মতো ভালোবাসে। ওর অসুখ সারবার পর প্রথম যেদিন ঝি সোনিয়াকে ওর বিছানায় নিয়ে আসে সেদিন খোকার দিকে ওর তাকাতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমিরজিয়া যে-খোকাকে চায় সে আর কখনো ওর কোলে ফিরবে না। কিন্তু সোনিয়া যখন ছোট ছোট হাত দুটো বাড়িয়ে অধীরভাবে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল তখন আর ও স্থির থাকতে পারল না। খোকাকে দুহাত দিয়ে বুকে তুলে নিল যেন সোনিয়াই ওর মুন্সি। এতদিনকার নিরুদ্ধ শোকের বাঁধ অবিরল অশ্রুর বন্যায় ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।

'খোকা আমার যাদু আমার। কী চাস বাবা আমার [illegible] একফোঁটা দুধ নেই ধন। তোর মাইমা মরে গেছে…'

মুন্সি কী জানে মারা গেল সে খবরটা পেলে ও যেন একটু নিশ্চিন্ত হত। মরুক—কিন্তু খেতে না পেয়ে না মরে—কিছু না ভাবতে পারলে ও মনকে বোঝায় কী করে। কিছু জানতে পারে না ও? এ যেন একটা কুকুরের বাচ্চা মরেছে। আহা বাছারে, মারে তাড়ানো বাপে খেদানো

…াপ ছেলের বড়ো পায়ের ঘরে অবশেষে যাত্রা গেল। হা ভগবান!
আম্রিজিয়ার কষ্ট কেউ বোঝে না। এরসিলিয়া তো মরাই। উল্টে বরং
বেরঙই হল—সাতমাস খেতে না খেতে বুকের দুধ শুকিয়ে গেল ব'লে।
তা তো চটবেই—মায়ের প্রাণ। মার কাছে তার নিজের ছেলে ছাড়া
জগতে আর কেউ নেই। ওর শিশুটি মারা গেছে তাতে এরসিলিয়ার
…ী। বিরক্ত হতে পারে কিন্তু দুঃখ কেন হবে। আম্রিজিয়া মাঝে মাঝে
ভাবে, সিনোরা মাইনা দুঃখ পেল। কিন্তু এতটুকু তো ওর খোকা উচিত
…র লোনিদার উপর আমারও খানিকটা দাবী থাকতে পারে। পেটে
…স ধরেছে বটে কিন্তু বুকের দুধ দিয়ে মানুষ তো আমিই করেছি। আমার
তো এখন কেউ নেই ওই লোনিদা ছাড়া।
খোকাকে দেখাশুনোর ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে না বলে এরসিলিয়া খুশিই
হয়েছে। কিন্তু মনে মনে ও স্থির করেছে লিওনিদাকে দাসীর অত
ন্যাওটো হতে দিলে চলবে না—দাসী এমন করে যেন ছেলেটা ওর
নিজের। ওকে বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য ও দৃঢ় সংকল্প। কেনই বা ওকে
রাখবে? না জানে বাড়ির কাজ, না পারবে খোকার আয়া হতে।
তাছাড়া এরসিলিয়া চায় ওর ছেলে যেন শুদ্ধ মার্জিত ইতালিয়ান ভাষা
শেখে। সেদিক থেকে আম্রিজিয়া অচল! সিসিলির গেঁয়ো ভাষা ছাড়া
কোনো ভাষা জানে না। নাঃ, ওকে থাকতে দেওয়া হবে না! ওকে রাখা
মানে মোরিকে সুন্দর মুখ দেখবার সুযোগ দেওয়া। মোরিকেই বলতে
হবে ওকে যেন তাড়ায়।

মোরি বলে, 'আমি ওকে তাড়াতে যাব কেন?'

'কারণ,' তুমি যে হলে বাড়ির কর্তা। তাছাড়া দরদ দেখিয়ে তুমি যে ওর
মাথা খেয়েছ। বুঝতে পার না?'

'আমি? আমি আবার দরদ দেখাতে গেলুম কবে?'

'তুমি কি বলতে চাও এটা আমার মন-গড়া কথা? দেখতে পাওনা ওর

হাবভাব এমন যেন বাড়িটা ওর নিজের। একই ছেলের দু'টো মা আর একই বাড়িতে দু'টো কর্ত্রী—এ তোমার ভালো লাগতে পারে, আমার কিন্তু বরদাস্ত হবে না।'

এমিয়ো জানে কথা কাটাকাটি করতে গেলে ব্যাপার খারাপই হবে, তবু নিজের হয়ে ওকালতি করতে ছাড়ে না। 'এসব তুমি কী যা তা বলছ বলো দেখি? জোর করে সমস্ত জিনিসটা তুমি বিচ্ছিরি করে তুলছ। এবং অমূলক সন্দেহ করে লাভ আছে কিছু? তুমি দেখতে পাও না, আমি সারাক্ষণ কাজ আর পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কোনো দিকে আমি কোনো দিন নজর দিয়েছি? বাড়িতে যাতে শান্তি থাকে, তুমি যাতে সুখী হও সেজন্য নিজের ছেলেকে পর্যন্ত আদর করা ছেড়ে দিয়েছি। আমিচ্চিয়া বেচারির কোনো দোষ নেই—মিছিমিছি তুমি ওকে অবিশ্বাস করছ। একবার ওর কথাটাও ভেবে দেখ। সিসিলি ফিরে যাবে ও কোন সাহসে?…ছেলে মরে গেছে, জানোয়ার স্বামীটা ওকে কি আর আস্ত রাখবে? এইখানে থাইমা হয়ে এল ব'লেই তো নিজের ছেলেটি হারাল। যে ছেলেকে মানুষ করবার জন্য ও আপন ছেলেকে বিসর্জন দিল তার প্রতি যদি ওর মায়া বসে যায়, তার কাছ-ছাড়া হতে যদি না চায়, সেটা তুমি দোষের বলবে? বুঝে দেখ।'

স্ত্রীর কাছে ও যে যুক্তিগুলো আওড়াচ্ছে সেগুলো ওর নিজের লেখা থেকেই চুরি করা। সেগুলি সোশ্যালিস্ট ক্লাবে কিছুদিন পরে ওর বক্তৃতা দেবার কথা। বক্তৃতার জন্য সে তৈরি হচ্ছে। ও [illegible] করেছে দূর সিসিলিতে এই যে একটি মা-ছাড়া শিশুর মৃত্যু হ'ল—এই ঘটনাটা বেশ ফলাও করে বক্তৃতার মধ্যে জুড়ে দেবে।

এরসিলিয়া যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। বরঞ্চ উলটো বিপত্তি ঘটল। গজ গজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—তখুনি আমিচ্চিয়াকে কাজ থেকে জবাব দিতে। সিনোর বোর্ঘি বিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়াল—বক্তৃতার লেখা অংশগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মিনিট কয়েক পরে আমিনিয়ার চাপা কান্নার শব্দ শোনা গেল। কাতরস্বরে ওর কর্ত্রীকে অনুনয় করে বলেছে, 'আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না, মাইনে চাইবে, কেবল দুমুঠো খেতে দিয়ো—তোমাদের এঁটোকাঁটা যা পড়ে থাকে। আমি এক কোনায় পড়ে থাকব। দোহাই তোমার, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। আমি ফিরে যেতে পারব না, কক্ষনো পারব না। সোনিয়ার দোহাই, আমাকে দয়া করে রাখো। তাড়িয়ে দিলে আমার সর্বনাশ হবে। আমার কোথাও যাবার পথ নেই।' অনেকক্ষণ ধরে কান্না আর অনুনয়ের পালা চলল। তারপর সব চুপচাপ। মোহি ভাবলে আমিনিয়ার মন হয়তো ভিজেছে। মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাড়াল না।

কিছুক্ষণ পর সিনোর রাবিচেল্লি মোহির ঘরে ঢুকল। ওর প্রতিদিনকার ভারিক্কি চাল খসে পড়েছে। লাল মুখখানায় কুতকুতে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'খুব বাগিয়েছি বলতে হবে।' মনিবের সামনেই আনন্দে হাত কচলায় আর কি। 'সিসিলির ঐ খাপসুরৎ মাইটা—ঐ যাকে দিদি একটু আগে বের করে দিয়েছেন—আজ রাত্রেই সে আমার বাড়িতে আসছে! জোর বরাত বলতে হবে—শিকার আপনা হতে ধরা দিয়েছে। মাইগুলো যে নষ্ট মেয়েমানুষ তা কে না জানে? পাঁচ ডাক্তার দিয়ে কারবার...যে কেউ তুলে নিলেই হ'ল। এটি কিন্তু জাত সোনা—এমন ভড়ং করে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ওর ভাবখানা আমি যেন ওকে দিয়ে দাসীর কাজ করাবো। দাসী বটে...কিন্তু সোনাদাসী।'

'সিনোর রাবিচেল্লি!'

'আজ্ঞে।'

বক্তৃতার লিখিত অংশগুলো মুহুরীর হাতে দিয়ে মোহি বলল, 'এখনো

চট্‌ করে কপি করে ফেলুন তো !

রাবিচেট্রি লিখে চলুন : সমাজতন্ত্রের ধনিয়াদ পাকা করতে গেলে অর্থাৎ মানব সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে দুটি কথা মনে রাখা কর্তব্য। প্রথমত, সকল মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্ত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত জীবন সংগ্রামের সূচনায় সকলকে সমান সুযোগ দিতে হবে। সমাজ-ব্যবস্থায় এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে প্রত্যেকেই স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাধীন ক্ষেত্র পাবে। দুঃখের বিষয় আধুনিক সমাজে এখনও এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। তার বিষময় ফল আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করছি। যে শিশু শক্তি ও স্বাস্থ্য নিয়ে গরীবের ঘরে জন্মায় পরিণামে তাকে রুগ্ন শীর্ণ ধনীর সন্তানের কাছে হার মানতে হয়।......

'সিদোর রাবিচেট্রি !'

'আজ্ঞে। স্যর !'

'আপনার আজ কী হয়েছে বলুন তো ? মাথা-খারাপ হ'ল নাকি ? অমন করে তাকাচ্ছেন কেন ?'

—ক্ষিতীশ রায়

খেলা

দরতিয়ার মা দু'বার দরজা খুলে ব'লে গেছেন, 'অত বেশি কথা বোলো না, উত্তেজিত হয়ো না, জ্বর বাড়বে। সব সময়ই তুমি কথা বলছ…একা একাই খেলা করছ'…

ছোট্ট বিছানাটার উপর চারপাশে একগাদা বালিশ সাজিয়ে হেলান দিয়ে দরতিয়া বসেছিল। সুন্দর সুন্দর অনেক পুতুল চারদিকে সাজান—খেলার উত্তেজনায় তার হলদে রঙের চুলগুলো নীল সিল্কের টুপির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে সে মার কথার জবাব দিল, 'না, মা, আমি একা খেলছি না। নেনিও খেলছে।'

দরতিয়ার নার্সের ছোট্ট মেয়ে নেনি—সত্যি কথা বলতে কী নেনি কিন্তু এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি! দরতিয়ার মা যতবার দরজা খুলে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েছেন ততবার ও ভয়ানক ভয় পেয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে। দরতিয়ার ঘরে যখন সে এসেছে, তারপর থেকে দু'ঘণ্টা নেনি যেন স্বপ্নলোকে ভেসে বেড়িয়েছে। প্রত্যেকবার দরজার হাতলের শব্দ, দরজা খোলার ক্যাচ্ ক্যাচ্ আওয়াজ, দরতিয়ার মা আর তাঁর কণ্ঠস্বর ওকে সেই স্বপ্নলোক থেকে ধাক্কা দিয়ে—আবার মাটির পৃথিবীতে ফেলে দিয়েছে। এতটা সময় সত্যি সত্যিই সে যেন পরীর রাজ্যে ছিল। শুধু একটি মাত্র ভয় বারবার জেগেছে তার মনে—হয়তো যা সে দেখছে, যা কিছু সে হাত দিয়ে ছুঁতে পারছে—এ কিছুই সত্যি নয়।

পরনে সবুজ রঙের একটা ফ্রক—বছর দুয়েক ধরে সে এই একটা ফ্রকই পরছে। এত ছোট হয়ে গিয়েছে সে ফ্রক—যে গলার কাছে, হাতের তলায়, খাঁজের কাছে বেশ টান পড়ে; রীতিমত কষ্ট হয়। মাথার ফিতের পুরনো রঙ-উঠে-যাওয়া রিবন—একরাশ ঘন কালো চুলের চাপে ক্রমশ খুলে যাচ্ছে। চুলগুলো তখনো ভিজে—নরভিয়ার বাড়ি আসতে হবে, সেইজন্য সে আসার আগে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া ঘষে মেজে পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নার্সারিতে প্রথম ঢুকে, সাদা আঁটা দেয়াল, নীল রঙের ফিতের পরদা আর অন্যান্য সব দামি দামি জিনিস দেখে নেলি এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে প্রথম-প্রথম সে কিছু ভালো করে দেখতে বা শুনতেই পারছিল না। শরীরে মাংসের সংগে যেমন চামড়া—নেলির খাটো-হাতা-জামাটা হাতের সংগে ঠিক সেই রকম এঁটে আছে—ফলে হাতটা তার প্রায় ফুলে উঠেছিল। ঘরে ঢোকার একটু পরে খুব আস্তে আস্তে, কী যে করছে তা না জেনেই, নেলি তার হাতটা নরভিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল। তারপর বিছানার এক পাশে বসে নরম চাদরটার উপর হাত বুলোতে বুলোতে হাঁ করে একমনে নরভিয়ার বকবকানি শুনতে লাগল।

নরভিয়া বেশ বুঝতে পারছিল যে এতক্ষণ কোনো কথা না বললেও নেলিই সত্যি সত্যি খেলছে। নেলি চুপ করে গোল করে সাজানো পুতুলগুলোর দিকে একমনে তাকিয়ে আছে—তার এই একাগ্রতায় মনে হচ্ছে যেন পুতুলগুলোর সত্যি সত্যি প্রাণ আছে, তারা যেন বসেছে এক সংগে চা খেতে। নেলির অবস্থা দেখে পুতুলগুলোকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কথা বলিয়ে নরভিয়াও আনন্দ পাচ্ছিল। এত-দিন নরভিয়ার মনে হত যে তার পুতুলগুলো শুধু পুতুলই—প্রাণ ওদের নেই—শুধু কয়েকটা কাঠের টুকরোর উপর মোমের কি কাচের তৈরি মাথা, কাচের চোখ, পাটের চুল—শুধু পুতুল। আজ মনে হচ্ছে আর ওরা

ুল নয়, ওদের প্রাণ আছে। আর এমনভাবে ওরা প্রাণ পেয়েছে যে,
। যে কখনও সম্ভব হতে পারে একথা দয়মন্তিয়া কোনোদিন ভাবতেও
রে নি। বাড়ির একটা দামীর জোট মেয়ের অবাক হওয়া এখনো
রার কলে পুতুলগুলো যে সত্যিকার মানুষ হয়ে যেতে পারে এই দেখে
েরি অবাক লাগছিল দয়মন্তিয়ার। নেনিকে আরো অবাক করে দেবার
েত সে বড়-বড় ভদ্র মহিলাদের মতো কথা করে যাচ্ছিল—তার মায়ের
ুয়া যেমন কতরকম কেতাদুরস্ত কথা বলেন, সেই রকম কথা, ভাবখানা
ই যেন পুতুলরাই কথা বলছে।
! পুতুলটা দেখছ নেনি? ওঁর নাম কাউন্টেস্ দুদু। উনি নিজেই নিজের
োটরগাড়ি হাঁকান, সোনা বসানো সিগারেট খান আর এই রকম করে
াঙুল তুলে সব সময় বলেন, 'মরিংগি! তুমি যদি আমাকে ছেড়ে
ালিয়ে যাও, মরিংগি, তাহ'লে আমিও সব ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে
তামার কাছে চলে যাব।'
রিংগি যে কে নেনি তা জানে না। হয়তো কোনো জাদুকর, কিংবা
য়ন্তিয়ার মার কোনো বন্ধু, কিংবা হয়তো তাঁর সব মহিলাবন্ধুরই সে
ন্ধু। দয়মন্তিয়া ওকে ব'লে দিয়েছে, মিসট্রেস বেটি নামে যে পুতুলটি তার
সংগে মরিংগির বড় ভাব। তাই যতবার কাউন্টেস্ দুদুর কথা ও শুনছে,
ততবারই নেনির মনে হচ্ছে—মরিংগি বোধ হয় কোনো জাদুকর।
All right, thank you, আচ্ছা নমস্কার।'
না, না, অমন করে হেসো না নেনি। মিসট্রেস্ বেটি সব সময় ইংরিজিতে
কথা বলেন—আমার মার কাছে, সব-না-ইয়ের কাছে। সব সময়
ঘোড়ায় চড়ে খটখট করে ঘুরে বেড়ান। ওঁর একটা খারাপ অভ্যাস আছে
জানো নেনি—পুরুষ মানুষদের মতো এমনি পা ফাঁক করে উনি ঘোড়ায়
চড়েন—এত বিশ্রী দেখায়! ঘোড়া থেকে পড়েনও তেমনি। একবার
কী হয়েছিল জানো, কতগুলো নেকড়ে বাঘের পিছনে তাড়া করে

যেতে যেতে পড়ে গিয়ে ওঁর গালে ঘা লেগেছিল। ভাবো, এখনো দাগ রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ? কেন হয়েছিল—উনি একদম ভালো না, জাতে আমেরিকান কিনা! পড়ে গিয়ে ওঁর বুকে, পিঠে, এমন কী পায়ে কোথায় কী চোট লেগেছে সেগুলো পর্যন্ত সবাইকে দেখিয়ে বেড়ান—লজ্জা নেই! যদি উনি তোমার হ্যাণ্ড-সেক করতে আসেন তাহ'লেই সেরে আর কি—এমন লাগবে। All right, thank you, আচ্ছা, ধন্যবাদ···

'আর ঐ পুতুলটার কথা বলছো? উনি ভারি মজার—হাসিয়ে হাসিয়ে একেবারে মেরে ফ্যালেন! ওঁর নাম হচ্ছে ডনা মারিয়্। ওঁর কথা বলা শোননি তো!' গলার স্বর বিকৃত করার চেষ্টা করে মরতিয়া ব'লে যেতে লাগল, 'ওঃ, বাবারে বাবা! মাথাটা আমার গেল! মরিংপি ভুলে যেয়ো না, আমার হার্ট ভারি দুর্বল। একটু গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা বলো। আমার শরীর নিশ্চয় খারাপ হবে···মরিংপি সত্যি সত্যি আর হাসতে পারছি না। মাথাটা প্রায় কেটে যাবার জোগাড় হয়েছে। আর হার্টও যে রকম দুর্বল···দোহাই তোমার মরিংপি!—আর একটা মজার কথা জান নেনি, ডনা মারিয়্ ভালো করে সব কথা উচ্চারণ করতেও পারেন না। মরিংপি যেমন করে কথা বলে উনিও তেমনি ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন। ওঃ, ওকে দেখলেই এত হাসি পায়—'

এ সব কথা শুনে নেনির মাথা সত্যি সত্যিই ঘুরতে থাকে।

সে অবাক হয়ে ভাবে! একটা পুতুল সিগারেট খায়, আর একটা পুতুল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যায়—এ সব সত্যি নাকি? কিন্তু ওই পুতুলটার গালে সেই পড়ে যাওয়ার দাগটা তো ঠিক আছে। নেনি ভাবে, পুতুল-গুলো যদি লেস্-এর পাড় দেওয়া জামা পরতে পারে, মাথায় বো-ফিতা রিবন বসাতে পারে, সিল্কের মোজা, মখমলের শার্ট, সোনার বোতাম লাগানো পেটেন্ট চামড়ার জুতো পরতে পারে, তাহলে হয়তো সত্যিই

য়া ঘোড়ায়ও চড়ে, সিগারেটও খায়, আর ঐ যে ইংরিজি না কি, যে
থা মেমি একদম বুঝতে পারে না, সেই ভাষায় কথাও কইতে পারে।
মন সুন্দর এই ঘরটি—যেন যে-কোনো অবাক কাণ্ড সত্যি হয়ে উঠতে
পারে! মেমি আর আশা করে আছে—ঐ যে ছোট্ট ছোট্ট ঘোড়াগুলো
—ওগুলো যেন যে কোনও মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠে ঘর জোড়া মখমলের
তো কার্পেটের উপর দৌড়ে দৌড়ে বেড়াবে, পুতুলগুলো তাদের
পিঠে—তাদের পাতলা সুন্দর ঘোমটাগুলো উড়তে থাকবে বাতাসে।

নিজের ঘরে মেমি এত বিভোর যে সরভিয়ার কথাগুলো তার কানেই
ঢুকছিল না বা ঢুকলেও কোনো মানে ঠিক বুঝতে পারছিল না।
খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে সরভিয়া ঠিক করেছে মেমিকে একটা পুতুল
একেবারে দিয়ে দেবে। সমস্যা এখন—কোনটি দেবে, আর তাই নিয়ে
সে রীতিমত চিন্তায় মগ্ন।

সরভিয়া বলছে, 'ওইটা? উঁহু, ওটা দেব না তোমায়। একটা হাত
নিয়ে বেচারা বড্ড ভুগছে—আমার কাছটিতে শুয়ে থাকা ওর ভারি
দরকার। দেখ মেমি, আমি তোমাকে…আমি তোমাকে মিসট্রেস
বেটীকেই দিয়ে দিলাম।…না, না, না, ওকেও তো দেওয়া চলবে না।
ও নিশ্চয় তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে…মিসট্রেস্ বেটীর মতো
এত দুষ্টু পুতুল আর হয় না…কড়া কড়া কথা বলে, আর তাও বলে
ইংরিজিতে, তুমি তার একটি বর্ণও বুঝবে না। আচ্ছা তুমি এইটে নাও।
এঁর নাম মিমি, তুমি কিন্তু এঁকে সব সময় 'মিসেজি' ব'লে ডাকবে;
উনি মার্শনেস কিনা। মার্শনেস কী তা বোঝ তো? ওঁর নাম মার্শনেস
মিমি। ইনি কিন্তু বড্ড—বড্—তো খুঁতখুঁতে মানুষ। রোজ সকালবেলা
ঠিক সময়ে এঁর স্নানের ব্যবস্থা থাকা চাই, ব্রেকফাস্টের সময় চকোলেট
চাইই আর বিস্কুট…আর…আর তাছাড়া…বুঝলে…আর তাছাড়া
একবারে অনেকখানি খেতে পারেন না—বা যেরকম ছোট্ট ছোট্ট

রূপোর পাড়ে মোড়া ঝিল্লি কিনে আনে, সেই রকম ঝিল্লি ছাড়া আর কিছুই খায় না। ঝিল্লিগুলো কোথায় পাওয়া যায় জান তো? ওই যে গ্র্যাণ্ড হোটেলের উল্টো ফুটপাতে যে বড় দোকানটা আছে, ওইখানে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, বিবিকেই তোমায় দিয়ে দিলাম। এই নাও—ধর। বুঝতে পারছ না—তোমাকে একেবারে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি বাড়িতে নিয়ে যেতে পার···আচ্ছা দাঁড়াও, আহা চলে যাচ্ছে, আমি একবার আদর করে দিই।···নাও, এইবার তোমার সংগে নিয়ে যেতে পার।'

নেলি যে কী করবে তা ভেবেই পেল না। এত অবাক হয়ে গিয়েছে সে যে পুতুল পাওয়ার আনন্দটুকু উপভোগ করার শক্তিটুকুও তার হারিয়ে গেছে···কেবলই মনে হচ্ছে পুতুলটা নেওয়া বোধ হয় ওর উচিত হবে না। চলে যাবার জন্তে নেলি উঠে দাঁড়াল কিন্তু দরতিয়াও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে পুতুলটাকে তার হাতের ভিতর গুঁজে দিল। নেলির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়—পুতুলটাকে যে হাত বাড়িয়ে নেবে সে ক্ষমতাও ওর নেই।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন দরতিয়ার মা—পিছনে পিছনে ঢুকল নেলির মা। দরতিয়া যখন খুব ছোট তখন তাকে দুধ দেবার জন্তে নেলির মা এ বাড়িতে চাকরি নিয়ে এসেছিল, এখন দরতিয়া বেশ বড় হয়ে গেছে, তবু এখানেই সে রয়ে গেছে। দরতিয়ার মার পাশে ওর নিজের মা দাঁড়িয়ে—নেলি একবার মুখ তুলে তাকাল মায়ের দিকে। ওর মনে হ'ল, ওই সুন্দর পোশাকে, মাথার মার্সলের টুপি আর [illegible] পরে সাদা এম্ব্রয়ডারি করা এপ্রন্—এই আশ্চর্য বাড়িটার মতো ওর মাও যেন কোন পরীর দেশের লোক হয়ে গেছে। মা যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে নেই, দূর নীল আকাশের তারার মতো তার দিকে জল্ জল্ করে তাকিয়ে আছে।

কী বলছে তার মা? দরতিয়াকে বারণ করছে নেলিকে পুতুলটা দিতে। বলছে এত সুন্দর পোশাক পরা, এমন ভালো জুতো, ব্রাউস্ আর টুপি

পরা পুতুলটা নেলিকে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আর নেলি পুতুলটা নিয়ে করবেই বা কী! বাড়িতে অনেক কাজ করতে হয় নেলিকে। ওর বাবার সব কাজ ও-ই করে। খেলাধুলোর সময় পর্যন্ত নেই বেচারার। বাড়িতে ফিরে এসে যদি ওর বাবা দেখে সব ঠিক ঠাক গোছান নেই—তাহ'লে বড়ই মুস্কিলে পড়তে হয় ওকে।

বাবা? কোথায় তার বাবা? এই মুহূর্তে নেলির মনে হ'ল তার বাবা যেন অন্য এক জগতের মানুষ। বাবার কথা মনে করতেই ওর কেমন ভয় হয়, ঘেন্না হয়। মাতাল হয়ে ফেরে রোজ রাত্রে, এসে বক বক করে, শুধু-শুধু ওকে মারে, কী ভীষণ জোরে সে ওর চুল ধরে টান লাগায়! হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে ওকে মারে আর চেঁচায়, 'তার বদলে তুই মরলি না কেন?'…

ওর ছোট ভাইটি মারা গেছে—তার বদলে নেলি কেন মরেনি তাই নিয়ে বাবা ওকে রোজ খোঁটা দেয়। তার মা যখন বড়ঘরিয়াকে দুধ দেবার চাকরি নিল তখন নেলিই দেখত তার ছোট্ট ভাইটিকে। পাড়ার একটি মেয়ে মাসে কয়েকটা লিরার বদলে নেলির ভাইটিকে দুধ দিতে রাজি হয়েছিল। একদিন যখন ও ভাইটিকে কোলে করে বসেছিল তখন ভাইটি মারা যায়। ও বুঝতেই পারেনি যে সে মরে গেছে—ঠাণ্ডা, ফ্যাকাশে, মরা দেহটাকেই কোলে করে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছিল। সেই থেকে তার বাবা এই রকম উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য হয়ে গেছে—তার উৎপাতে নেলির মা আজকাল ওদের কাছে থাকেই না, এই বড় বাড়িতে বড়ঘরিয়াদের কাছে থাকে। নেলির বাবা বলে ওর মা নাকি এখন 'বড়োমানুষের বৌ' হয়েছে। সত্যি সত্যি ওর মাকে এখন দেখাচ্ছেও সেই রকম। তার হাসি, কথাবার্তার ভঙ্গী, চেহারা, চালচলন সব বড়ঘরিয়ার মার মতো সুন্দর—নেলির এখন আর মাকে নিজের মা ব'লে মনেই হচ্ছে না।

নেলি তখনও বলছে, 'না না, মিস্ বরতিয়া তা হবে না। অত সুন্দর পুতুলটা নেলির মতো মেয়েকে আপনি কিছুতেই দিতে পারবেন না।'

বরতিয়ার মা কথায় কান দিলেন না। পুতুলটাকে মানে, মার্গনেস বিবিকে নেলির বুকের উপর রেখে ওর হাত দুটো একত্র করে দিলেন। নেলির মা ব'লে উঠল, 'ছি, ছি, সামান্য ভদ্রতাও ভুলে গেছ, দুষ্টু মেয়ে। ধন্যবাদ দিতে হয় তাও জান না। উপহার পেলে কী বলতে হয় মনে নেই?'

সত্যিই সব ভুলে গেছে নেলি। কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বেরলো না। বুকের কাছে মার্গনেসকে সে আঁকড়ে ধরে আছে—তার দিকে একবার সাহস করে তাকাতেও পারল না নেলি।

বরতিয়ার ঘর থেকে ও যখন বেরলো তখনো ওর ঘোর কাটেনি। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সামনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, মা চুলগুলো ঠিক করে দেবার চেষ্টা করলেও লাল রিবনের ফাঁক দিয়ে সেগুলো আছে উঁচু হয়ে। কোনো দিকে কিছু না দেখে, কোনো শব্দ না শুনে নেলি সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এল। ছোট্ট ভাড়া ওদের বাড়ি যেখানে বাপের সংগে ও দিন কাটায়, সেখানে ফিরে এসে তবে যেন কিছুটা জ্ঞান ও ফিরে পেল। ওর মনে হ'ল, যেন ওর নিজের আর এতটুকুও জীবনীশক্তি নেই—সবটুকু যেন ওই সুন্দর পুতুলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। পুতুলটা তখনো নেলি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে আর ভাবছে মার্গনেসের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওর নিজের কোনো ধারণাই নেই—অদ্ভুত বরতিয়ার অনর্গল বকবকানির মধ্যে সেই জীবনের খানিকটা উজ্জ্বল ছবি ও শুধু দেখতে পেয়েছে। পুতুলটা যে সব কথা বলে মিস্ বরতিয়া বলছিল, সে সব কথা যদি ওর কাছেও পুতুলটা বলে তাহ'লে ও বুঝবে কী করে, এই ভেবেই নেলি দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। কী যেন কথাগুলো? 'মনিরেসি, মনিরেসি, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাও, তাহ'লে

আমিও সব ফেলেটুকে পালিয়ে তোমার কাছে চলে যাব।'

এখন, এই ভাঙা বাড়িতে মার্গনেলের সংগে খেলা করতে মহিংপি নিশ্চয় আসবে না—ওর মহিলাবন্ধুদের কথা ছেড়েই দাও। তারা সোনা বসানো সিগারেট আর রূপো বসানো গন্ধভরা বিড়ি খায়। আর সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়ে—জ্যান্ত ঘোড়া, ছোট্ট ছোট্ট ঘোড়া।

পুতুলটাকে নিয়ে ও যে খেলা করতে পারে একথা বেচারার কিন্তু একবারও মনে হ'ল না। তার মনে হ'ল—মার্গনেলের একজন দাসীর দরকার, সে সেই দাসী হতে পারে। কিন্তু তাঁর সংগে কী করে কথা বলতে হয় তা তো সে জানে না, কী রকম ভাবে দিন কাটানো তাঁর অভ্যাস সে সম্বন্ধেও তার কোনো ধারণা নেই। নেলি বেচারা মহা বিপদেই পড়ল।

নিজের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে নেলির আর লজ্জার সীমা রইল না—নিজের জন্তে তার লজ্জা নয়, তার লজ্জা যে ছোট্ট মহিলাটিকে সে কোলে করে তার ঘরে নিয়ে এসেছে তাঁর জন্তে। এখানে তার সেই ছেঁড়া বিছানা, ভাঙা বেতের চেয়ার, আর স্কুলের পড়া করার সময় যে টুলটাকে টেবিল করে ও পড়াশুনো করতো সেই টুলটা—এখানে কোথায় সে মার্গনেলকে রাখবে? এখনো পর্যন্ত পুতুলটার দিকে একবার তাকাতে সে সাহস করেনি। মার্গনেলের চোখ দুটো কাচের—কী একটা বিশ্রী পচা জায়গায় তিনি যে এসে পড়েছেন তা তিনি নিশ্চয় দেখতে পারছেন না, কিন্তু অত সুন্দর ঘর থেকে এসে মার্গনেলের চোখ দিয়েই নেলি তার ঘরটিকে দেখছিল আর ভাবছিল, এখানে ও তাঁকে রাখবে কোথায়? অবশ্যি যতক্ষণ সে পুতুলটার দিকে চেয়ে দেখেনি, বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ততক্ষণ মার্গনেল মিনি কিছুই দেখতে পাননি বটে, কিন্তু যখন সে মনস্থির করে তাঁর দিকে তাকাবে তখন তো তিনি চারপাশের সব কিছু দেখতে পাবেন। নেলি ঠিক করল, প্রথম নজরে তাঁর যাতে খুব খারাপ ধারণা না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বসে পড়ল বিছানার তলায় তার ছোট্ট বাক্সটার মধ্যে মিস্ বরডিমার পুরনো নীল রঙের একটা ঘাঘরা আছে। বরডিমার মা মেলিকে ওটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক বার কেচে কেচে ওটার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ছিঁড়েও গেছে কয়েক জায়গায়, তবু ঐ বড় বাড়ি থেকেই তো ওটা এসেছে, একদিন মিস্ বরডিমাই তো ওটা পরতো—হয়তো বার্ণেস চিনতে পারবে।

পুতুলটাকে না নামিয়ে, একবারও তার দিকে না তাকিয়ে, মেলি নিচু হয়ে বাক্স থেকে ঘাঘরাটি বার করল—তারপর সেটাকে টুলের উপর টেবিল ক্লথ করে পাতল—ছেঁড়াগুলো, অন্তত যে সব জায়গায় বেশি ছেঁড়া—সেগুলো যাতে বার্ণেসের নজরে না পড়ে এমন ভাবে সেটাকে পাতল সে। এবারে সে তবু একটু আশ্বস্ত হ'ল—পুরনো হ'লেও ঘাঘরাটা বেশ পরিষ্কার আছে আর কাপড়টাও খুব ভালো—এটার উপর অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে পুতুলটাকে ও বসাতে পারবে।

আস্তে আস্তে পুতুলটাকে টুলের উপর বসাতে গিয়ে পাছে লাগে বা কাপড় চোপড় নোংরা হয়ে যায় এই ভয়ে ওর হাত কাঁপতে লাগল এতক্ষণে ও পুতুলটার দিকে সাহস করে তাকাতে পারল। ওটার অবহেলায় আর ওর জন্যে দুঃখে সে কাতর হয়ে পড়ল—মুখে এক ব্যাথাতুর অনিশ্চয়তার ছায়া। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে পুতুলটার চোখের দিকে ও তাকাল—মিস্ বরডিমা তাঁর মনের মতন এঁকে যে সুন্দর জীবন দিয়েছিলেন, তার বদলে এসে সেই [illegible] প্রায় কোনো চিহ্নই ও দেখতে পেল না। মেলির মনে হ'ল তার সামনে বসে পুতুলটা প্রাণের মতো তার হারানো জীবন ফিরে পাবার আশা করছে—তার সুখের জীবন, বড় বড় একজন মহিলার জীবন। কিন্তু এখানে কি করে তা সম্ভব হবে? কতটুকুই বা তার ক্ষমতা। তাদের বাড়িতে যে কিছুই নেই। মিস্ বরডিমা বলেছিলেন যে, দিনের মধ্যে অনেকবার

পোশাক বদলান তাঁর পুতুলদের অভ্যাস। মার্গনেস্ বিবিরই তো কত সুন্দর সুন্দর পোশাক ছিল—একটা লাল, একটা হলদে, একটা সবুজ রঙের, একটার উপর ছোট ছোট ফুলের ছাপ দেওয়া, আর একটার সংগে আবার জাপানী ছাতাও ছিল। এখন এটা কী করেই বা আশা করা যায় যে সেই একই পোশাকে, একই জুতো পায়ে, একই টুপি, একই ব্রেসলেট, গলায় একই হার পরে মার্গনেস্ দিন কাটাবেন? গলার হারটার সংগে সত্যিকার পালকের তৈরি ছোট্ট একটা পাখা ঝুলছে; মুখের সামনে নাড়লে ঐটুকু পাখা দিয়েও যে হাওয়া হয় তা বোঝা যায়—ছোট হ'লেও মার্গনেসের পক্ষে তা যথেষ্ট…

মিস্ হবডিয়ার বাড়িতে দরকারি সব জিনিসই ছিল, ছোট্ট সুন্দর বিছানা, নানারকম কাপড়চোপড় ভরা বাক্স—সেখানে যদি ওরা থাকতো তাহ'লে খুশি মনে নেলি মার্গনেসের দাসীবৃত্তি করতে পারত। এখানে, এখানে সে কী করবে? পুতুলটা দেবার সময় মার্গনেসের বিছানা আর অন্তত কয়েকটা জামাকাপড় দিয়ে দেওয়ার কথা মিস্ হবডিয়ার তো মনে হওয়া উচিত ছিল। নেলি যে বেশি দামী কোনো উপহার চাইছে তা তো নয়; তবে যাতে পুতুলটা কষ্ট না পায়, নিজেও যাতে সে মার্গনেসের উপযোগী সেবা যত্ন করতে পারে, সেদিকেও তো মিস্ হবডিয়ার নজর দেওয়া উচিত ছিল। তার নিজের কিছুই নেই—পুতুলের প্রয়োজন সে মেটাবে কী করে? ও শুধু মার্গনেসের পেটেণ্ট চামড়ার জুতোর উপর নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে তারপর আঙুল বা রুমালের এক কোণ দিয়ে সাফ করে দিতে পারে, তাছাড়া আর কী সে পারে? নেলি ঠিক করল, কালই সে পুতুলটাকে নিয়ে গিয়ে মিস্ হবডিয়ারকে বলবে, 'দেখুন, ও যেমন ভাবে থাকার অভ্যাস সেইরকম ভাবে থাকার জন্যে যা যা দরকার তা আমাকে দিন, আর তা না হয় আপনার পুতুল আপনার কাছেই রাখুন।'

কে জানে ? হয়তো মিস্ বয়ডিয়া পুতুলটার যা যা দরকার সবই তাকে দিয়ে দেবেন। নেলি টুলটার সামনে বসে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল। নিজের ঘরের চারদিকে একবার সে তাকাল—হঠাৎ মনে হ'ল মার্গনের মিমির সেই ছোট্ট ঘরটি যেন তার তাজা ঘরের এক কোণে এসে পড়েছে। ঘরটি বেশ বড়ই লাগছে নেলির—মেঝের উপর নরম নীল কার্পেট, কাঠের খাটটা সাদা রঙ করা, ধবধবে পরিষ্কার বিছানা, তবু মশারিটি নীল সিল্কের, খাটের ওদিকে আয়না লাগান দেরাজ, সোনালি রংয়ের চেয়ার, দেয়ালে আর্শি···নেলি যেন নিজেকে দেখতে পেল, তার মায় মতো সুন্দর পোশাক পরে একমনে তার খামখেয়ালি ছোট্ট মনিবটির সেবা করছে। বকুনি যাতে না খেতে হয় তার জন্যে আগে ভাগে ও সব কাজ করে রাখছে। সব রকম সুবিধে তার কাছে থাকলেও, সব রকম বিলাসের জিনিস থাকলেও, বন্ধুবান্ধব তো আর থাকবে না—আর তার জন্যে হবে মন খারাপ—তাই আগে ভাগে সব কাজ সেরে রাখাই ভালো। মুশকিল হচ্ছে এই যে তাঁর মহিলা বন্ধুরা দেখা করতে আসবেন না, মরিসেসির সংগে দেখা হবে না, সকালবেলা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান হবে না···নেলিকে নিশ্চয় এ-সবের ক্ষতি পোষাতে হবে।

'আমার স্নানের জোগাড় করেছ ?'

'এই এক মিনিটের মধ্যে করে দিচ্ছি, মিসেডি !'

'খুব তাড়ার সংগে সংগে আমার স্নানের জোগাড় ঠিক রাখবে। কেন আমাকে শুধু শুধু বসিয়ে রাখছ ? একটা কাজও [illegible] তোমাকে দিয়ে হয় ! পিসপিস আমার চকোলেট এনে দাও আর কিছুই। আর আমার কাপড়-চোপড়—পিসপিস কর।'

'কোন পোশাকটা পরবেন মিসেডি ? লালটা ? হলদেটা ? না জাপানী হাতাওলা পোশাকটা ? কোনটা আনব ?'

'না, বেগুনিটা ! কই সেটার নাম তো করলে না ? ওটা জান না বুঝি ?'

'আজ্ঞে জানি, মনে ছিল না দিলেভি—এই যে এনেছি, দেখুন !'···নেমি একদৃষ্টে ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে আছে যেন কোন জাদুর ছোঁওয়ায় তার স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠেছে। মার্শনেলের সঙ্গে সে জোরে জোরেই কথাবার্তা বলছিল—মার্শনেলের কথায় উচ্চস্বরে হুকুমের ভঙ্গী, আর নিজের কথা নিচু স্বরে, দাসীর যেমন হওয়া উচিত।

হঠাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কেঁপে উঠল—সে দেখল একটা মোটা বিশ্রী হাত তার মাথার উপর দিয়ে এসে পুতুলটাকে ঝটকা মেরে টেনে নিল। তার মাথা ঘুরে উঠল, আস্তে আস্তে মাথাটা সে নামাল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে লোকটার দিকে একবার তাকাবার সাহস তার হ'ল।

পিছনে দাঁড়িয়ে নেমির বাবা—কদাকার হাতের মুঠোয় তার সুন্দর পুতুলটা—সেটার দিকে তাকাতে তাকাতে তার মোটা কদর্য ঠোঁটের ফাঁকে একটা ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠেছে। মাথা নেড়ে এইবার সে চিৎকার করে উঠল, 'ও, বসে বসে এতক্ষণ এই বুঝি হচ্ছে তোর !'

মর্মান্তিক কষ্টে নেমির মন ভরে উঠল—সে দেখল, তার বাবা আর একটা হাত দিয়ে পুতুলটার টুপি ধরেছে। এক হ্যাঁচকা টানে মার্শনেল-দিদির টুপিসুদ্ধ মাথাটা এল খুলে—অনেক কষ্টে নেমি নিজেকে দমন করে রাখল। তারপর পুতুলটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল বাইরে। পরের মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা লাথির চোটে ছিটকে দূরে পড়ে গিয়ে সে শুনল তার বাবার চিৎকার: 'ওঠ্, পিশাচি। ফের যদি এ-সব ন্যাকামি এখানে করবি তো মেরে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব। এসব বড়মানুষি চাল আমার বাড়িতে চলবে না ব'লে দিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছিস্ ?'···

—কমলা রায়

আ বেশ

(১)

১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারির রাতে সরেভোর, করতারা ফ্রানচেসকো আউরেলিও আমিদেই এবং তাঁর স্ত্রী ক্লোরিদার একটি ছেলের জন্ম হ'ল —ছেলেটির নাম হ'ল কসমো আন্তনিও করতারা। ভূমিষ্ঠ হয়েই অদ্ভুত অভ্যর্থনা পেল সে পৃথিবীতে—বেশ উত্তম-মধ্যম প্রহার। প্রসব হতে সময় লেগেছিল অনেকক্ষণ—প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়—তাই পৃথিবী-প্রবেশের সময় সে কাঁদল না। কাজে কাজেই ধাত্রী তার মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে না-কাঁদা পর্যন্ত বেশ কিছুক্ষণ ধরে মার লাগাল—কারণ, পৃথিবী-প্রবেশের পথে কান্না দিয়ে যাত্রা করাটাই পদ্ধতি।

১৮৬১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৬২ সালের ১২ই মার্চ অর্থাৎ এই তেরো মাসে বাচ্চাটির দুধ দেবার লোক বদল হ'ল পাঁচবার। প্রথম দু'জনের দুধ ছিল না যথেষ্ট, তাই তাদের জবাব দেওয়া হ'ল। তৃতীয়টির বেলায় কারণ একটু অন্য রকম ছিল—একদিন স্নানের সময় প্রায় ফুটন্ত গরম জলে একটুও ঠাণ্ডা জল না মিশিয়ে সে বাচ্চাটিকে ফেলে দিয়েছিল। ফলে, ও ভীষণভাবে পুড়ে যায়—অনেক কষ্টে ওর প্রাণ রক্ষা হয়। ভগবান দয়া করে ওর প্রাণ রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু তার বদলে নিলেন তার মাকে। চতুর্থ নার্সটি ওকে বিছানা থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল মোটে তিনবার। আর মোটে একবার নার্সের কোলে নাববার সময় সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল নিচে। একবার

পড়ে গিয়েও বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি বাচ্চাটার—শেষবার নাকের হাড়টা ভেঙে গিয়েছিল শুধু।

যত দিনে তার ন' বছর বয়স হ'ল, ততদিনে কসমো আভনিও তাক্তার আর শুশ্রূষাকার সাহায্যে শিশুকাল থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত পৌঁছতে যে সব অসুখের সিঁড়ি সাধারণত ভাঙতে হয়, তার সব কটিই পার হ'ল। ন' বছর বয়সে ধর্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে স্কুলে পড়তে এল।

ধর্মের গ্রন্থে সাত রকম দাক্ষিণ্যের উল্লেখ আছে—স্কুলে যাবার কয়েক দিন আগে কসমো আভনিও এই সাত রকমের এক রকম প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ফেলল। সমুদ্রের ধারে একটি উলঙ্গ ছেলেকে দেখে, তার বাপ নেপল্‌স্‌ থেকে যে নতুন পোশাকটা কিনে এনেছিলেন, সেইটে খুলে তাকে পরিয়ে দিয়ে নিজে শুধু নাবিক টুপিটি পরে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু হায় রে! এত ভালো কাজ করার পরিণাম হ'ল বাড়িতে এসে বাবার কাছে অকর্মণ্য, বোকা, গাধা ব'লে গালি খাওয়া আর কানের উপর এমন জোরে টান যে আর একটু হ'লেই বেচারার কান দুটো মাথা থেকে খুলে আসছিল আর কী।

স্কুলে কসমো আভনিও এত মন দিয়ে পড়াশুনো আর ধর্মচর্চা শুরু করে দিল যে বছর ষোলো বয়সে তার যক্ষ্মারোগের লক্ষণ দেখা গেল। *De Gratia* নামে বইটিতেও সেদিন পড়ল :—

'*Si quis dixerit grataim perseverantiae none esse gratis datam, anathena sit*' সেই দিন ধর্ম সম্বন্ধে গভীর শিক্ষা প্রথম ও লাভ করল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে বলে যে ভগবান যাকে উদ্ধার করতে চান সে লোক ভালো কী মন্দ বিচার করেন না; ভালো কাজ একবারে করে উঠতে না পারলে বারবার চেষ্টা করার ক্ষমতা তিনি তাকে দান করেন।

সেন্ট টমাসও বলেছেন তাই

কখনো মানবশিশু কয়েক সপ্তাহ ধরে এই প্রশ্ন নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন রইল। তারপর হঠাৎ একদিন রাত্রে দেখা গেল, শুধু শার্ট গায়ে, একটা বাতি হাতে সে ডর্মিটারির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুল চোখ লাল, যেন জ্বর হয়েছে, চোখের দৃষ্টি সাধারণ মানুষের মতো নয়, কী এক অদ্ভুত আভায় জ্বল জ্বল করছে। কী ব্যাপার? ও একটা চাবি খুঁজছে। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করল কিসের চাবি, তখন সে জবাব দিল, অধ্যবসায়ের চাবি। দেখা গেল, সে একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। নেহাৎ ভাগ্যের জোরে ব্রেন ফিভার হয়ে প্রায় মাস খানেক যায় যায় অবস্থায় থেকে সে যাত্রা ও বেঁচে উঠল।

যখন ভালো হয়ে উঠল তখন ধর্মে তার আর একটুও বিশ্বাস রইল না। শুধু তাই নয়—রইল না আরো অনেক কিছু। মাথা থেকে চুলগুলো সব উঠে গেল, কথা বলার শক্তি বন্ধ হ'ল, চোখের দৃষ্টি প্রায় অর্ধেকটা নষ্ট, আরো অনেক কিছু। আগের কথা কিছুই আর সে মনে করতে পারল না—প্রায় এক বছর কাটল তার জড়ের মতো। শেষটায় শিরদাঁড়ায় চুণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে অনেক কষ্টে সে ভালো হয়ে উঠল। বাইশ বছরেরও কিছু বেশি বয়সে সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে নেপল্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও দর্শনের ডক্টরেট হবার জন্তে পড়তে গেল। এই বয়সেই তার মাথা ভর্তি টাক, চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত কম, আর ছেলেবেলায় সেই পড়ে [illegible] ফলে নাকটি ভাঙা।

১৮৮৭ সালের অক্টোবর মাসে সে সাসারির শিল্প বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদপ্রার্থী হ'ল—আশ্চর্যের কথা, পেয়েও গেল চাকরিটি। মানবশিশু আর অন্যান্য জন্তুর শিশুতে প্রভেদ বোধ হয় বিশেষ নেই। যদি ছোট ছোট ছেলেরা তাদের মাস্টারকে পছন্দ না করে, আর মাস্টারও ক্ষীণদৃষ্টির জন্তে ঠিকমতো দেখতে না পান, তাহ'লে ক্লাশ ঘরকে

ভূতের আড্ডা করে তুলতে ছেলেদের একটুও দেরি হয় না। এক্ষেত্রেও হ'ল তাই—অ্যারিস্টটলী মাস্টার ক্লাসে ছেলেদের ঠিক সামলে রাখতে পারেন না ব'লে হেডমাস্টার মশাই প্রায়ই অনুযোগ করতে লাগলেন। রাস্তায় পথে ঘাটেও ছোট ছোট ছেলেরা প্রোফেসর কসমো আন্তনিওকে কম জ্বালাতন করত না। শেষকালে সাধারণ বিজ্ঞানের প্রোফেসর দলকো দলফি ওকে স্কুলে ও স্কুলের বাইরে রক্ষা করবার ভার নিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি কসমোকে তাঁরই বাড়িতে এসে পাশা-পাশি করে থাকতেও অনুরোধ করলেন।

দলকো দলফি মাস্টারি কাজ নিয়েছিলেন বেশ বেশি বয়সেই। লেখা-পড়ায় যে তাঁর কোনো বিশেষ ডিগ্রি ছিল তা নয়—চাকরিটি জোগাড় করেছিলেন পার্লামেন্টের একজন জাঁদরেল সভ্যের দয়ায়—সাধারণত এ কাজ নিতে গেলে যে পরীক্ষা দিতে হয় তা তাঁকে দিতে হয়নি। এর আগে, তিনি প্রথমে আফ্রিকাতে পর্যটক হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তার পর বহু বছর কাজ করেছিলেন জেনোয়ার এক খবরের কাগজে। সারা জীবনে প্রায় বারো তেরোটা ডুয়েল লড়েছিলেন তিনি আর সেগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোতেই জয় তাঁর হয়েছিল। ঈশ্বর তিনি মানতেন না। এখানে সঙ্গে থাকতো তাঁর এক আজব কন্যা… অদ্ভুত নাম মেয়েটির—শয়তানের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি তার নাম রেখেছিলেন স্যাতানিনা।

কসমো আন্তনিও আশা করেছিল যে দলকো দলফির ছায়ার তলায় সে এবারে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাতে পারবে। কিন্তু হায়রে মানুষের আশা! যেটুকু সময় অবসর থাকত দলকো দলফি তাঁর পর্যটক জীবনের ভ্রমণকাহিনী, খবরের কাগজের আপিসের বিচিত্র জীবনযাত্রা, আর তাঁর ডুয়েল লড়ার গল্প ব'লে বেচারা কসমোকে অস্থির করে তুলতেন। দলফি তাঁর নিজের অদ্ভুত জীবন দিয়ে ধর্ম, দর্শন,

ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসতেন—আলোচনা মানে এ নয় যে তাঁর শ্রোতাও কিছু বলার অবকাশ পেত, কথাবার্তা যা বলার, তা তিনি বলতেন একাই। পা ফাঁক করে চেয়ারে বসে, বুক ফুলিয়ে, মুখের অসংখ্য আঁচিলের উপর যে চুলগুলো হয়েছিল সেগুলো পাকাতে পাকাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে বাজে বকতেন তিনি। গল্প যত বড় হত, কসমো আন্তনিও তত বেশি যেন তার নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত, কোনো কথারই প্রতিবাদ করত না। স্কুলের ছাত্রেরা বা রাস্তার ছোঁড়ারা এখন দলকির ভয়ে কসমোকে আর কিছু বলতে সাহস পেত না। এদের হাত থেকে সে যে নিষ্কৃতি পেয়েছিল তা সত্যি। কিন্তু অন্য দিকে, সে তার নিজের স্বাধীন সত্তাটুকু হারিয়ে ফেলেছিল, স্কুলের ছুটির পর অবসর সময়টুকু যে নিজের খুশিমতো কাটাবে সে অধিকার তার ছিল না, এমন কি স্কুল থেকে যে সামান্য মাইনে পেত, সে টাকাও থাকত না তার কাছে। দু'চার পয়সা দরকার হ'লে স্যান্তানিনার কাছে দরবার করতে হত। পনেরো বছর বয়সেই সান্তানিনা এদের সংসারে কর্ত্রী হয়ে উঠেছিল—খুব গোপনে পয়সা দেবার সময় সে ওকে সাবধান করে দিত, 'পয়সা নিয়ে যাই করুন না কেন, বাবাকে যেন বলবেন না। তাহ'লে উনিও পয়সা চাইতে শুরু করবেন, আর দুজনে মিলে পয়সা নিতে থাকলে, আমি সংসার চালাব কেমন করে?'

ভারি সুন্দরী এই সান্তানিনা—কসমো আন্তনিওর এত ভালো লাগত তাকে যে একবার ও দলকিকে বলেছিল, ওর নামটা ছোট করে নিনা বা নিনেত্তা ব'লে ডাকতে। দলকি সে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাগল নাকি? নিনা—নিনেত্তা! ওর নাম হচ্ছে শয়তান, বুঝলে হে শয়তান!

'Salute, O Satana,
O Ribellione
O Forza Vindice
Della Ragione

শয়তান, তোমাকে আহ্বান করি।
বিদ্রোহ, তোমাকে আহ্বান করি।
মানুষের চির জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত তোমায়
তোমাকে নমস্কার করি।'

বছর তিনেক কাটল এই ভাবে। লোকে প্রোফেসর কসমো আন্ত-নিওকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত যে কী করে সে ফলকো ফলকির মতো একটা বিদঘুটে লোকের সংগে দিনের পর দিন কাটাতে পারছে। এসব কথার জবাব সে কখনো দিত না। ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে, কাঁধদুটি চোখ দুটো অর্ধেকটা বন্ধ করে, হতাশার ভঙ্গীতে সে হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিত—সামান্য হাসির চেষ্টায় আরো করুণ দেখাত তার মুখটা। সে বেশ বুঝতে পারত যে ফলকো ফলকি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে লোকে তাকেই বলতে চাইছে যে কত বড়ো একটি অপদার্থ সে।

সত্যি কথা বলতে কী, একটু জোর করে চেপে ধরলে, কসমো আন্তনিও নিজেই স্বীকার করে ফেলত যে তার মতো অপদার্থ আর পৃথিবীতে নেই। তবে, এ বিষয়ে তার তখনো একটু সন্দেহ ছিল—অনেকদিন ভেবে চিন্তে সে ঠিক করেছিল যে তার চেয়েও অপদার্থ পৃথিবীতে আর একটি আছে—সে হচ্ছে মানুষের জীবন, অতিসাধারণ জীবন। জীবন যখন এত বড়ো অপদার্থ, তখন চারদিকে নজর ফেলে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটিয়ে কিংবা তীক্ষ্ণবুদ্ধির ভান করে লাভ কী—বিশেষ করে যখন দেখা যায় যে অপদার্থ জীবন তার অংশগুলো দিয়ে কোনো-কোনো লোককে বাঁচতে দেবার জন্যে একেবারে বদ্ধপরিকর। ফলকোর মতো এরকম ক্ষেত্রে

নিরোধিতা করে কোনো লাভ নেই—জীবনকে যা খুশি তাই করতে দেওয়া ভালো, কারণ, আমরা বুঝতে না পারলেও কোনো একটা বিশেষ লক্ষ্যে পৌছনোর চেষ্টা জীবনের আছেই ; তাও যদি না হয়, জীবন যে একদিন শেষ হয়ে যাবে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই—তবে অযথা কী লাভ তার সংগে বিবাদ করে।

তার অনুমান মিথ্যা হ'ল না। জীবন একদিন হঠাৎ সত্যিসত্যিই শেষ হ'ল—কিন্তু তার নয়। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে সলকো সলকির হঠাৎ এপোপ্লেক্সি হ'ল—জ্ঞান তিনি আর ফিরে পেলেন না।

কসমো এই আঘাত আশা করেনি—সে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। তার মনে হ'ল সমস্ত বাড়িটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে—এমন ফাঁকা যে অবাক লাগে। বাড়ির কোনো আসবাবপত্রের সংগে পরিচয় করবার অবসর তার আগে কোনো দিন হয়নি—সে জানত বাড়ি একটি লোকে সারা বাড়ি ভরে আছে। আজ, সেই আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ল যে ঐ জিনিসগুলোও কসমোরই মতো যেন তারই প্রতীক্ষা করছে যে আর কখনো ফিরবে না।

এদিকে সাঁওতালিনার কান্না কিছুতেই থামে না। প্রথমে কসমো তার কান্না থামাবার কোনো চেষ্টাই করেনি, ভেবেছিল, যাই কেন সে না বলুক, সে কথার কোনো মূল্য সাঁওতালিনার মন এখন স্বীকার করবে না। কয়েক দিন পরে স্কুলের হেডমাস্টার মশাই [illegible] অন্য মাস্টারেরা তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, বেচারা সাঁওতালিনার জন্যে কী ব্যবস্থা সে করছে—হঠাৎ বাপ মারা গেল, আইনত কোনো খোরপোষ ও পাবে না। বাপ একটি পয়সাও রেখে যাননি, কাছাকাছির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, দূরসম্পর্কেরও কোনো আত্মীয় নেই ; মেয়েটা ফেলে না যায়। কসমো তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে অকস্মাৎ জবাব দিল যে এসব কথা নিতান্তই বাহুল্য। মেয়েটা তার কাছেই তার নিজের মেয়ের

হতো, থাকবে। হেডমাস্টার কথাই আর অন্য অন্য মাস্টারেরা ঘাড় বেঁকিয়ে চলে গেলেন—এইটে বোঝা গেল যে এ-ব্যবস্থা তাঁদের মনঃপূত হ'ল না। তাঁরা কেন অসন্তুষ্ট হলেন, কী ভুল যে সে বলল, তা বুঝতে না পেরে কসবো অবাক হয়ে গেল। তার প্রস্তাবে অন্যায়টা কোথায় সাতানিনার সংগেও এই বিষয়ে সে কথাবার্তা বলল—আশ্চর্যের কথা এই যে সেও তার প্রস্তাব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না, বরং জোর গলায় জানিয়ে দিল যে তার সংগে এক বাড়িতে থাকা সাতানিনার পক্ষে অসম্ভব, যত শিগগির সম্ভব তাকে চলে যেতেই হবে।

অবাক হয়ে কসবো প্রশ্ন করল, 'কিন্তু যাবে কোথায়?'

'যেদিকে দুচোখ যায়'—জবাব দিল সাতানিনা।

কসবো আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু যেতে তোমাকে হবেই বা কেন?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

কয়েকদিন পরে অন্যান্য শিক্ষকেরা কারণটা তাকে বুঝিয়ে বলল—তার বয়স সবে মাত্র পেরিয়েছে তিরিশ, সাতানিনারও হ'ল আঠারো। কাজে কাজেই সে সাতানিনার বাপের বয়সি নয়, আর সাতানিনাও তার মেয়ে হবার মতো ছোট নয়। এবার সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে সাতানিনা চলে যেতে চাচ্ছে কেন? বেচারা কসবো একবার পায়ের আঙুলের দিকে, একবার হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল। তারপর গলায় যেন কী আটকে ছিল, সেটাকে গিলে ফেলবার চেষ্টা করতে করতে ভাবতে লাগল—তার বন্ধুরা কী করে সাতানিনাকে···বিয়ে···বিয়ে করার কথা বলছিল? কসবোর মাথা ঘুরে উঠল—তার মনে হ'ল সে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।···না, নিশ্চয় তারা ওর সংগে ঠাট্টা করছিল। নাঃ, এরকম করে হবে না, সাতানিনার সংগে আর একবার ভালো করে কথা ব'লে তার মাথা থেকে ঐ যেদিকে দু'চোখ যাওয়ার বদ পাগলামিটা দূর করতেই হবে।

সাভানিলাও সকলের মতো সেই একই কথা বলুক, একমাত্র একটি শর্তে সে তার কাছে থাকতে পারে—যদি ওদের বিয়ে হয় তবেই সে কসমোর কাছে থাকবে।

কসমো এই ভেবে রীতিমতো ভয় পেল যে সে নিজেই পাগল হয়ে যাচ্ছে।…হয় সত্যিই তার মাথা খারাপ হচ্ছে আর নয় তো ওরা সকলে মিলে ওর সংগে একটা বিশ্রী নিষ্ঠুর ঠাট্টা করছে। ও কিছুতেই বুঝতে পারল না যে সাভানিলার মতো একটি সুন্দরী যুবতী তাকে বিয়ে করবার কথা ভাবতে পারল কী করে—ওরা বিয়ে না করে এক বাড়িতে থাকলে যে প্রাণে কোনো বদনাম রটবে একথা সে বিশ্বাসই করতে পারল না। আচ্ছা, এত কি হতে পারে যে তাকে বিয়ে করাটা খুব অস্বাবহ বা ঘৃণ্য ব'লে সাভানিলা মনে করছে না? মনে যেন কী আশা হ'ল। তাকে দেখতে কেমন, ভালো করে দেখার জন্যে আয়নার কাছে গিয়ে ও একবার দাঁড়াল—সত্যিসত্যিই ও যতটা খারাপ দেখতে, তার চেয়েও ঢের বেশি কুৎসিৎ লাগল ওর নিজের চেহারাকে। চিরকাল রোগে ভুগে, আর ভাগ্যের লাঞ্ছনা ভোগ করে ওর মুখের রঙ রোগীদের মতো হলদে হয়ে গিয়েছে—মাথা ভর্তি টাক, চোখের দৃষ্টি অর্ধেক নেই। যাহোক, আনন্দে ভরপুর সাভানিলাকে নিজের পাশে কল্পনা করতেই তার মাথা ঘুরে গেল। সাভানিলা তাকে বিয়ে করবে? এও কি সম্ভব? ও আবার সাভানিলার কাছে ফিরে গেল। আমতা আমতা করে অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করল সত্যিসত্যিই সে ওকে বিয়ে করতে রাজী আছে কিনা। হতভম্ব হয়ে সে দেখল সাভানিলা একটুও লজ্জা না পেয়ে, দ্বিধা না করে জবাব দিল যে সে যে শুধু রাজীই আছে তা নয়—কসমো যদি তাকে বিয়ে করে তাহ'লে সে সারাজীবন তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

হাত তুলে সাভানিলার কথায় বাধা দিতে গেল কসমো—কিন্তু কোনো

। খেয়লো না তার মুখ দিয়ে, ছোট ছেলের মতো ঝর ঝর করে সে
সে কেঁদুল। একটু পরে সামলে নিয়ে সে বল্ল কৃতজ্ঞতায় কথা
ন সাভানিনা তাকে বলছে? উল্টে তারই বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত
দিন। আশ্য যে তার কাছে এত বড় সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল
তো সে জানতো না। এ-যে সত্যিসত্যিই অসম্ভব ব্যাপার—
রুকদিন ধরে প্রোফেসরের মুখ দিয়ে ভালো করে কোনো কথাই
হলো না।

সমস্ত বরবধূকে একই বাড়িতে থাকতে হচ্ছে—কাজে কাজেই বিয়েটা
তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। হেডমাস্টার মশাই এটাও আশা করছিলেন
। তাড়াতাড়ি বিয়েটা চুকে গেলেই তাঁর সহকারী পরীর রাজ্য ছেড়ে
পার মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে। কিন্তু তাঁর এ আশা বৃথাই
কে গেল, ১৮৯২ সালের ১৪ই মার্চ ওদের সিভিল বিবাহ হ'ল—কয়েক
ছর আগে প্রোফেসর ধর্ম সম্বন্ধে যে মত গ্রহণ করেছিল তার ফলে
র্জায় গিয়ে বিয়ে করতে সে রাজী হ'ল না।

য়ে করে প্রোফেসর খুবই সুখী হ'ল বটে কিন্তু তার বোকামির
াত্রা দিন দিন যেন আরো গেল বেড়ে। বছরের পর বছর দুঃখ ভোগে
। হয়নি, এই কদিনের সুখভোগের ফলে তাই হ'ল—কস্মো এতদিন
ত্র যা শিখেছিল এমন কি ল্যাটিন ব্যাকরণ পর্যন্ত ভুলে গিয়ে
শক্ষকতার সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ল। সাভানিনাকে ছাড়া আর
কছু সে জেগে বা ঘুমিয়ে বা স্বপ্নেও দেখতে পায় না। জোর করে
সাভানিনা খেতে না বল্লে সে খেতেও চায় না। তার আনন্দসুন্দর স্ত্রীকে
খাবার টেবিলে বসে থাকতে দেখলেই সে তৃপ্তবোধ করত, সাভানিনা
দি তার দেহকে তার সুন্দর ছোট ছোট দাঁত দিয়ে স্পর্শ করার
আশ্য মনে করত তাহ'লে সে নিজেকে সাভানিনার খাদ্য করে
রে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।

এদিকে বলকো মনকির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্কুলের ছেলেদের ব
বাজার ঢোঁড়াদের জমাও গেল ভেঙে। এবারে যা গোলমাল আরম্ভ হ'ল
তার সংগে আগের গোলমালের কোনো তুলনাই হয় না। হেডমাস্টার
মশাই খুব চটাপটি করলেন, সহকারীকে যতদূর সম্ভব বকাবকি করলেন
—কোনো ফল তো হ'লই না বরং প্রোফেসর কসমো এমন মধুর ভাবে
হেডমাস্টার মশাইয়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল যে মনে হ'ল ঘটনাটার
সংগে ওর নিজের কোনো সম্পর্কই নেই। সমস্ত ব্যাপার দেখে সাভানিনা
প্রতিপত্তিশীল বন্ধুটির কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য হ'ল। তাঁর ক্ষমতা আগের
চেয়েও এখন অনেকটা বেশি—সাভানিনা তাঁকে লিখল প্রোফেসরকে
এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এমন কোনো জায়গায় চাকরি দিতে যেখানে
এত গোলমাল নেই—যেমন সাধারণ কোনো পাঠাগার কিংবা শিক্ষা-
বিভাগের রাজমন্ত্রীর কোনো দপ্তর। এই চিঠির ফলে, প্রায় দু'মাস পর
কসমো মন্ত্রী-দপ্তরে দেখা করার আদেশ পেয়ে রোমের দিকে রওনা
হ'ল। দুষ্টুমি করলেও তার ছাত্ররা সত্যি সত্যি তাকে ভালোবাসত—
এই বিদায়ে তারা ব্যথিত হ'ল। হেডমাস্টার মশাই আর অন্য অন্য
শিক্ষকেরা কিন্তু ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
বাঁচল। সাভানিনার এই সময় সন্তান সম্ভাবনা—সমুদ্র পার হবার সময়
সে ভারি অসুস্থ হয়ে পড়ল। আসল ইটালিতে পা দেওয়ার আনন্দে,
রোমের এত কাছে আসার আনন্দে চিভিতাভেকিয়াতে জাহাজ থেকে
নেমে কিন্তু সে সব দুঃখ ভুলে গেল। তার বাবার নানাদেশ ঘুরে
বেড়ানোর ঝোঁক যে তারও রক্তে এত প্রবল এ অনুভব করে সাভানিনা
বিস্মিত বোধ করল।

শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর আপিসে যে কপি করার বিভাগ সেই
বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের পদে প্রোফেসরকে নিয়োগ করা হ'ল—
কিন্তু তত্ত্বাবধান প্রোফেসর বিশেষ কিছুই করতে পারলেন না। তিন-

মজুরি দিয়ে যে সব অঙ্ক বাইরের কেরানি লেখা হত তারা পিলপিলই তাদের মজুর মনিবকে চিনে নিত। যদি কোনো খিটখিটে বুড়ো, যার সম্বন্ধে নানারকম গুজব, তাদের কাজের তদারক করবার জন্যে নিযুক্ত হত তাহ'লে অবিশ্যি কথা ছিল না—সেলাম করত সবাই, খাতির করত। কিন্তু এই রকমের একটা গোবেচারা লোককে সম্মান দেখিয়ে লাভ কী? তারা যে খুব বেশি জ্বালাতন করত তা নয়, তবে কাজকর্ম যখন কম, তখন দু' একটা হালকা ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। আর একটা সুবিধে ছিল এই যে নকল করতে ভুল করলে দোষটা পড়ত প্রোফেসর কলম্বোর ঘাড়ে।

হয়তো কোনো সময় কলম্বো বললেন, 'শুনছেন আপনারা কে কী কপি করছেন আমায় একটু দেখান তো! এত গোলমাল করবেন না, আমার কথা শুনুন। শুনছেন, ও মশাই, আপনি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে বলছি, regions লেখবার সময় এবার থেকে দয়া করে একটা g লিখবেন, বুঝলেন?'

এর খুব মজার উত্তর দেওয়া চলে, 'অনেকগুলো থাকাই ভালো প্রোফেসর, দুটো 'g' দেওয়াই ভালো, reasonএর ব্যাপার কিনা!'

প্রোফেসর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়, 'তা বেশ, তা বেশ' আর অভ্যাস মতো গলাটাকে একবার লম্বা করে ঘাড়টা কুঁজো করে, অর্ধেক বন্ধ চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করে ফেলে। বোতলের তলার কাচ যেমন পুরু প্রোফেসরের চশমার কাচও তাই—চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চোখ দুটো ভালো দেখাই যায় না।

যারা কপি করে তারা যখন প্রোফেসরকে এইরকম করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে 'তা বেশ' বলতে শোনে তখন তারা আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। ওরা যে কেন এইরকম করে তা প্রোফেসর বুঝতে পারে না। কোনো কিছু গোলমাল হ'লেই 'তা বেশ, তা বেশ' এই কথা দুটো বলা তর

যেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কেরানিরা আজকাল ওকে 'প্রোফেসর ভাবেশ' ব'লে ডাকে। এই নতুন নামকরণটা যখন ওর কানে গেল ও তখন একটু হাসল, গলাটা একবার লম্বা করল, ঘাড়টাকে কুঁজো করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল···কোন সময় অজানতে ওই অভ্যাসটা তার হয়ে গেছে···নিষ্ঠুর ভাগ্যের কাছে ক্রমাগত মার খেয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গী এখন ওর দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এতদিনে, ওর সব দুঃখের বদলে ও শান্তি পেয়েছে, ভবিষ্যতেও যত দুঃখ আসবে সে তা হাসিমুখে সহ্য করে নেবে—ভাগ্য বিপর্যয়কে ও আর ভয় করে না। পৃথিবীর সমস্ত কেরানি হাসুক না দলবদ্ধ হয়ে, যা খুশি ব'লে ওকে ডাকুক—যতক্ষণ ওর সাতানিনা আছে ততক্ষণ তাদের উপেক্ষাকে ও-ও উপেক্ষা করবে। যতক্ষণ আপিসে বসে ও কাজ করে সব সময় ওর মনটা ঘুরে বেড়ায় সাতানিনার কাছে। আপিস থেকে ওদের বাড়ি অনেক দূরে হ'লেও, প্রোফেসর যেন পরিষ্কার দেখতে পায় তাদের ভিয়া সান নিকোলো দা তলেনতিনোর ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে সাতানিনা একমনে সংসারের কাজ করছে।

১৮৯৩ সালের ১৫ই অগাস্ট সাতানিনা নির্বিঘ্নে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করল, ছেলের নাম হ'ল দলফিনো। পিতৃত্বের গৌরবের আনন্দে বেচারা প্রোফেসর একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেল। সাতানিনা কিন্তু ছেলেকে দুধ দেবার মতো শক্তি পেল না, তাই দূরে আলবান পাহাড়ের তলায় একটি গ্রামে একজন ধাইমার কাছে ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিতে হ'ল। প্রোফেসর এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই জেনে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করল আর ধাইমার খরচ যোগানোর জন্য সিগার, কফি প্রভৃতি নিজের দু'একটি ছোটখাট শখ ছেড়ে দিল।

বাবা ভেলকি খেলা দেখার ভাবের কখনো লক্ষ্য করেছেন কি!

একের পর এক তারা খেলা দেখিয়ে চলে—আর চারদিকে জনতা ঘিরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হতবাক হয়ে দেখে সেই খেলা ? কিংবা হয়তো সার্কাসের মালিক যখন তার দলের কোনো এক খেলোয়াড়কে কোনো একটা শক্ত খেলা দেখাতে ব'লে চেঁচিয়ে সকলকে শোনায়, 'এই খেলাটা ভালো করে লক্ষ্য করুন আপনারা। এখন আমরা আগের চেয়েও শক্ত একটা খেলা দেখাচ্ছি। ভালো করে লক্ষ্য করুন সবাই।' খেয়াল করেছেন নিশ্চয় ? খেলোয়াড় সাধারণ ক্লাউন কসমো আল্কাসিভকে দিয়ে সার্কাস-মালিক ভাগ্যবিধাতা তার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত একের পর এক কত শক্ত খেলাই যে না খেলাল তার আর শেষ নেই। কিন্তু সব চেয়ে শক্ত খেলা তখনো ছিল বাকি—১৮৯৪ সালের ৩০শে মে কসমোর ডাক পড়ল সেই খেলায়।

রোজের মতো সেদিনও বিকেল সাড়ে ছ'টায় প্রোফেসর কসমো যথা সময়ে বাড়ি এসে পৌঁছল—সাভানিনা যে-মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, ফিরতি পথে তাই একবাক্স কিনে নিয়ে এসেছে বগলে পুরে। সিঁড়িগুলো আস্তে আস্তে উঠে, পকেট থেকে চাবি বার করে, চাবি লাগানোর ছিদ্রটা অনেক কষ্টে খুঁজে নিয়ে দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। কিন্তু ঘরে সাভানিনা নেই—কোথায় গেল সে ? এমন সময় সে তো কোনো দিন বাইরে বেরোয় না। খাবার ঘরের টেবিলে কোনো আয়োজন করা হয়নি, রান্নাঘরে রান্না হওয়ার কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না—নিশ্চয় কিছু হয়েছে তার! আগুন নিভে গেছে, সকালবেলা ঝি এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরদোর যেমন পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে ঠিক তেমনি আছে সব। কি হতে পারে সাভানিনার ? হয়তো দলাফিনোর বাইয়ার কাছ থেকে খুব জরুরি কোনো খবর এসেছিল! কিন্তু তাহলেও জানিয়ে তার কাছে কোনো খবর না পাঠিয়ে তার চলে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। লম্বা সিঁড়ি ভেঙে সে আবার নিচে গেল, বাড়ির

দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, পাশের বাড়ির তলায় যে ছোট দোকানটা আছে সেখানে খোঁজ নিল, পাশের ফ্ল্যাটের চাকরকে জেরা করল—কিন্তু কেউ কোনো খবরই দিতে পারল না। উপরে, তার নিজের ফ্ল্যাটে, তিনটি ঘর তাদের আসবাবপত্র নিয়ে এমন চুপচাপ—যেন তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে কখন আবার সেই সুখশান্তির জীবনযাত্রা শুরু হবে। পরিপাটি গুছান পরিবেশের সঙ্গে নিজের বিভ্রান্ত অবস্থার তুলনা করবো আর সহ্য করতে পারল না। সাত্তানিনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল—প্রথমে এদিক ওদিক ঘুরে দেখল খানিক তারপর টেলিগ্রাফ আপিসে গিয়ে দলফিনোর ধাইমার কাছে একটা রিপ্লাই-পেড টেলিগ্রাম করল। তারপর চরকির মতো একান্ত নিরুদ্দেশভাবে সারা শহরটা সে ঘুরে বেড়াল—রাত হয়ে গেল কত কিছু খেয়ালই রইল না। হঠাৎ তার হুঁশ হ'ল যে টেলিগ্রামের জবাব আসার সময় হয়েছে, তখন সে আবার বাড়ি ফিরে এল—মনে মনে এই আশা নিয়ে যে হয়তো সে বাড়িতে এসেই দেখতে পাবে সাত্তানিনাকে। কিন্তু দারোয়ানের প্রথম কথাতেই তার সে আশা ভাঙল। এতক্ষণে হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল যে সে বড় ক্লান্ত, এত ক্লান্ত যে আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে আর কিছুতেই পারবে না। কিন্তু তাও পারল। তারপর অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শোবার ঘরে ঢুকল। আলো জ্বালতে আর তার ইচ্ছে করল না—অনেক কষ্টে একটা ইজিচেয়ারে বসে সাত্তানিনার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে, কিসের যেন একটা আওয়াজ তাকে চঞ্চল করে তুলল—মনে হ'ল শব্দটা যেন তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে : মাথার ভিতর দিয়ে, পেটের মধ্যে দিয়ে, হাঁটুর ভিতর দিয়ে এমন কি পায়ের তলায় পর্যন্ত সেই শব্দ ; মনে হ'ল শব্দটা সবেগে তারই দিকে আসছে—সারা শরীর তার কাঁপতে লাগল, আবছা চিন্তা যেন সব ধুয়ে-মুছে

পড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আবছায়া অবস্থায় বসে রইল সে। তারপর টেলিগ্রাম নিয়ে পিওন বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কি না দেখবার জন্যে জানলার কাছে উঠে গেল। এখানে এসে সে দেখল যে শব্দটা আসছে নিচের রাস্তা থেকে—একটা ইলেকট্রিক লাইট খারাপ হয়ে গিয়ে ঐরকম বিশ্রী আওয়াজ করছে।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলকিশোর বাইবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল—মাতাজিমা সেখানে যায়নি। কলবোর শেষ আশাটুকু নিভে গেল।

কয়েক ঘণ্টা পরে ঝি এল রোজকার মতো বাজার আর ঘর দোর পরিষ্কার করে দিতে। টাতাজিনির মেয়ে, শক্ত সমর্থ, চটপটে বুদ্ধি, কড়া কথা বলতে মুখে বাধে না।

মনিবকে চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকতে দেখে সে ব'লে উঠল, 'খুব জোরেই আজ ঘুম ভেঙেছে বুঝি।'

'সে এখানে নেই,' কলবো জবাব দিল, 'কাল থেকে—এখানে আর নেই!'

'সত্যি? কী সর্বনাশ!' ঝি ব'লে উঠল।

প্রোফেসর কলবো একবার হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল, তারপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল চেয়ারে—ওর চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি সে হারিয়ে ফেলেছে।

'সারা রাত ফিরে আসেনি।' এই কথাটা শুধু তার মুখ দিয়ে বেরলো।

'কোন কোন জায়গায় তিনি যেতে পারেন, বলুন তো।' ঝি জিজ্ঞাসা করল।

জবাবে শুধু সে একটা হতাশার ভঙ্গী করল।

ঝি বলল, 'আমি বলি কী, নিচে···যাবে, একতলায় কয়েকজন···কী বলে, কয়েকজন বিদেশী থাকে, তাদের ওখানে একবার খোঁজ করে দেখুন। আমি জানি ওদের মধ্যে একজন···একজন তাঁর ছবি আঁকছিল।'

প্রোফেসর চমকে উঠল, তারপর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল,

'আমার স্ত্রী ? ছবি আঁকছিল ? কখন ?'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন সব ; কেন, রোজ সকালে চা খাওয়ার পর উনি তো ওখানেই যেতেন ?'

মুখটা হাঁ করে শির-বের-করা হাত আস্তে আস্তে পায়ের উপর বুলোতে বুলোতে সে চুপ করে বসে রইল।

ঝি বললে, 'আমি নিচে গিয়ে জেনে আসছি। বেশি দূরে নয় এই তো দু'পা। লোকটাকেও আমি চিনি—ছবি আঁকে, জাতে ফরাসী।'

এসব কথা তার কানে গেল কিনা কে জানে। ঝি নিজেই তাড়াতাড়ি নেমে গেল নিচে আর একটু পরেই ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। কোনোরকমে দম নিয়ে সে বললে, 'যা ভেবেছিলাম তাই। সেও কাল চলে গেছে…একই ভাবে…একই সময়ে…আশ্চর্য নয় ?'

চুপ করে বসেই রইল প্রোফেসর বসমো—তার মুখে ভাবের কোনো পরিবর্তন হ'ল না। মৃত মানুষের মতো তার দৃষ্টি। একমনে সে তার পায়ের উপর চাপড় দিতে থাকল। কিছুক্ষণ ঝিটা তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল, তারপর নিজের মনেই গৃহকর্ত্রী সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে, 'এমন বোকা কি আর দেখা যায়। এত ভালোবাসে তোকে তোর স্বামী, মুখ ফুটে একটি কথাও বলে না বেচারা, এখানে তো তার কাছে দিব্যি নিশ্চিন্তিতে থাকতে পারতিস, তা নয়…'এবারে মনিবের দিকে ফিরে বললে, 'কেন আপনি এত মন খারাপ করছেন, মন হালকা হয়ে ফেলুন, শান্তি পাবেন। ওরকম ভাবে চুপ করে থাকবেন না। ওর মতো বোকা একটা বদ বৈরোবাড়ুনের জন্যে ভেবে কী লাভ আছে বলুন! আর যদি ভালো-বাসার কথা বলেন, তাহ'লে আমি কী বলি জানেন ? উনুনে চাপানো দুধের কড়া দেখেছেন তো ? প্রথমে দুধটা ফুঁসে ওঠে, তারপর ফুটতে থাকে, তারপর উপচে পড়ে যায় চারদিক দিয়ে…ভালোবাসাও তাই,

হবেন। কী হবে দুঃখ করে? মুখে জল দিয়ে নিন। মন হালকা করবার চেষ্টা করুন। অমনভাবে চুপ করে বসে থাকবেন না।'

অনুভাবে যেটুকু কথাগুলো বললুম, উত্তরে কিন্তু প্রোফেসর কিছুই বললেন না—সে যে সব কথা শুনেছে সেটা শুধু তার ঘাড় নাড়া দেখে বোঝা গেল। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরলো না তার, অন্যের কাছে নিজের দুঃখ প্রকাশ করতে ইচ্ছেও হ'ল না একটু। নিজে সে কিছুতেই ভেঙে পড়বে না, কারো কাছে এতটুকু সমবেদনা বা সান্ত্বনা সে আশা করে না। অনেকদিন তার মনে হয়েছে যদি কোনো অজানিত কারণে মাতামিনা মারা যায়, কিংবা আর তাকে ভালো না বাসে তাহলে কী গভীর দুঃখই না সে পাবে—আজ মনের অন্তরতম প্রদেশে কিন্তু সেই দুঃখের কোনো সাড়াই সে পেল না। যা এতদিন মাঝে মাঝে তার কল্পনায় দেখা দিত, আজ তা সত্যি-সত্যিই ঘটল—কিন্তু আশ্চর্য, কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট, কিছুই সে বোধ করছে না। সে ভেবেছিল যে এরকম ঘটলে তার চারদিকে সমস্ত পৃথিবী ভেঙে পড়বে, অন্তত সে নিজে এই আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না—কিন্তু কিছুই তো তার হ'ল না, কিছু না। ঝিকে বাকি মাসের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে ও নিশ্চিন্তভাবে বিদায় দিল; সে বেচারা যাবার সময় যখন আরও গোটা কতক সান্ত্বনার কথা বলল, তখনো চিরকালের অভ্যাস মতো, যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে বলতে লাগল, 'তা বেশ, তা বেশ।'

ঝি চলে যাবার পর, একলা যখন সে ঘরটিতে এসে বসল, তখন হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে একটা আঙুল তোলবার মতো ইচ্ছাশক্তিও তার আর অবশিষ্ট নেই। তাহ'লে সত্যি সত্যিই তার চারদিকের পৃথিবী ধসে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু এত আস্তে হয়েছে ভাঙন—এত আস্তে, যে সে নিজেই বুঝতে পারেনি। ঘরগুলো সব ঠিকঠাক সাজানো...পোশাকের আলমারিটাও তাই...বিছানাটাও পাতা রয়েছে

ঠিক…কিন্তু ভবিষ্যতে কার কী কাজে লাগবে এগুলো ?…

দু'হাত দিয়ে সে তার পা দু'টো ঘষতে লাগল, ক্রমশ ক্রমশ আপনা থেকেই জোরে, আরও জোরে—তার মনে হ'ল যেন তার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—কী এক অদ্ভুত ধরনের ঠাণ্ডা হাড়ের ভিতর থেকে সমস্ত শরীরে যেন ছেয়ে যাচ্ছে। চেয়ার থেকে সে উঠতে পারল না, শুধু বসে বসে ঝি যে খবর দিয়ে গেল সেই কথাগুলো বিড়বিড় করে বকতে লাগল, 'ছবি আঁকা…ফরাসী…রোজ সকালে তার কাছে যেত।' ঠাণ্ডায় তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল—সে শুধু চুপ করে বসে আপনা থেকেই ক্রমশ আরও জোরে নিজের পা ঘষতে লাগল, কাঁপুনি কিন্তু কিছুতেই থামল না। শুধু তিনটি কথা গেঁথে গেল তার মনে—ছবি, ফরাসী-আর্টিস্ট, আর সে যে রোজ সকালে যেত তার কাছে সেই কথা। তিনটি কথা, কাগজের তিনটি হাওয়া-কলের মতো তার চোখের সামনে যেন অনবরত ঘুরতে আরম্ভ করল—আর সেই ঘূর্ণিপাকের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে ক্রমশ তার মাথাও আরম্ভ করল ঘুরতে। একবার ভয়ানক কাঁপুনির পর সে অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেল মাটিতে।

১৯০৪ সালের মার্চ—ন'বছর দু'মাস কেটে গেছে। প্রোফেসর [illegible]এর এখন আর মনেই পড়ে না, যে সার্কাস-মালিক ভাগ্যবিধাতা[illegible]র মতো সেই সবচেয়ে শক্ত খেলা খেলতে গিয়ে সে হাসপাতালে প্রায় মৃত্যুর দরজায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সাবিন পাহাড়ের তলায় ছোট্ট গ্রামটিতে থাকত যে তার ছোট্ট ছেলেটি—তার কথাই সেদিন তাকে বেঁচে থাকবার শক্তি দিয়েছিল। তার কাছেই এখন দলকিলো থাকে। চেহারায় বয়স দশ বছরেরও বেশি হ'ল কিন্তু দেখলেই মনে হয়, যে নেহাৎ বাপের অশেষ সেবা যত্নে অনেক কষ্টে সে বেঁচে আছে। এত রোগা আর দুর্বল সে, যে

স্কুলে পড়ার সময় তার বাবার যে অসুখ হবার উপক্রম হয়েছিল, তারও সেই অসুখ হবার সম্ভাবনা।

আটবছর বয়স পর্যন্ত বলকিসো জানত যে তার জন্মের পরেই তার মা মারা গেছেন। কিন্তু বছর দুয়েক আগে, একদিন যখন তার বাবা আপিসে, ফ্যাকাশে মুখে রঙ আর পাউডার মাখা বিশ্রী চেহারার একটি স্ত্রীলোক তাদের বাড়িতে এসে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তাকে বলে যে তার মা মারা যায়নি, বেঁচেই আছে—সেই তার মা, সত্যিই সে তার মা, তাকে ভয়ানক ভালোবাসে সে, তার কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত থাকতে চায়, এমনি করে তাকে বুকে জড়িয়ে লক্ষ্মী সোনা ব'লে আদর করতে চায়।

এই সময় বলকিসোর দাইমা এসে ঘরে ঢোকে। বিধবা হবার পর সে ঝোঁকে তার পালিত ছেলের কাছেই চলে আসে; এখন সে বলকিসোর দাই আর বাড়ির ঝিয়ের কাজ করে। সকালে বাজার থেকে ফিরে এসেই ছেলেকে ঐ চরিত্রহীনার কোলে দেখে সে ছুটে এক ঝটকায় তাকে ছিনিয়ে নিল। বলকিসো বেচারা ভয়ে জড়সড় হয়ে শুনল যে তার মা বলে পরিচয় দিয়ে যে মেয়েমানুষটি এসেছিল তাকে তার দাই মা মুখে আসে তাই ব'লে গাল দিচ্ছে। দুজন স্ত্রীলোকে শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি, বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটল—আর এই উত্তেজনার ফলে বলকিসোর বেশ কয়েকদিন জীবন জ্বরে ভুগতে হ'ল।

কনসো আন্তনিও থানায় গিয়ে ডায়েরি করে এল যে ঐ সর্বনেশে মেয়েমানুষটা তার যথেষ্ট ক্ষতি করেও খুশি নয়; এখন আবার ছেলেটার সর্বনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

অনেক দিন আগে, ওদের বিয়ে হবারও আগে মার্তানিনা যে বলেছিল যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব—সেই অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়ানর শখও তার অনেকদিনের। যে ফরাসী আর্টিস্ট তার ছবি এঁকেছিল তার সঙ্গে

পালিয়ে গিয়ে সে প্যারিসে বছর চারেক ছিল, তারপর অবনতির ধাপে ধাপে নামতে নামতে সে নীস, ডুবলিন, মিলান, অনেক শহরেই ঘুরে বেড়িয়েছে। রোমে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই সে তার স্বামীর চোখে পড়ে যায়। সান্তাসিনা যে অধঃপাতের চরমে নেমেছে এ কথাই কসমো ভেবে রেখেছিল তবু নিজের চোখে তাকে দেখে ও জ্ঞান হারাল। পথের লোকজন ধরাধরি করে তাকে ডাক্তারের দোকানে নিয়ে যেতে তবে ওর আবার জ্ঞান ফিরে আসে।

সাসারিতে থাকার সময় দম্ দেলাফিয়রা প্যাস্থু নামে সার্ডিনিয়ার এক পুরোহিতের সংগে তার আলাপ হয়েছিল—রোমে সে তার প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল—বহুকাল পূর্বে কসমো পুরোহিত হতে হতে নাস্তিক হয়ে পড়েছিল—এতদিন পরে তার মধ্যে আবার ধর্মভাব জাগিয়ে তোলার জন্যে দম্ প্যাস্থুর চেষ্টার আর শেষ ছিল না। আপিসে কোনো কাজ না থাকার দরুন যখন প্রোফেসর ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন সময় কাটানর জন্যে একটার পর একটা ধর্ম সম্বন্ধীয় বই দম্ প্যাস্থু ওকে পড়তে দিত। তার যৌবনে সে যে এত কষ্ট পেয়েছিল সে যে শুধু তার মাতৃ স্বরূপ পবিত্র ধর্মের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল ব'লেই—এ কথা পুরোহিতের তর্কে প্রোফেসর মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণে ভগবান তাঁর সেবকদের আর সাধু মহাত্মাদের দলে দলফিনোর মতো সুন্দর ছেলেকেও টেনে নিতে চাইছেন। এ শুধু তাঁর পবিত্র সাবধানবাণী—অবিশ্বাসী প্রোফেসর কসমো পৃথিবীতে যখন একা হয়ে পড়বে তখন সব ছেড়েছুড়ে গিয়ে সে যেন কোনো মঠে শ্রমণের জীবন যাপন করে, তাঁর নিশ্চয় তাই ইচ্ছে। টুস্কানে-তে একটা শ্রমণের মঠ আছে—ভারি সুন্দর জায়গা, ভগবানের আশীর্বাদ যেন সেখানে ঝরে পড়ছে। অনুতাপ করার সত্যিই উপযোগী জায়গা—কসমো সেখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবে।

১৯০৪ সালের ৫ই মার্চ ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে সেজুতো গ্রামে সাজানো-গুছনো ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে এসে উঠল।

(২)

এক মাস নিশ্চিন্ত মনে ছুটি উপভোগ করবার মতো জায়গা বটে। আগের দিন পর্যন্ত এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু এখন পরিষ্কার আকাশ ঝকঝক করছে রোদ্দুরে, হাওয়া দিচ্ছে মৃদু মৃদু—বসন্ত যে এসে পড়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

আর সত্যি সত্যিই রোম ছাড়ার একটু পরেই গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রোফেসর অনুভব করল—সবুজ মাঠের মধ্যে একটার পর একটা লাল ফুলের রূপ ধরে বসন্ত যেন তার সামনে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলছে। কী ফুল? বোধ হয় ফুল ধরেছে পীচ গাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো একটা—ওই আর একটা—ওই যে আরো আরো অনেকগুলো। এতদিনে সত্যিসত্যিই তাহ'লে বসন্ত এসেছে! পীচ গাছগুলো রক্তিম আনন্দমুখর, বসন্তের আবির্ভাবে!...ওঃ, কত দিন পরে সে আজ লক্ষ্য করছে এসব।

গভীর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সে—মাঠের খোলা মিষ্টি হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার অভিনব অনুভূতি ওকে যেন মাতাল করে তুলল। তার মনে হ'ল, নিষ্ঠুর ভাগ্য তার উপর কিছুটা দয়া [illegible] বলেই এই অপরূপ দৃশ্য তার চোখের সামনে মেলে ধরেছে। এক অচিন্তনীয় আনন্দে ওর বুক ভরে উঠল—বর্তমানের এই দুশ্চিন্তা ঝিলমিল দূরে রেখে কোন অজানা পথ বেয়ে ও সেই বহুদিন আগেকার ছেলেবেলায় ওর নিজের গ্রামে ফিরে গেল। তখনকার মতো তার অতীতের, বর্তমানের সব দুর্ভাগ্যের কথা গেল ভুলে—তার ছেলের এই মারাত্মক অসুখ, তার মাথা কলঙ্কিত করছে যে চরিত্রহীনা স্ত্রী তাকে, যে পুরোহিত তাকে

এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না তাকেও ভুলল। বলকিনো শিশুর বাঁচবে না, তবু তার আরোগ্যের জন্যে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় যে সে করছে, তার যে এই দুঃসহ দুশ্চিন্তা অস্থির, জীবনের এই দুর্বহ বোঝা—কিছুই আর তার মনে রইল না। অন্তরে তার সব অন্ধকার বটে, কিন্তু বাইরে তো এই সবুজ মাঠ, নীল আকাশ, বাতাসের মৃদু সজীবতা, বসন্তের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। মুগ্ধ হয়ে কতক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

সত্যিই, মধুর হতে পারত জীবন, কিন্তু আর কোথাও নয়, এই খোলা মাঠের সবুজের মধ্যে। শহরের সরু গলির মধ্যে ভাগ্যের হিংস্রতা যত প্রখর, এখানে এই মাঠের মধ্যে তা নিশ্চয়ই হতে পারে না। ভাগ্যের নির্যাতনের একটা মূর্তি ও মনে মনে তৈরি করেছিল, তার মনে হত সেই মূর্তি সব সময় তার পিছনে পিছনে আসছে। বিরাট বীভৎস সেই মূর্তি—সোজা হয়ে দাঁড়াবার অবকাশ তাকে দেয় না, সব সময় মাথা নিচু করে চলতে হয় তার আক্রমণের ভয়ে। এই বীভৎস মূর্তিটি তার স্ত্রীর।

এই সুন্দর দৃশ্যকে রুদ্ধ করে দিয়ে আবার তার স্ত্রীর মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—সে তাড়াতাড়ি সেই ছবি মন থেকে দিলে দূর করে। এখন আবার সে বাইরের জগৎকে দেখতে পাচ্ছে—ওই দূরে দেখা যায় আসমান পাহাড়ের দল। কেউ যেন উপর দিকে ওদের তুলে ধরে আছে—এত হালকা দেখাচ্ছে ওদের, ওরা যে নিরেট পাথরের তৈরি তা মনেই হয় না। ওই যে খুব কাছে, চূড়ায় রোদ আর নীচের মাথা পরে বসে আছে, হালকা বনের মাঝে আছে পুরোনো আশ্রমটি। আর ওই আরো দূরে ঝর্ণাটি—সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। ট্রেনের পাশে এক ঝাঁক চড়ুই পাখি উড়ে গেল—ওদের মাথার উপরে, অনেক উঁচুতে চিকচিকে পাখার ভর দিয়ে একটা চিল। চিলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

এতদিন পরে ল্যাটিন ব্যাকরণের প্রথম কথাটি প্রোফেসরের মনে পড়ল—উঃ কতদিন আগে ও ব্যাকরণ শেখাতো—সেই যে : হ্যাঁ তাই তো। এখন যেন মনে হচ্ছে তার সেই স্কুলমাস্টার-জীবনের প্রথম কটা বছরও বেশ ভালোই কেটেছিল। সব সুখ ভাঙল যেদিন থেকে সে একই বাড়িতে দিন কাটাতে আরম্ভ করল ওই—

প্রোফেসরের মন আবার খারাপ হয়ে গেল, বিড়বিড় করে সে বলল, 'তা বেশ।'

এরকম মনের অবস্থা অবিশ্যি তার আর বেশিক্ষণ রইল না—কয়েকটা স্টেশন পার হবার পর সে বুঝতে পারল যে সমুদ্র আসতে আর বেশি দেরি নেই। ছেলেমানুষের মতো ওর মন খুশি হয়ে উঠল। ব্যগ্র হৃদয়ে সে অপেক্ষা করে রইল—যে কোনো মুহূর্তে সেই বিরাট নীলের সৌন্দর্য তার চোখের সামনে দেখা দেবে। সমুদ্র, সমুদ্রকে সে এত ভালোবাসে—কত বছর আগে সে সমুদ্র দেখেছিল শেষবার, আর একবার দেখার কী আকুল আগ্রহই না ছিল তার মনে। ওই তো! ওই তো দেখা যায়! প্রোফেসর এত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল যে দাঁড়িয়ে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অসীম আগ্রহে আর আনন্দে সে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে লাগল। একটু পরেই তার মাথা ঘুরে উঠল, বসে পড়ে সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্যে আনৎসিও নামে একটা [illegible] শহরে থামল—এ শহরে প্রোফেসর কখনো আসেনি। স্টেশন থেকে শহরের যতটুকু দেখা যায়, ট্রেন থেমে থাকার সময়টুকু ও তাই দেখে কাটাল। একটু পরেই গাড়ি থামল নেত্তুনোতে—প্রথম সমুদ্র দেখে প্রাণভরে যে নিঃশ্বাস নিয়েছিল, সেই নিঃশ্বাসের ঘোরে তখনো সে আচ্ছন্ন—এত গভীর নিঃশ্বাস অনেক দিন সে নেয়নি।

আপিসের কেরানিরা এই ছোট্ট শহরটা সম্বন্ধে ওকে অনেক খবর

গিয়েছিল। শহরের সবচেয়ে বড় বাজারে গিয়ে সে খোঁজ নিল কোথায় সমুদ্রের ধারে কম ভাড়ায় ছোট্ট ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে। বাজারের তলায় ডান দিকে ছোট্ট একটি বাড়ি, একেবারে সমুদ্রের উপরে, ভাড়া ওর পক্ষে বেশি হ'লেও কোনো রকমে চালিয়ে নিতে হবে —প্রোফেসর এই বাড়িটিই নেবে ঠিক করল। বাজারটা বাড়িটির পিছন দিকে পড়ল, এদিকে সামনেই টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্য যে সব সেপাইরা দলে দলে আসে তাদের ব্যারাক-বাড়ি। এদিককার ঘরের জানলাটা প্রায় মাটির সংগে লাগা, ওদিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকের ঘরের জানলাটা কিন্তু প্রায় দোতলা সমান উঁচু। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্র যেন ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়বে, মাঝখানকার বেলাভূমি মোটেই চোখে পড়ে না। প্রোফেসর বাড়িওয়ালিকে ভাড়া জমা দিয়ে বলল যে সে কাল থেকে এসে থাকবে, তারপর বেড়াতে বেরলো সমুদ্রতীরে।

তার বাড়ির পশ্চিম দিকেই শহরের বহু পুরোনো ষোড়শ শতাব্দীর বিরাট দুর্গ। বয়সের সংগে সংগে দেয়ালগুলো কালো হয়ে গেছে— সমুদ্রের ধার থেকে দেয়ালগুলো গাঁথা। দুর্গের তলায় সমুদ্রের ঢেউ যেখানে এসে ভেঙে পড়ছে, ও সেখানে পাঁচিলের উপর ঘণ্টাখানেক অপূর্ব আনন্দ উপভোগে কাটিয়ে দিল। দূরে বহে চিরচেনোর দেখা যায় পাহাড়ের আভাস—মনে হয় যেন নীল সমুদ্রের মধ্য থেকে স্বর্গের মনোরম একটা দ্বীপ উঠেছে। আরো দূরে সমুদ্রতীরের দিকে তাকালে দেখা যায় অপর দুর্গ। ডানদিকে একটু তফাতে জাহাজের জেটি, কয়লার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আনংগিত বন্দর, তার পরে অবাধ অশেষ জল সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে—এত শান্ত যে একটা ছোট্ট ঢেউ পর্যন্ত তীরে এসে ভেঙে পড়ছে না। অনেক কষ্টে সে এই অপরূপ দৃশ্য থেকে নিজেকে টেনে এনে অল্প কিছু খেয়ে নিল।

বিকেল পাঁচটার আগে রোমে ফিরে যাবার আর গাড়ি নেই ; বাসের এই ঘণ্টা তিনেক সময় কাটানোর জন্যে আনতসিও আর নেত্তুনোর মাঝামাঝি বর্গেস-এ যে সুন্দর পার্ক আছে—সেইখানে যাবে ঠিক করল।

একদিকে সবুজ বন আর মাঠ, অন্যদিকে পাহাড়ের তলায় সমুদ্র—সোনা মাখা বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে ভারি সুখী মনে হ'ল কস্তুরোর ; মনে হ'ল এত সুখী জীবনে আর কখনো সে হয়নি। পার্কে ঢোকবার দরজা খোলাই ছিল, আত্মহারা হয়ে সে ভিতরে ঢুকে একটা চড়াই রাস্তা ধরে উপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ শুনতে পেল পেছনে কে চেঁচাচ্ছে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। এখানে ঢুকতে গেলে টিকিট কিনতে হয় ; দাঁড়ান, টিকিটের দাম দিন, পাঁচ সলদি।'

পিছন ফিরে সে দেখল একটি বামন তার দিকে দৌড়ে আসছে। সে স্ত্রীলোক, এই পার্কের দরজায় পাহারায় থাকে। তার ইচ্ছে ছিল বাজে খরচ মোটেই করবে না, কিন্তু এই পাঁচ সলদি খুশি মনেই সে দিল। তারপর বনের ছায়া ঘেরা সুড়ঙ্গের মতো নির্জন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল একা একা। তার মনে হ'ল যেন সে এখানে এসেছে স্বপ্নে। বড় বড় সুন্দর গাছগুলোকে তার মনে হ'ল যেন কোনো স্বপ্নজগতের— তারা মৌন, তারা ধ্যানমগ্ন। পাখির গানে যেন এই নীরবতা নষ্ট হচ্ছে না, বরং অস্পষ্ট স্বপ্নের রেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অনেকে তাকে বলেছিল যে পার্কের যে সব জায়গায় লোক চলাচল কম, সেই সব জায়গায় গেলে নাইটিংগেলের দেখা মেলে ; এখন তার মনে হ'ল যেন অনেক দূরে একটা নাইটিংগেলের কণ্ঠ সে শুনতে পাচ্ছে। সেই শব্দের অনুসরণ করতে করতে অনেকখানি চলার পর ভারি সুন্দর এক পাইন বনের মধ্যে ও এসে পড়ল। গাছগুলোর লম্বা সোজা গুঁড়িগুলো যেন মস্ত বড় এক উপাসনা গৃহের সারি সারি থাম ব'লে মনে হচ্ছে ; অনেক উঁচুতে গাছের

পাতায় পাতায় এমন ঘনভাবে ছেয়ে গেছে যে নিচে থেকে আকাশের একটুও দেখা যাচ্ছে না। অপরূপ নিজস্ব একটি আবহাওয়া ঘিরে পাইন গাছগুলোকে—পিঁপড়েগুলোর ভিতরে যেমন অদ্ভুত তাদের এক-রকমের গন্ধ পাওয়া যায় এখানেও আভাস সেই গন্ধের।

আর হাঁটতে পারছে না প্রোফেসর। মাথা থেকে টুপিটা খুলে সে প্রথমে বসল তারপর শুয়ে পড়ে আরম্ভ করল ভাবতে।

বহু বছর ধরে একের পর এক বিরাট দুর্ভাগ্যের বোঝা তার মনের চারপাশে অন্তহীন দুঃখের একটা ঘন আবরণ তৈরি করেছিল। দৈনন্দিন জীবনের দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে তার মন সাংসারিক চিন্তার বাইরে বেরুতে পারেনি। সেই ছেলেবেলায় তার মন সাধনার ডাকে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু তারপরই সে গেল পাগল হয়ে, ধর্মবিশ্বাস তার একেবারে খসে পড়ল। আজ যেন তার ভাগ্যের সংগে হয়েছে সাময়িক সন্ধি—জীবন যে সত্যিসত্যিই উপভোগ্য এই পরম সত্যের অস্পষ্ট আভাস আজ সে পাচ্ছে। অস্পষ্টভাবেই সে সত্যকে দেখতে পাচ্ছে, কারণ তা না হ'লে, এতদিন যে দুর্বিষহ চিন্তায় ও নিপীড়িত ছিল, সেই চিন্তার থেকে আলোর সন্ধানে এখনো সে বোকার মতো ছুটে আসবে কেন? জীবনে সে কখনো জ্ঞাতসারে কারো কোনো ক্ষতি করেনি বরং উল্টে তার সাধ্যমত লোকের উপকারই করে এসেছে—তবু ভাগ্য তার তূণ খালি করে সমস্ত শর একলা তাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে মারছে কেন, এই কথাই সে ভাবতে লাগল। পুরোহিত হবার বাসনা ত্যাগ করে সে ঠিকই করেছিল—পুরোহিত-মণ্ডলীর মতের সংগে তার বিচারশক্তির কোথাও কিছু মেলে না। বাপ-মা-মরা অনাথ মেয়েটাকে বিয়ে করে আশ্রয় দিয়ে সে তো কিছু অন্যায় করেনি—আর মেয়েটার ইচ্ছামতোই তো সে তাকে বিয়ে করেছিল, সে তো খোলা মনে কোনরকম সন্দেহের অবকাশ না রেখে বিয়ে না করেই তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল।

সেই স্ত্রীই তার সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা করে তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল—তার সমস্তটা জীবন দিল নষ্ট করে। আর এখন? এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে তার একমাত্র সান্ত্বনা—খুব সামান্য হলেও—সান্ত্বনা এটুকুই যে তার ছেলেকে চোখের সামনে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবার সাক্ষী হয়ে তাকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। কেন? এই বিপর্যয় মানুষের জীবনে আসে কোথা থেকে? ভগবানের দান? না, ভগবানের কখনো এরকম ইচ্ছে হতে পারে না। যদি ভগবান থাকেন তাহ'লে তিনি অন্তত পৃথিবীর ভালো লোকদের প্রতি দয়াই করবেন। না, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মানে তাঁকে অপমান করা। তিনি নেই। তাহ'লে, তাহ'লে কে? পৃথিবীকে শাসন করছে কে? কার হাতের মুঠোয় দুর্ভাগা লোকদের জীবন?

একটা পাইন্ ফল···সত্যিই কি? একটা পাইন ফল? হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই একটা বড় পাইন ফল এই সময় গাছের ডাল থেকে খসে প্রোফেসরের মাথার উপরে পড়ে তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল।

বাজ পড়লে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় বেচারা প্রোফেসর তেমনি নিঃসাড় পড়ে রইল। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখল যে রক্তে সমস্ত জায়গাটা একেবারে ভেসে গেছে। মাথার উপর থেকে কানের পাশ পর্যন্ত লম্বা একটা ক্ষত থেকে তখনো রক্ত পড়ছে প্রচুর। দুর্বল দেহটাকে অনেক কষ্টে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে পার্কের গেটে এসে পৌঁছল। গেটের পাহারায় যে বেঁটে স্ত্রীলোকটি থাকে, সে তার রক্তাক্ত মুখ আর মাথা দেখে চিৎকার করে উঠল: 'পাঁত! কী হ'ল তোমার? এত রক্ত কিসের?'

সে তার কম্পিত হাতটি একবার তুলল, ব্যথায় বা আনন্দের হাসিতে মুখটা একটু বাঁকাল, তারপর আমতা আমতা করে জবাব দিল, 'সেই···সেই পাইন ফল···যে, পাইন ফল যারা পৃথিবীকে শাসন করে···

সেই, সেই আমার এই দশা করেছে।'

স্ত্রীলোকটি ভাবল যে লোকটা একেবারে পাগল। পাশের ডেয়ারি থেকে একজন গোয়ালাকে ডাকতে সে ছুটল—পার্কের পাশেই রেল লাইনে যে মজুররা কাজ করছে তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দুজনে মিলে আহত লোকটিকে কাছেই [illegible] হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালে প্রোফেসরের মাথাটা প্রথমে কামিয়ে দেওয়া হ'ল, তারপর পাঁচটা বড় বড় সেলাই দিয়ে কাটা জোড়া হ'ল ক্ষতে ; সব শেষে লাগান হ'ল ব্যান্ডেজ। প্রোফেসরের একটু তাড়া ছিল, পাছে ট্রেন ফেল হয়। রোগীকে এখুনি ট্রেনে যেতে হবে শুনে ডাক্তার ঠিক করলেন মাথাটা সম্বন্ধে আরো ভালো ব্যবস্থা তিনি পরের দিন করবেন—আজ তাড়াতাড়ি তার মাথায় পাগড়ির মতো করে একটা কাপড় জড়িয়ে দিলেন। সব যখন হয়ে গেল, তখন টুপিটা মাথায় দিতে না পেরে হাতে নিয়ে কসমো আমুনিও ঘাড়টাকে কুঁজো করে, আস্তে আস্তে গলাটা লম্বা করার চেষ্টা করে, চোখ দুটো অর্ধেক বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, 'তা বেশ।'

(৩)

'প্রিয় বসন্ত,

মানুষ তাদের পত্রিকায় তোমার আসার দিন নির্দেশ করে দিয়েছে। এ বছর তুমি যে তার আগেই কেন এসেছ, তা আমি বুঝতে পারছি না। এ বছর খুব জোর শীত পড়েনি, চলে যাওয়ার আগে পৃথিবীর কিছু ক্ষতি সে করে যেতে চায় ; সে অধিকারও তার আছে। দু'একটা ছোট-খাট কাজ নিয়ে সে এখন একটু ব্যস্ত। সে চায় যতক্ষণ না এই বরফ-জলের বোঝা সে ঝেড়ে ফেলতে পারছে, অন্তত ততক্ষণ তুমি একটু সরে দাঁড়াও। তার এই অনুরোধ হয়তো তোমার মনে দাগ লাগতে

পারে। তাই সে এত বলছে, তুমি যখন শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, বিজয়ীর মতো প্রবেশ করবে তখন পথঘাট ভিজে থাকলে তোমার ছোট লাল পা দুটি কাদায় মাখামাখি হয়ে যেতে পারে। বয়স হয়ে গেলেও শীত এখনো বুড়ো হয়নি, তাই সে তোমাকে বলছে যে তার যৌবনের তেজটা বের করে দেবার সময়টুকু তুমি অন্তত দাও। সে শপথ করে বলছে যে হাওয়া থেকে সব হিম সে শুষে নিয়ে যাবে, পথ ঘাট সে নিজেই ঢেকেছে কাদায়, নিজেই দিয়ে যাবে সব সাফ করে। যদি তুমি তার ইচ্ছা পূরণ কর তাহ'লে শুধু যে সে-ই খুশি হবে তা নয়, আমিও হব না কম খুশি। প্রসংগক্রমে তোমাকে বলি একটি খুব ভালো লোককে তার জন্ম থেকেই আমি খুব যত্নের সংগে দেখাশুনো করছি। তাকে কষ্ট দিয়ে কী আনন্দ যে আমি পাচ্ছি তা তোমায় কী বলবো। এই তো কাল সে একটা খুব সুন্দর পার্কে পাইন বনের তলায় শুয়ে শুয়ে তোমার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। মজা করবার জন্যে আমি তার মাথায় একটা সুন্দর, বড়, শক্ত, পাইন ফল ফেলে দিলাম। তাতেই লোকটা মরে যেতে পারত কিন্তু, উঁহু, মেরে তো আমি ফেলব না। তুমি তো জান ভাই, আমার পতাকায় কী চিহ্ন আঁকা আছে। একটা বেড়াল একটা ইঁদুরকে না মেরে ফেলে তাকে নিয়ে খেলা করছে'...

অনেকদিন আগে একটা পুরনো বইয়ে এই রকম যেন কী একটা পড়েছিল—সেই ছাঁচে কসানো আজকেও বেশ ভালো একটা বক্তৃতা লিখে ফেলল। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা যে তার প্রতি কী দুঃসহ সেইটে দেখাবার জন্যে ওর লেখার এই প্রচেষ্টা, গেল পনেরো দিন ধরে সে নিজের মনের ভিতর কথাগুলো আলোচনা করছিল; তার স্থির বিশ্বাস যে তার ভাগ্যনিয়ন্তা বসন্ত দেবতার কাছে ঠিক এই ধরণেরই আবেদন জানিয়েছিলেন এবং দেবতাও প্রসন্ন মনে তথাস্তু ব'লে তাকে কৃতকার্য করে

ছিলেন। মাথায় অবশ্য পাগড়ি এঁটে প্রোফেসর নবকিশোর বিছানার পাশে বসে ছিলেন। সেন্ত ভুনো স্টেশনে নামবার পর থেকেই জ্বর আর আসে, এখনও সে জ্বর ছাড়েনি; জোয়া একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। রোদে থাকার সময় জ্বর আসত শুধু রাত্রে।

কিন্তু এই হাওয়া, এই হাওয়া, এই হাওয়া! গেল পনেরো দিন ধরে দিনে রাত্রে এক মুহূর্তের জন্যেও হাওয়ার বেগ কমেনি একটুও। সারাপথের সবগুলো পর্দায় সুর কাঁপিয়ে শিস দিয়েছে, চিৎকার করেছে, করেছে গর্জন। এক এক সময় এমন এক একটা দমকা এসেছে যে মনে হয়েছে বাড়িঘর বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে সব। বাড়িঘর ওড়াবার মতো ক্ষমতা হয় নি—শুধু কোথাও কোথাও উড়িয়েছে কয়েকটা টালি, টেলিগ্রাফের থাম ভেঙেছে কয়েকটা, শিকড়সুদ্ধ উপড়িয়ে ফেলেছে কয়েকটা গাছ। সমুদ্রে আর-এক খেলা খেলে—বড় বড় ঢেউ তুলে ওদের ছোট্টো বাড়িটার দেয়ালে প্রচণ্ড আওয়াজ করে ভারি তার ফুর্তি। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে জাহাজ থাকলে যে অবস্থা হয় প্রোফেসরের অবস্থা সেই রকম। নবকিশোর বেচারা অসম্ভব ভয় পেয়ে গেছে—তার বাবা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। ঢেউয়ের শব্দ তত বেশি কিছু নয় কিন্তু ঐ ভীষণ হাওয়ার গর্জন—ওর মনে হচ্ছে ওকে জোর করে ওর কথা বলার ক্ষমতা, এমন কি ওর নিঃশ্বাস ফেলার শক্তি পর্যন্ত যেন ঐ বাতাসের গর্জন কেড়ে নিচ্ছে। নৈরাশ্যের অতল নীরবতায় প্রাণ যখন প্রায় হাঁফিয়ে ওঠে তখন মাঝে মাঝে বাইয়ের গলায় ওষুধ দেবার জন্যে প্রোফেসর এক একবার উঠে যান—ওদের দুর্ভাগ্যের বোঝা আরো ভারি করবার প্রচেষ্টায় মার্সেলের গলায় অসুখ করেছে—সেও শুয়ে আছে বিছানায়।

কার্বলিক এসিডের বোতল এক হাতে, অন্য হাতে গলায় পেন্ট করার ব্রাশ দেখলেই বাই ঝাঁৎকে উঠে বলে—'সাবধান হয়ে লাগাবেন কিন্তু,

বেশি জাগাবেন না যেন।'

বিছানার উপর উঠে বসে সে হাঁ করে—গলার ভিতরটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। বেশি দেবার ইচ্ছে না থাকলেও জানালার বাতাসের শব্দ প্রোফেসরের হাতটা কাঁপিয়ে দেয় আর তার ফলে চারদিকে খানিকটা ওষুধ ছড়িয়ে পড়ে—বহুভাগ্য বাইরের যে চোখে এক ফোঁটা পড়ে চোখটা কানা হয়ে যায় না।

'এবারে থুথু ফেল, থুথু ফেলে দাও।' বলতে বলতে সে দলফিনোর কাছে ফিরে আসে—চোখ দুটো ওর হিংস্রভাবে জ্বলতে থাকে। কার্বলিক এসিড···বিষ···না, খুব কম, তাছাড়া জোরালোও নয়···ওতে যে কাজ হবে তা মনে হয় না···তাছাড়া দলফিনোকে এই অবস্থায় ও কী করে ছেড়ে যাবে। আঃ, যদিও খুব লোভ হচ্ছে তবুও এখন সে কিছুতেই পারবে না···ওঃ, এই বাতাসই ওকে পাগল করে তুলবে।

'সমুদ্রের ধারে ছুটি উপভোগ!' নিজের মনে বিড়্ বিড়্ করে সে বলল, একমাস ছুটির অর্ধেকটা তো কেটে গেল কিন্তু লাভ হ'ল কী? দু' জায়গায় বাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে, বিদেশে এসে বাড়ির সুখ পাওয়া যাচ্ছে না কিছুই, ঝিয়ের অসুখ, দলফিনোর অসুখ গেছে বেড়ে। শুধু তাই নয়, তাকে একলা তিনজনের সব কাজ করতে হচ্ছে, ঘরে ঘরে ধরাতে হচ্ছে আগুন, যেতে হচ্ছে বাজারে, তৈরি করতে হচ্ছে খাবার। এক মিনিটের জন্যেও ছেলেকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যেতে পারেনি, এই তিনটে ঘরের মধ্যে সমুদ্র আর বাতাসের অত্যাচারে নিজেও বন্দী হয়ে বসে আছে···অসহ্য, অসহ্য, ভাবতেও কান্না পায়।

দরজায় আস্তে আস্তে কে টোকা দিচ্ছে না?

'কে?' প্রোফেসর দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। ঝড়ের একটা ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল সাভাস্তিনা—সে মনস্থির করে এসেছে, মায়ের কর্তব্য সে করবেই। তার রোগা ছেলেকে সে একবার দেখবেই।

উস্‌কোখুস্‌কো চুলে দৌড়ে এসে সে প্রোফেসরের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হতভম্ব হয়ে পেছিয়ে গেল প্রোফেসর। ভয় কাতরা স্বরে সাতানিনা ব'লে উঠল, 'কস্‌মো! কস্‌মো! দোহাই তোমার! একবার নলকিনোর সংগে আমাকে দেখা করতে দাও, কস্‌মো। আমাকে ক্ষমা কর, উদ্ধার কর, আমাকে দয়া কর।'

তারপর তার চোখে নেমে এল কান্নার বন্যা—গড়িয়ে পড়ল চোখের জল। মনে হ'ল এ-কান্না ওর আর কিছুতেই থামবে না। কান্নার দমকে ওর সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মাটি ছেড়ে উঠতে কিছুতেই সে রাজী হ'ল না, দু'হাতে মুখ ঢেকে জানাতে লাগল তার আবেদন, 'কস্‌মো তুমি দেবতা, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে উদ্ধার কর। আর তো দিন কাটে না আমার। এর পরে আমার নলকিনোকে ছাড়া আর-কিছু আমি চাই না। আমি তোমার সব কাজ করে দেব, আমি ওর সেবা করব, তোমার পায়ে পড়ি কস্‌মো—'

একটা চেয়ারে বসে পড়ে দু'হাতে প্রোফেসর মুখ ঢাকল। মুখঢাকার কোনো দরকারই ছিল না, এতক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজলো। উচ্চস্বরে নাম´ আভে মারিয়ার স্তোত্র পাঠ করতে লাগল—এ-স্তোত্র কানে গেলেই তার মনিব সাতানিনার প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারবে, এই তার আশা।

পিছনের ঘর থেকে নলকিনোর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাড়িতে কি যে হচ্ছে বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে সে ডাকছে, 'বাবা, বাবা!'

ছেলের ডাক শুনে সাতানিনা লাফিয়ে উঠল, প্রোফেসরের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই দৌড়ে গেল সে ছেলের ঘরে।

প্রোফেসর চুপ করে চেয়ারে বসে রইল—তার কানে আসতে লাগল

মলকিনোর ঘর থেকে মায়ের ছেলেকে আদর করার ভাঙা-ভাঙা কথা, দুধ খাওয়ার শব্দ। বাইরেও যেন কী এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে—সমুদ্রের গর্জন গেছে থেমে, বাতাসের আর জোর নেই—শান্তিময় শান্ত পৃথিবী। মাথা তুলে অবাক হয়ে সে শুনতে লাগল। খুব আস্তে একটা জানলা তখনো খুট-খুট করে নড়ছে। হ্যাঁ, সত্যিই তো…হাওয়া… থেমে গেছে হাওয়া! জানালার ধারে গিয়ে বাগানের ওপাশে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে দেখল—সেপাইদের ব্যারাকের সামনে পথের আলো জ্বলে উঠেছে, আর সত্যিই হাওয়াও থেমে গেছে হঠাৎ। কতগুলি জংগী অফিসারের কণ্ঠস্বর ওর কানে ভেসে এল, খাওয়া-দাওয়ার পর ফুর্তি করে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছে।

এতক্ষণ ওর মনে ছিল না যে অন্ধকার ঘরে সাতানিনার কাছে মলকিনো একলা রয়েছে।

ও তাড়াতাড়ি আলো জালতে ঘরে ঢুকল।

'আমি জালছি আলো, আমি জালছি।' সাতানিনা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'আলো কোথায়? ও ঘরে? আমি এখুনি খুঁজে আনছি।'

খুব ব্যস্ততার সংগে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মলকিনো ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বাবা, বাবা, ওকে আমি চাই না… ওর গায়ে বিচ্ছিরি এসেন্সের গন্ধ…'

'কিছু ভেব না, খোকন, কিছু ভেব না।'

'কিন্তু বাবা, তুমি কোথায় ঘুমোবে? ও শুলে তোমার জায়গা হবে কোথায়? তুমি এখানে আমার কাছেই শুয়ো, শুনছো বাবা?'

'হ্যাঁ, বাবা, তাই শোব, কিছু ভেব না তুমি।'

চারদিকে সব চুপচাপ! কিন্তু সাতানিনা এখনো ফিরছে না কেন? বাতিগুলো কি খুঁজে পাচ্ছে না? কী করছে সে? খোকেনর কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল যে তার

গায়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে। ওর মনে হ'ল সাতানিনা নিশ্চয় একটা জানলা খুলেছে পাশের ঘরে। কিন্তু কেন?

সে উঠে দাঁড়াল, চুপি চুপি নবকিশোর বিছানার কাছ থেকে সরে এসে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল পাশের ঘরের দরজার কাছে। ব্যারাকের দিকে নিচু জানলাটা এই ঘরেই। ঠিক ধরেছে, সাতানিনা জানলা খুলে নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে, নিচেও দাঁড়িয়ে কে যেন, তার সংগে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। কে সে? কার সংগে বলছে কথা? এরই মধ্যে সাতানিনার শয়তানী আবার আরম্ভ হ'লো? প্রোফেসর বাঘের মতো গুঁড়ি মেরে, একটুকুও শব্দ না করে ওর কাছে গিয়ে পৌঁছল। সে শুনতে পেল, সাতানিনা নিচের অফিসারটিকে বলছে, 'না পিপি, লক্ষ্মীটি, আজ নয়, আজ রাতে অসম্ভব, কাল……আমি কথা দিচ্ছি, নিশ্চয়ই কাল।'

এই কথাগুলো শোনার সংগে সংগে প্রোফেসর আরো নিচু হয়ে সাতানিনার পা দুটো ধরল, তারপর এক ঠেলায় জানলা দিয়ে তাকে বাইরে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হুকুম লেফটেনেণ্ট সাহেব, আজ রাতেই ভালো করে ধরে নিন।'

সাতানিনার চিৎকার আর অফিসারটির চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে সে জানালা থেকে সরে এল—হাতপা তখনো ওর থরথর করে কাঁপছে। জানালাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করল, কিন্তু বাইরে তখন সেপাই, অফিসার আর রাস্তার লোকের ভিড় জমে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে সে ছেলের ঘরে ঢুকতে গেল। তার আগেই ছুটে এসেছে দাই শোবার পোশাকে, ওকে দাঁড় করিয়ে কী হয়েছে, এত গোলমাল কিসের—সব কথা শোনার চেষ্টা করল। প্রোফেসর দাইকে একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছেলের বিছানার কাছে গিয়ে তাকে আদর করতে লাগল। ছেলের প্রশ্নের উত্তরে উত্তেজিতভাবে ও শুধু বলতে লাগল, 'কিছু না…কিছুই হয়নি,

বাবা…সত্যি কিছু না…ভয় পেয়ো না, লক্ষ্মী। একটা চাঁদি…হাত থেকে একটা চাঁদি খসে লেফটেন্যান্টের মাথায় পড়েছে। আর কিছু না।'

বাইরের দরজায় দুম্ দুম্ ধাক্কা। ধাই কোনোরকমে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দু'জন পুলিশ, একজন পুলিশ সার্জেন্ট আর তাদের পিছনে সেপাই অফিসার, বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল রাস্তার লোকের ভিড়।

এত সব লোক দেখে ভয় পেয়ে ধাই তাড়াতাড়ি বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন…আমি আলোটা জ্বালি…'

দেখা গেল দলফিনো বিছানার উপর হাঁটু ভেঙে বসে আছে আর তার বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে দু'হাতে।

'এই যে পেয়েছি!' একজন পুলিশ চিৎকার করে উঠল, 'শিগ্গির উঠে এস আমাদের সংগে।'

প্রোফেসর তাদের দিকে মুখ ফেরাল। পুলিশের পিছন পিছন যারা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তারা ঐ ব্যাঙেজের পাগড়িপরা মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখে বড় বড় চশমা দেখে অবাক হ'ল, ভয়ও পেল।

'কোথায় যেতে হবে?' সে জিজ্ঞাসা করল।

পুলিশ সার্জেন্ট ওর কাঁধে হাত দিয়ে রুক্ষ স্বরে জবাব দিল, 'আমার সংগে। আর, কোনো ওস্তাদি করার চেষ্টা কর না।'

প্রোফেসর বলল, 'তা বেশ। কিন্তু আমার ছেলে? ওর যে বড় অসুখ! কার কাছে রেখে যাব ওকে? আমাকে সব খুলে বলতে দিন, ভদ্র…'

সার্জেন্ট রেগে উঠে বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ কর। তোমার ছেলেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তুমি এস আমার সংগে।'

দলফিনো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। প্রোফেসর ওকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিল। অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে রেখে বারবার ছেলের মুখে চুমু খেয়ে চুপি চুপি বলতে লাগল যে—এ কিছু না, কিছুই

না, খুব শিগ্‌গিরই সে ফিরে আসবে···একজন পুলিশ অধৈর্য হয়ে ওর হাত ধরে টান লাগাল।

'আমাকে হাতকড়াও পরতে হবে নাকি?'

হাতকড়া পরানো হয়ে গেলে সে আর একবার ছেলের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'খোকন···বাবা, আমার চশমাটা···'

ছেলে তখনো ভয়ে কাঁপছে, জিজ্ঞাসা করল, 'কী বাবা, কী চাও?'

'চশমাটা খুলে নাও বাবা···লক্ষ্মী ছেলে···এই···এইবার ঠিক হয়েছে··· চমৎকার···এখন আর আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না···'

এবার সে জনতার দিকে ফিরে চোখ মিটমিট করতে করতে বিশ্রীভাবে একবার হাসবার চেষ্টা করল—ওর হলদে দাঁতগুলো সব একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। ঘাড়টা কুঁজো করে সে গলাটা লম্বা করল, কিন্তু আজ দুঃখের বেগে তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরলো না—এই প্রথম সে তার অভ্যাস মতো বলতে পারল না, 'তা বেশ, তা বেশ।'

—কমলা রায়

অন্ত আর এক মেয়ে

'সিনকারোসা বাড়ি আছে কি?'

'হ্যাঁ, দরজায় টোকা দাও।'

টোকা দিয়ে বুড়ি মারগ্রাৎসিয়া দরজার সামনের সরু সিঁড়ির উপ
নিঃশব্দে গিয়ে বসল।

ঐ সিঁড়িতেই সে বসে। সদর দরজার সামনেকার ঐ ধরনের আরে
সাদা সিঁড়ির উপরেই তার বসবার জায়গা। কার্লিয়া-গ্রামের হয় এ-বাড়ি
নয় ও-বাড়ির দরজার সামনে জড়সড় হয়ে বসে, কখনো ঘুমিয়ে কখনে
নিঃশব্দে অশ্রুপাত করতে-করতে তার সময় কাটে। পথের কোনে
লোক তার কোলে এক টুকরো রুটি কিংবা পয়সা ছুঁড়ে দিলে ঘুম থেকে
সে বড় একটা জাগে না, চোখের জলও মোছে না, সেগুলো চুম্বন করে
ক্রশ-এর চিহ্ন এঁকে হয় কাঁদে নয় তো ঢুলতে সুরু করে।

তাকে দেখলে মনে হয় বুঝি এক বস্তা পুরু তেল-চিটচিটে ছেঁড়া কাপড়
কি গ্রীষ্ম কি শীত, সর্বদা সে একই রকম—শতছিন্ন, ধায় আর পথে
ময়লার তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত। তার বলিরেখাঙ্কিত মুখের উপর ... ঘনকা
গোনা, চোখের পাতা খোলা, আর বীভৎস লাল। ক্রমাগত জ
পড়ে-পড়ে ফুলে থাকে। কিন্তু সেই কুঞ্চিত রেখার মধ্যে, রক্ত ও অশ্রু
জলের ভিতর দিয়ে, একজোড়া উজ্জ্বল চোখ চকচক করে। সে-চোখে
দূর বহুদূর প্রসারিত—সেখানে বিস্তৃত শৈশবের ছায়া। কুঞ্চিত মাছিগুলো
সে চোখের উপর বসে। কিন্তু নিজের দুঃখের মধ্যে এমন গভীরভাবে
ডুবে থাকে যে মাছিগুলোকে সে তাড়ায় না, এমন কি ভ্রুক্ষেপও

সরে না। তার শুকনো অল্প চুল মাথার উপর চূড়াপ হয়ে কানের পাশে কাঁটার মতো ঝুলছে। যৌবনে যে-সব ভারি গয়না সে পরেছিল তার চাপে কানের তলা দুটো ছিঁড়ে গেছে। একটি গভীর কালো ক্ষতচিহ্ন থুৎনি থেকে শুরু হয়ে গলার লোল চামড়া বেয়ে বেয়ে কাঁপা বুকের ভিতর অদৃশ্য হয়েছে।

যে-সব মেয়েরা নিজেদের চৌকাঠের উপর বসেছিল কেউই আর তার দিকে ফিরে চাইল না। তাদের কুঁড়ের সামনে বসে গল্প করে তারা প্রায় গোটা দিনটাই কাটিয়ে দিল। প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত—কেউ কাপড়ে তালি মারছে, কেউ রাঁধছে, কেউ বা বুনছে। বাড়িগুলো একাধারে মানুষ আর পশুর বাসস্থান। যে-পাথরে রাস্তা তৈরি বাড়িগুলোর মেঝেও সেই পাথরেরই। দরজা দিয়েই শুধু আলো ঢুকতে পারে। তার এক পাশে গোয়াল, সেখানে গাধা কিংবা খচ্চরগুলো মাছি তাড়াবার জন্যে সর্বদা লাথি ছুঁড়ছে। অন্যপাশে মনুমেন্টের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে শোবার বিছানা। প্রত্যেক ঘরেই কফিনের মতো দেখতে পাইন কিংবা বীচ কাঠের একটি করে কালো লম্বা সিন্দুক, দুটো কিংবা তিনটে করে খড়ের গদিওলা চেয়ার, একটা করে বারকোশ আর কিছু চাষবাসের যন্ত্রপাতি। সে অঞ্চলে যে-সব মহাত্মারা সাধারণের কাছে প্রিয়, ঝুলে ভরা [illegible] দেওয়ালের উপর তাঁদেরই [illegible] মায়ের এক-একটি ছবি টাঙানো। ধোঁয়া ও সারের বাষ্পাচ্ছন্ন পথের উপর তামাটে রঙের ছেলেরা খেলছে। কেউ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কারুর গায়ে বা ছোটো-ছোটো ময়লা ঢোলা শার্ট। মুর্গিগুলো তাদের ভিতর সগর্বে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাচ্চা শুয়োরগুলো কাদা মেখে ঘোঁৎঘোঁৎ করে স্তূপীকৃত আবর্জনার ভিতর গর্ত খুঁড়ছে।

পরের দিন সকালে দক্ষিণ আমেরিকায় যারা চলে যাবে তাদের কথাই মেয়েরা তখন আলোচনা করছিল।

একজন বলল, 'সাম্রো খোবা বউ আর তিন ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে।'

আর একজন খবর দিল, 'জিনো থরদিরা তার পাঁচ ছেলে আর বউকে ফেলে চলেছে। বউটা আবার পোয়াতি।'

তৃতীয়জন প্রশ্ন করল, 'কারথাইন রকা সত্যি নাকি তার বারো বছরের ছেলেটাকে গন্ধকের খনিতে কাজে লাগাবে বলে নিয়ে যাচ্ছে? হা ভগবান! বউটার কাছে ছেলেটাকে অন্তত রেখে যাওয়া উচিত ছিল। মেয়েটাকে কে-ই বা দেখবে এখন?'

কিছুদূরের রাস্তা থেকে চতুর্থ মেয়েটি করুণ সুরে বলল, 'মানংসিও লিওয়োচির বাড়িতে সমস্ত রাত ধরে কী কান্নাটাই না সবাই কাঁদল। মানংসিওর ছেলে লিচো যুদ্ধের কাজ থেকে ফিরে এসেই ঠিক করেছে সে-ও যাবে। কী চোখের জলটাই না ফেলছে সবাই।'

এ-খবরে বুড়ি মায়াগ্রাংসিয়া কান্নার দমককে বাধা দেবার জন্যে নিজের মুখের উপর চাদরটা চেপে ধরল। কিন্তু তার শোকের তীব্রতা কমলো না, কোনা চোখের ভিতর থেকে অনর্গল জল পড়তে লাগল।

চোদ্দ বছর আগে তারও দুটি ছেলে আমেরিকায় চলে গেছে। বলেছিল চার পাঁচ বছর পরে ফিরে আসবে। কিন্তু সেখানে তারা উন্নতি করেছে—বিশেষ করে বড়টি। ফলে তাদের বুড়ি মাকে ভুলে গেছে। প্রত্যেক বারেই যখন নতুন একটি দল কার্নিয়া ছেড়ে যায়, [illegible]কারোগাকে দিয়ে বুড়ি চিঠি লিখিয়ে সেই দলের কাউকে ধরে অনুরোধ জানায় যেন সে নিজে হাতে চিঠিটা তার দুই ছেলের যে কোনো একটিকে পৌঁছিয়ে দেয়। তারপর সেই দল যখন নিজেদের ভারী পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সব চেয়ে কাছের ইস্টিশনে যাত্রা করে, তাদের মা বোন বউএর কান্না আর হা-হুতাশের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই বুড়িও ধুলিমলিন দীর্ঘ পথ ধরে চলে। একবার এইভাবে যেতে যেতে সে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল একটি

ছোকরা যাত্রী তার আত্মীয়দের সপক্ষ শোকপ্রকাশে বাধা দেবার জন্যেই খুব হৈ-হল্লা করে স্ফূর্তি দেখাচ্ছে।

বুড়ির দিকে চেয়ে সে চেঁচিয়ে বললে, 'কী গো পাগলা বুড়ি মাসিমা! অমন করে দেখছ কী? আমার চোখ দুটো খসে পড়ুক, তাই চাও?'

'না, বাপু, না। তোমার চোখ দুটোকে আমার হিংসে হচ্ছে। ওদের দিয়েই তো আমার ছেলেদের দেখবে! এখান থেকে যাবার সময় আমার যে-অবস্থা দেখলে সে-কথা জানিও আর কোনো আরো দেরি করলে আর তারা আমায় দেখতে পাবে না...'

পরের দিন যারা যাবে তাদের নিয়েই পাড়ায় তখনো আলোচনা চলেছিল। কাঠের গদিতে মাথার ফিতে বাঁধা রেখে প্রায় চিৎ হয়ে এক বুড়ো নিঃশব্দে পাইপ টানতে টানতে কথাবার্তা শুনছিল। অকস্মাৎ তার কড়া-পড়া হাত দুটো বুকের উপর গুটিয়ে থুথু ফেলে বললে:

'আমি রাজা হলে সেখান থেকে কানিয়ার একটি চিঠিও আর আসতে দিতুম না।'

'তোমার জয় হোক জাকো পিসা!' একটি মেয়ে চেঁচিয়ে বললে। 'কিন্তু পোড়াকপালী মা আর বউগুলো কোনো খবর আর সাহায্য না পেলে বাঁচবে কী করে?'

'তারা বড় বেশি চিঠি দেয়, সে হয়েছে বিপদ,' বিড়বিড় করে ব'লে বুড়ো আবার থুথু ফেললে। 'বাপেরা গতর খাটাতে পারে আর বউগুলো তো নষ্ট হলেই চলে...ছোড়াগুলো কেন যে সেখানকার কষ্টের কথা লেখে না তাই ভাবছি! তারা কেবল ভালো খবরগুলোই জানায়—আর তাই শুনে এখানকার যুবা ছোকরারা দল বেঁধে ছোটে। কে আমাদের খেতে কাজ করবে? কানিয়াতে মানুষ বলতে আছে তো কেবল বুড়ো আর মেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চা। চোখের সামনে দেখছি আমার সাবেক জমিজমা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। শুধু এক জোড়া হাত দিয়ে কী করতে পারি

আমি ? তবু তারা যাবে, তবু যাবেই ! যাক, চুলোয় যাক। বাজ পড়ুক আহাম্মকগুলোর মাথায়।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলল নিনকারোসা। হঠাৎ যেন সেই সংকীর্ণ পথে সূর্য উঠল। তার চকচকে কালো চোখ আর টকটকে লাল ঠোঁট। ক্ষুদ্র অথচ মজবুত তার গড়ন, তার মধ্যে যেন বন্য এক উদ্দামতা। লাল ও হলদে বুটি দেওয়া মস্ত একটি রুমাল তার সুগঠিত স্তনের উপর গিঁট দিয়ে বাঁধা। কানে ভারী কানবালা। তার চুল কোঁকড়া কালো। মাথায় সিঁথি নেই। টেনে বেঁধে ঘাড়ের কাছে জড়িয়ে রূপোর একটি ছোরা দিয়ে গাঁথা। তার সুগোল থুৎনির উপর গভীর টোল পড়ে। ফলে, তাকে দেখার নেশা আরো বেড়ে যায়, আর তার সমস্ত মুখের ভিতর চমৎকার একটি হাসিখুশি ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তার বিয়ের দু'বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই নিনকারোসা বিধবা হয়েছিল। পাঁচ বছর আগে তার দ্বিতীয় স্বামীও তাকে ফেলে আমেরিকায় পালিয়েছে। কথাটা অবশ্য কারুরই জানবার নয়, কিন্তু এক রাত্রে গ্রামের এক যুবক ফলের বাগানের পথে আর খিড়কি দরজা দিয়ে তার কাছে ঢুকেছিল। ফলে সচ্চরিত্র ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রতিবেশীরা তার দিকে বাঁকাভাবে চাইত কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিনকারোসার সৌভাগ্যকে হিংসেও করত। নিনকারোসার উপর তাদের আরো একটি রাগের কারণ ছিল। তার দ্বিতীয় স্বামী পালিয়ে যাওয়ায় নিষ্ফল প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করতেই কতকগুলি মেয়ের নামে মিথ্যে দোষারোপ করে সে নাকি আমেরিকায় তাদের আত্মীয়দের কাছে স্বাক্ষরহীন একাধিক চিঠি পাঠিয়েছে—এই ধরনের একটা কানাঘুষোও গ্রামের মধ্যে শোনা যায়।

'বজ্জাতটা দিচ্ছে কে ?' গলিতে নেমে এসে সে প্রশ্ন করল। 'ও, জ্যাকো পিনা ! জ্যাকোখুড়ো, ক্যালিয়াতে কেবল আমরা, মেয়েরা, থাকলেই

অনেক ভালো হত। আমরাই তা হলে বাঁচ চলতুম।'

তারা গলায় বিড় বিড় করে বুড়ো বল্‌ল, 'মেয়েদের দিয়ে শুধু একটা কাজই হয়।' ব'লে আবার সে ঘুমু লেগ্‌ল।

'কী কাজ বুড়ো? বল, বলতেই হবে।'

'শুধু কাঁদা—আর, আরো একটা কাজ।'

'তা হলে দুটো কাজ, তাই বল! কিন্তু দেখছ তো আমি কাঁদি না।'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে-কথা আমার জানা আছে। তোমার প্রথম স্বামী মর-বার পরেও তুমি কাঁদনি।'

তৎক্ষণাৎ বুড়োর উপর জবাব দিল নিনকারোগো, 'কিন্তু বুড়ো, আমি আগে মরলে সে-ও কি আর একটা বিয়ে করত না? নিশ্চয়ই করত। যাক্ গে সে-কথা—আমাদের সবাইকার হয়ে সবচেয়ে বেশি কে কাঁদে দেখ—মায়াগ্রাংশিয়া।'

আবার চিৎ হয়ে শুয়ে জ্যাকো স্পিনা বিড়বিড় করে বল্‌ল, 'বুড়িটার জল ধরা দরকার তাই সে চোখ দিয়েও জল ঝরায়।'

শুনে মেয়েরা হাসতে লাগল। তার ভাবনা থেকে জেগে মায়াগ্রাংশিয়া চেঁচিয়ে উঠল:—

'সূর্যের মতো সুন্দর দুটি ছেলেকে আমি হারিয়েছি আর তোমরা আমাকে কাঁদতেও দেবে না?'

'সুন্দর নিঃসন্দেহে। সত্যিই তারা সুন্দর! তাদের জন্যে কাঁদা যায় বৈকি—' নিনকারোগো বল্‌ল। 'সেখানে তারা সুখের সমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছে আর তোমাকে এখানে ফেলে গেছে ঝিঁঝিঁর মতো মরতে।'

'তারা যে ছেলে আর আমি যে তাদের মা,' উত্তরে বুড়ি বল্‌ল। 'কী করে আমার দুঃখ তারা বুঝবে?'

আমি কিন্তু বাপু এতো দুঃখ আর চোখের জলের কারণ বুঝি

না,' নিনকারোসো বলল। 'লোকে তো বলে তুমিই তাদের যন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়েছ।'

আকাশ থেকে পড়ে মায়াপ্রাৎসিয়া বলল, 'আমি?' দু-হাতে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমি? কে বলেছে এ-কথা?'

'কেউ-না-কেউ বলেছে।'

'তাদের মুখে আগুন! তাদের মুখে আগুন!—আমি? আমার ছেলেদের? আমি যে…'

বাধা দিয়ে একটি মেয়ে বলল, 'কেন কান দিচ্ছো ওর কথায়? বুঝতে পারছো না ঠাট্টা করছে?'

কোমর থেকে তার দেহকে দুলিয়ে-দুলিয়ে নিনকারোসো অনেকক্ষণ হাসল। তারপর এই নির্দয় ঠাট্টার ক্ষতিপূরণের জন্যে মিষ্টি সুরে প্রশ্ন করল:

'ভালো কথা ঠানদি, তোমার কী দরকার বললে না তো?'

মায়াপ্রাৎসিয়া বুকের ভিতর কম্পিত হাত ঢুকিয়ে বিশ্রী দোমড়ানো একটা কাগজ আর খাম বার করল। নিনকারোসোকে সেগুলি দেখিয়ে অত্যন্ত করুণভাবে রইল তাকিয়ে।

'যদি তুমি বরাবর যে-রকম দয়া কর…'

'কী বললে? আর একটা চিঠি?'

'যদি তুমি দয়া করে…'

একটা বিরক্তি-সূচক শব্দ করল নিনকারোসো। কিন্তু কিছুতেই বুড়ির হাত থেকে নিস্তার নেই জেনে তাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল।

এখানকার অন্যান্য বাড়িগুলোর সঙ্গে এ-বাড়িটার কোনো মিল নেই। দরজা বন্ধ থাকলে বড় ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে পড়ে, কারণ আলো আসবার জন্য আর একটি পথ হচ্ছে দরজার উপরকার ঝাঁঝরি দেওয়া

জানালাটা। ঘরে লোহার খাট, জামাকাপড় রাখার দেরাজ, উপরে মার্বেল পাথর বসানো কয়েকটা ড্রয়ার এবং আখরোট কাঠের উপর খোদাই কাজ করা ছোট্ট একটা টেবিল। সত্যি কথা বলতে কি আসবাব-পত্রগুলো নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় গ্রামে সেলাই-এর কাজ করে নিনকারোনার যা আয় তার উপর নির্ভর করে এগুলো কেনার মতো বিলাসিতা সে করতে পারে না।

সেই ঢুকতে যাওয়া কাগজটা ড্রয়ারের উপর রেখে দোয়াত-কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লেখবার জন্য সে প্রস্তুত হ'ল।

'চটপট বলে কেন!'

'আমার বাছারা'—বুড়ি বলতে শুরু করল।

'কেঁদে-কেঁদে আমার চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছে…' একটা ক্লান্ত দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে নিনকারোনা লিখে চলল। এই সব চিঠিতে বরাবর কী যে লেখা হয় সে-কথা তার কণ্ঠস্থ।

বুড়ি ব'লে চলল

'তোমাদের অন্তত শেষ লেখা দেখবার জন্যে আমার চোখ দুটো ফুলে উঠেছে…'

'থেমো না, থেমো না!' তাড়া দিল নিনকারোনা। 'এ-সব কথা কম করে অন্তত তিরিশবার ওদের লিখেছ!'

'তবু লেখ। জান না কি কথাগুলো কত সত্যি? যাক, লেখ: আমার বাছারা…'

'আবার কি গোড়া থেকে শুরু করব?'

'না। এবার অন্য কথা লিখতে হবে। গতকাল সমস্ত রাত ধরে ভেবে রেখেছি। শোনো বলি: আমার বাছারা: আমি, তোমাদের বুড়ি মা, শপথ করছি—হ্যাঁ, একেবারে লেখ—ঈশ্বরের নামে শপথ করছি তোমরা কানিভায় ফিরে এলে আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার

কুঁড়ে বাড়িটা তোমাদের দিয়ে দেব।'

হাসিতে ফেটে পড়ল মিলকারোনা। 'ওই কুঁড়ে বাড়িটা! তোমার ছেলেরা তো শুনি বেজায় বড়মানুষ। ঐ কড়ির ওপর কাদা ল্যাপটানো চারটে দেয়াল তাদের কোন কাজে লাগবে? ফুঁ দিলেই তো ভেঙে পড়বে ওগুলো!'

'তুমি লেখ তো,' নাছোড়বান্দার মতো বুড়ি আবার বলল। 'নিজের দেশে চারটে ভাঙা পাথরের দাম বাইরের যে-কোনো প্রাসাদের চেয়ে বেশি। লেখ, লেখ।'

'লেখা হয়ে গেছে। আর কী লিখতে হবে বল?'

'এই যে বলছি—তোমাদের পোড়াকপালী মা শীতে ঠক-ঠক করছে। তার কিছু জামাকাপড়ের দরকার, কিন্তু টাকা কোথায়? তোমরা যদি দয়া করে তাকে একটা পাঁচ লিরার নোট পাঠাও তা হ'লে…'

'হয়েছে, হয়েছে, হয়েছে!' কাগজটাকে ভাঁজ করে খামে পুরতে-পুরতে মিলকারোনা বলল। 'একেবারে ঠিক-ঠিক লিখে দিয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে।'

'ঐ পাঁচ লিরার কথাটাও লিখেছ?' এতো চটপট লেখা হয়ে গেল দেখে বুড়ি বিস্মিত না হয়ে পারল না।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পাঁচ লিরা-র কথাটাও লেখা হয়েছে।'

'ঠিকমতো লিখেছ তো? সবকথাগুলো?'

'আঃ জ্বালাতন! হ্যাঁ, বলছি তো!'

'এই বুড়িটার ওপর বিরক্ত হয়ো না, মা,' মাম্মাজোৎশিয়া বলল, 'আমার কি আর মাথার ঠিক আছে? আজকাল তো ভীমরতি ধরেছে…ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

চিঠিটা নিয়ে সে বুকের ভিতর রাখল। মানৎসিও দিরোচিব ছেলের হাতে চিঠিটা দেখে ব'লে সে ঠিক করেছে। মাপী কেন রোজারিও

শহরে ছোকরা যাচ্ছে। সেখানেই তার ছেলেরা আছে। চিঠিটা পৌঁছে দেবার জন্যে বুড়ি বেরুলো।

সন্ধে নাগাদ মেয়েরা যে-যার ঘরে ফিরে গেল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির দরজাই হ'ল বন্ধ। কাঁধে মই নিয়ে যে লোকটা অল্পসংখ্যক কেরো-সিনের বাতি জালিয়ে যায় সে ছাড়া সরু গলিতে আর কারুর সাড়াশব্দ নেই। সেই-সব নিস্তব্ধ জনশূন্য অপরিষ্কার পথ এই মৃদু ম্লান আলোয় যেন আরো বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

ঝুঁকে পড়ে বুড়ি বারান্দা দিয়ে হাঁটছিল। এক হাতে চিঠিটা বুকে চেপে ধরে যেন তার ভেতর মাতৃস্নেহের উত্তাপ ভরে দিতে চায়। অন্য হাত দিয়ে সে বারবার নিজের পিঠ আর মাথা চুলকোয়। প্রতিবার নতুন চিঠি পাঠাবার সংগে তার মনে নতুন আশা জেগে ওঠে—আশা হয় হয়তো এবারে তার ছেলেদের মন ফিরবে, তারা আসবে ফিরে। তার চিঠি যখন পড়বে, যখন জানতে পারবে বিগত চোদ্দ বছর ধরে সে কী পরিমাণ অশ্রুপাত করেছে, নিশ্চয়ই তখন সেই সুন্দর ও সুপুরুষ সন্তানেরা তার কাতর অনুনয়কে ঠেলতে পারবে না…

কিন্তু এবারে যে-চিঠিটা তার বুকে নিয়ে চলেছিল সেটা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ খুশি হতে পারেনি। মনে হ'ল লিখনেওয়ালা যেন বড় বেশি তাড়াতাড়ি শেষ করেছে। বিশেষ করে শেষের দিকে, যেখানে জামা-কাপড়ের জন্যে পাঁচ সিকার কথাটা আছে, সেখানটা সম্বন্ধে তার খুঁৎখুঁতুনি একেবারেই গেল না। মাত্র পাঁচ সিকা! শীতে তাদের মা কী দারুণ কষ্টই না পাচ্ছে—তার জামাকাপড়ের জন্যে ওই কটি টাকা পাঠানো তার ধনী ছেলেদের পক্ষে কিছুই তো নয়…

ইতিমধ্যে কুটিরের বন্ধ দরজার ভিতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে

লাগল—মায়েরা কাঁদছে তাদের ছেলেদের জন্যে; কাল সকালে তারা চলে-যাবে।

'হায় ছেলেরা,' চিঠিটাকে আরো শক্ত করে বুকে চেপে মায়াগ্রাৎসিয়া নিজের মনেই অস্ফুট আর্তনাদ করল—'কী করে তোরা ছেড়ে যেতে পারিস? ফিরবি ব'লে তোরা কথা দিস কিন্তু ফিরিস না…ওরে পোড়া-কপালী মেয়ের দল, শুনিস না ওদের কথা! আমার ছেলেদের মতো তোদের ছেলেরাও কখনো ফিরবে না…কখনো ফিরবে না…'

গলির মধ্যে কার পায়ের শব্দ শুনে একটি আলোর তলায় হঠাৎ সে থেমে গেল। কে আসে?

যাক! আর কেউ নয়, গ্রামের সেই নতুন ছোকরা ডাক্তার, হালে সে এসেছে। লোকে বলছে শিগগিরই সে নাকি চলে যাবে। তাকে দিয়ে কাজ চলবে না ব'লে নয়, গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর লোকের সুনজরে সে নাকি নেই। গরিব লোকেরা কিন্তু তাকে দেখেই ভালোবেসে ফেলেছে। দেখতে তাকে নেহাৎই একটি ছোটো ছেলের মতো কিন্তু বিদ্যা আর বুদ্ধিতে সে অতি বিচক্ষণ বিজ্ঞ লোক। শুনছি সে-ও নাকি আমেরিকায় চলে যাবে ঠিক করেছে। তবু ভালো যে এখন তার আর মা নেই—একেবারেই সে একা।

মায়াগ্রাৎসিয়া প্রশ্ন করল, 'ডাক্তারবাবু, একটু কি সাহায্য করবেন?'

বিস্মিত হয়ে তরুণ ডাক্তার বাতির তলায় থামল। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে একলা হাঁটতে হাঁটতে বুড়িকে সে লক্ষ্যও করেনি।

'কে তুমি? ওহো, তুমি…হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি নিশ্চয়ই সেই…'

তার মনে পড়ল এই ছেঁড়াকাপড়ের বস্তাকে একাধিকবার দেখেছে কোনো-না-কোনো সদর-দরজার সামনে।

'ডাক্তারবাবু, আপনি কি দয়া করে এই ছোট্ট চিঠিটা একবার পড়ে শোনাবেন? এটা আমার ছেলেদের কাছে পাঠাতে হবে।'

'যদি দেখতে পাই,' বল্ল ডাক্তার। তার চোখ খারাপ। নাকের উপর চশমাটা সে ঠিক করতে লাগল।

বুকের ভিতর থেকে চিঠিটা বার করে নিনকারোসাকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো শোনবার জন্য মারাত্রাংগিয়া অপেক্ষা করে রইল—'আমার বাছারা'—কিন্তু না! হয় ডাক্তার লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছে না নয়তো কী যে লেখা আছে পারছে না পড়তে।

কাগজটাকে সে চোখের খুব কাছে নিয়ে এল তারপর পড়ের আলো যাতে বেশি পড়ে সেজন্যে আবার নিয়ে গেল ঘুরে, এপিঠ দেখল, ও পিঠ দেখল, শেষটায় বল্ল:

'কিন্তু এটা কী জিনিস?'

'পড়তে পারছেন না নাকি?' ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করল মারাত্রাংগিয়া।

কথা শুনে হাসতে আরম্ভ করল ডাক্তার।

'কিছু না—লেখাই নেই কিছু,' সে বল্ল। 'কলম দিয়ে চারটে হিজি-বিজি দাগ কাটা। এই যে, দেখো না।'

'কী?' ভয়ে বিস্ময়ে বুড়ি আর্তনাদ করে উঠল।

'ঠিক তাই। দেখো একবার! কিছু নেই! একেবারে কিছুই লেখা নেই।

'এও কি সম্ভব?' বুড়ি চিৎকার করে বল্ল। 'কি করে সম্ভব? নিনকারোসাকে আমি বললুম, প্রত্যেকটি কথা বললুম তাকে, পরে স্বচক্ষে দেখলুম সে লিখছে।'

'তা হলে নিশ্চয়ই সে লেখার ভাণ করেছিল,' কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে ডাক্তার একটা হতাশার ভঙ্গী করল।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মারাত্রাংগিয়া যেন পাথর হয়ে গেল। তারপর সজোরে নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে গড়গড় করে ব'লে চল্ল:

'হায় হায়! কী শয়তান! কী সাংঘাতিক শয়তান! কেন ঠকাল?

এ-জন্যেই তা হ'লে ছেলেরা উত্তর দেয় না। চিঠির একটা কথাও তাদের কাছে পৌঁছয়নি···আমি যা বলেছি কখনোই সে তা লেখেনি···এটাই তা হ'লে আসল কথা! ছেলেরা তা হ'লে জানে না আমার অবস্থার কথা—তারা জানে না তাদের জন্যে ভেবে ভেবে আমার এই ভিখারির হাল···আর আমি কি না তাদের দোষ দিই আর ডাক্তারবাবু, ঐ বজ্জাৎ মাগীটা কিনা সব সময় আমাকে নিয়ে মস্করা করে! হা ভগবান! হা ভগবান! এক হতভাগী মা'র সঙ্গে কী ক'রে কেউ এ-রকম শয়তানী করতে পারে, আমার মতো এক গরিব বুড়ি মেয়েমানুষের সংগে? হায় হায়! কী শয়তানী···কী শয়তানী···হায় হায়!—'

শুনে ডাক্তারের মন সমবেদনায় ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল সে। বুড়ির কাছ থেকে সে জেনে নিল লিনকারোলা কে, কোথায় তার বাড়ি—যাতে পরের দিন মেয়েটাকে কষে ধমকে দিতে পারে। তার প্রবাসী পুত্রদের নীরবতাকে সে যে ক্ষমা করেছে বুড়ি কিন্তু তখনো বারবার সে-কথা বলে চলেছে। তাকে ছেড়ে চলে যাবার জন্যে এতোগুলো বছর ধরে সে যে দোষ দিয়েছে সে কথা মনে করে বুড়ি গভীর অনুতাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ইতিপূর্বে যে চিঠিগুলো লেখা হয়েছে আর পাঠান হয়েছে বলে তার বিশ্বাস তাদের যে-কোনো একটিও যদি ছেলেদের কাছে পৌঁছত তা হ'লে তৎক্ষণাৎ যে তারা বুড়ির কাছে ফিরে আসত, এতক্ষণে এ-বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়েছে।

তারপর যা ঘটল সংক্ষেপে তা এই: ডাক্তারকে প্রতিজ্ঞা করতে হ'ল পরের দিন সকালেই সে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখে দেবে তার ছেলেদের।

'যাক, যা হবার হয়েছে। আর ও-রকম হা-হুতাশ কোরো না। সকালে আমার কাছে এস। এখন নয়—এখন ঘুমুবার সময়। সকালে এস। এখন ঘুমুতে যাও।'

কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে ফিরে যাবার সময় ডাক্তার দেখল পথের আলোর তলায় বসে বুড়ি অঝোরে কেঁদে চলেছে। ডাক্তার তাকে খুব খানিকটা বকুনি দিয়ে সেখান থেকে তুলল, তারপর বললে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে যেতে। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে।

'কোথায় থাকো তুমি?'

'হায়, ডাক্তারবাবু…গ্রামের শেষে আমার একটা কুঁড়ে ঘর আছে। সেই শয়তান মাগীকে লিখতে বলেছিলুম আমি বেঁচে থাকতেই সে-বাড়িটা ছেলেদের দিয়ে দেব—যদি তারা ফিরে আসে। শুনে সে-মাগী হেসেই বাঁচে না। বাড়িটা নাকি কড়ির ওপর মাটি ল্যাপটান চাঁচটে দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি—'

'হয়েছে, হয়েছে,' আবার তাকে থামিয়ে দিল ডাক্তার। 'এখন শুতে যাও, কাল বরং বাড়িটার কথাও লিখে দেব। চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু বলছেন কী ডাক্তারবাবু? আমাকে পৌঁছে দেবেন? না-না, আপনি চলে যান। আমি একটা গরিব বুড়ি, আমার সঙ্গে আবার আসবেন কি? তা ছাড়া আমি হাঁটি খুব ধীরে ধীরে।'

বিদায় নিয়ে ডাক্তার চলে গেল। খানিকটা যেতে মারাপ্রাৎসিয়া তাকে অনুসরণ করল। যে-দরজা দিয়ে ডাক্তার ভিতরে ঢুকল সেখানে পৌঁছে বুড়ি থামল, চাদরে ভালো করে ঢাকল সর্বাঙ্গ তারপর দরজার সামনেকার সিঁড়ির উপর বসল। সমস্ত রাত সেখানে সে অপেক্ষা করে কাটাবে।

ডাক্তার ভোরে ওঠে। প্রথম টহল দেবার জন্যে বেরিয়ে এসে সে দেখল, বুড়ি ঘুমিয়ে রয়েছে। দরজায় ঠেস দিয়ে সে ঘুমিয়েছিল। তাই,

দরজা খুলতেই, ডাক্তারের পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল।

'কী আশ্চর্য! তুমি! পাগল না তো?'

'না-না…ক্ষমা করবেন…' তোৎলাতে-তোৎলাতে বহু কষ্টে পায়ের উপর ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তার হাত দুটো তখনো চাদরে ঢাকা।

'তুমি কি এখানেই রাত কাটিয়েছ?'

'আজ্ঞে হাঁ…এ কিছুই নয়; আমার অভ্যেস আছে…' দোষ ঢাকবার জন্ত বুড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আর কী করতে পারি বাছা? আমি স্থির থাকতে পারছি না…ও-মাগী শয়তানীর পর থেকে আমি স্থির থাকতে পারছি না…ডাক্তারবাবু, ওকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে! আমাকে বললেই তো পারত আমার হয়ে লিখতে সে বিরক্ত হয়। তা হ'লে তো অন্য কারুর কাছে যেতে পারতুম। আপনার কাছেই তো আসতে পারতুম, আপনার দয়ার শরীর…'

'হয়েছে, হয়েছে, একটু অপেক্ষা কর,' ডাক্তার বলল, 'আমি ঐ মহিলার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে আসি। তারপর চিঠিটা লেখা যাবে। একটু দাঁড়াও।'

গত রাত্রে বুড়ি যে-দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল ডাক্তার দ্রুত পায়ে সেদিকেই চলে গেল।

গলির ভিতর একটি মেয়েকে সে প্রশ্ন করল নিনকারোলোয়ার বাড়ি কোনটা, পরক্ষণেই আবিষ্কার করল নিনকারোলোয়ার সঙ্গে সে কথা কইছে।

'আমিই সে মেয়ে, ডাক্তারবাবু যাকে আপনি খুঁজছেন,' গাল লাল করে হেসে উত্তর দিল তারপর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল ভিতরে।

ছেলেমানুষের মতো সুন্দর ডাক্তারকে একাধিকবার পাশ দিয়ে চলে যেতে এর আগে সে দেখেছে। বরাবরই তার স্বাস্থ্য ভালো থাকায়, এমন কি অসুস্থতার ভাণ করাও সম্ভব না হওয়ায় কখনই তাকে ভিতরে

ঢাকতে পারেনি। তাই ডাক্তারের এই আগমনে মনে মনে সে খুশি হয়ে উঠল। গায়ে পড়ে ডাক্তার যে তার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে এ ঘটনায় বিস্মিত হ'ল। কিন্তু ডাক্তার কেন এসেছে জানতে পেরেই মুখে তার বিরক্তির আর চিন্তার ছায়া দেখেই সে নিজের মুখের ভাব এমন মধুর মধুর করে তুলল যেন তার দিকে তাকিয়েই ডাক্তারের মন গলে যায়। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় ডাক্তারের অসন্তোষে কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ সে হয়েছে—যদিও এই অসন্তোষের কোনো মানে হয় না। ডাক্তার যতক্ষণ কথা বলল ততক্ষণ একবারও সে বাধা দিল না, মার্জিত ব্যবহার তার জানা আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে কথা বলার সুযোগ পেল সেই মুহূর্তেই বলতে আরম্ভ করল :

'আমাকে ক্ষমা করবেন ডাক্তারবাবু'—কথা বলতে বলতে তার সুন্দর কালো দুটি চোখ আধবোজা হয়ে এল, 'কিন্তু আপনি কি ঐ পাগলী-বুড়ির কথা শুনে সত্যি-সত্যি আমার উপর রাগ করছেন? এ-গ্রামে সবাই ওকে চেনে ডাক্তারবাবু, আর কেউই এখন ওর কথায় কান দেয় না। আপনার যাকে খুশি জিগগেস করে দেখুন, প্রত্যেকেই বলবে তার ছোটো ছেলে আমেরিকায় চলে যাবার পর থেকে গত চোদ্দ বছর ধরে ও পাগল হয়ে গেছে, একেবারে বদ্ধ পাগল। তার ছেলেরা সত্যিসত্যিই তাকে ভুলে গেছে, কিন্তু একথা কিছুতেই সে মানবে না। বারবার কেবল চিঠি দিতে চাইবে। বুঝতেই পারছেন, কেবল ওকে খুশি করার জন্যই আমি চিঠি লেখার ভাণ করি। আর যারা চলে যাচ্ছে, তারা এমন ভাণ করে যেন চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। বেচারি সব কথাই বিশ্বাস করে। তার মতো সব লোক হলে পৃথিবীর কী যে অবস্থা হতো একবার ভেবে দেখুন, ডাক্তারবাবু। আর জানেন, আমাকেও লোকে ছেড়ে গেছে—আমার স্বামীই ছেড়ে গেছে আমাকে। সত্যি, ডাক্তার-বাবু! আর জানেন লোকটা কী-রকম বেহায়া? সেখানে যে মেয়েটাকে

ফুটিয়েছে তার সঙ্গে নিজের একটা ছবি তুলে আমাকে আবার পাঠিয়েছে। দেখবেন সে ছবি? বাবার বাধা ঠেকিয়ে, হাতের মধ্যে হাত দিয়ে—আপনার হাতটা দিন দেখিয়ে দিচ্ছি—হুঁ, ঠিক এইভাবে, বুঝতে পেরেছেন? যারা ছবিটা দেখবে, তাদেরই দিকে তাকিয়ে হাসছে ওরা দু'জন—অর্থাৎ আমারই মুখের ওপর হাসছে! হায় ডাক্তারবাবু··· যারা যায় তাদের জন্যেই সবাই দুঃখ করে, কিন্তু যারা পড়ে থাকে কেউ ভাবে না তাদের কথা। জানেন, গোড়ায় গোড়ায় আমিও কত কেঁদেছি। তারপর কোনো রকমে শক্ত করেছি নিজেকে, আর এখন তো বেশ দিব্যি আছি, এমন কি সুবিধে পেলে ফুর্তিও করি। সংসারে যে কী থাকতে পড়া তা তো জানতে আর বাকী নেই···'

এই সুন্দরীর বন্ধুত্বের জাদু এবং বন্ধুত্বের সহানুভূতির স্বাদ পেয়ে তরুণ ডাক্তার তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। চোখ নামিয়ে সে বলল: কিন্তু—সম্ভবত বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্টই আপনার আছে, এদিকে এই গরিব বুড়ির···'

'কার বললেন? তার?' চপল সুরে ব'লে উঠল নিনকারোসা। 'ইচ্ছে করলেই বাঁচবার মতো যথেষ্টই সে পেতে পারে—তার খাবার তৈরি করার, এমন কি মুখের কাছে এগিয়ে দেবার লোকেরও অভাব নেই—কিন্তু সে তা চায় না।'

'কী বললেন?' আবার মুখ তুলে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল ডাক্তার।

তার সুন্দর মুখে বিস্ময়ের ছায়া দেখে নিনকারোসা হাসিতে ফেটে পড়ল। আর তার সাদা সুগঠিত দাঁতের সারি দেখা গেল সেই হাসির ভিতর দিয়ে।

'সত্যি কথাই বলছি! সে তা চায় না। তার আরো একটি ছেলে আছে—সবচেয়ে ছোট ছেলে। সে-ছেলে চায় বুড়ি তার সঙ্গে থাকুক। বুড়ির যাতে কোনো অভাব অসুবিধে না ঘটে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে

সর্বদাই সে অদ্ভুত।'

'আর একটি ছেলে? ওই বুড়ির?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তার নাম হলো জলিয়া। কিন্তু তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে বুড়ি রাজী নয়।'

'কেন? কেন?'

'বুড়িটা যে একেবারে উন্মাদ—বললুম না? যারা তাকে ছেড়ে পালিয়েছে তাদের জন্যেই দিনরাত কাঁদবে—এদিকে যে ছেলে হাতজোড় করে দাঁড়াবে তার কাছ থেকে খুদকুঁড়োও নেবে না···বাইরের লোকের কাছে সে হাত পাতবে—হ্যাঁ, সেও ভালো—তবু নিজের ছেলের কাছে যাবে না।'

ডাক্তার মনে মনে আরো বেশি অবাক হ'ল কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করে নিজের ক্রমবর্ধমান অস্বস্তিকে চাপা দেবার জন্য জকুটি করে বল্ল:

'সম্ভবত এই ছেলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' লিনকারোলা বল্ল। 'লোকটাকে দেখলে রাগী মনে হয় বটে, আর এ-কথাও ঠিক সহজে সে খুশি হয় না—কিন্তু ভেতরটা তার ভালো। লোকটা সর্বদা কাজ নিয়েই থাকে—কাজ, স্ত্রী আর ছেলেপুলে—এ-ছাড়া তার জীবনে অন্য কোন শখ নেই। যদি নিজের চোখে দেখতে চান তা হ'লে বেশি দূর আপনাকে যেতে হবে না। শুনুন, এই পথ ধরে প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে যান, গ্রামের ঠিক বাইরে বাঁ-দিকে দেখবেন 'ভবপুর'। সেটাই তার জায়গা, লোকটা চমৎকার এক ক্ষেত ভাড়া নিয়েছে। ভালোই আয় হয় সেখান থেকে। সেখানে গেলেই বুঝবেন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। কথাগুলো শুনে সত্যিই সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সেপ্টেম্বরের সুগন্ধী বাতাসে মনও তার প্রফুল্ল।

বুড়িটার সম্বন্ধে সব কথাই তাকে জানতে হবে। সে বলল:

'নিশ্চয়ই যাব।'

সেই রূপোর ছোয়াটার জড়ানো চুলগুলো ঠিক করে নেবার জন্যে নিলকারোগা তার হাত দুটো ঘাড়ের কাছে নিয়ে গেল। তার আধবোজা হাসি-হাসি চোখে নিমন্ত্রণের ইঙ্গিত এনে সে উত্তর দিল:

'আপনার যাত্রা তবে শুভ হোক। কোনো দরকার হলেই জানাবেন।'

চড়াই উঠে এসে দম নেবার জন্যে ডাক্তার একটু থামল। দু-পাশেই গরিব লোকের কয়েকটি কুঁড়ে বাড়ি। তারপরেই গ্রাম শেষ হয়েছে। গলিটা গ্রামের বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। চওড়া উপত্যকার উপর দিয়ে এক মাইলেরও বেশি একেবারে সোজা এগিয়ে গেছে এই পথ, গভীর ধুলোয় ঢাকা। দু-পাশে তার ফসলের ক্ষেত। অধিকাংশ ক্ষেতেরই ফসল কাটা হয়ে গেছে। সেখানে শুধু হলদে খড়ের গোড়াগুলো খোঁচা-খোঁচা হয়ে রয়েছে। বাঁ-পাশেই চমৎকার নির্জন একটি পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে বিরাট ছাতার মতো। কার্নিয়ার যুবকদের বৈকালিক ভ্রমণের জায়গা এটি। উপত্যকার একেবারে শেষে নীল পাহাড়ের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। তার পিছনে সাদা ঘন মেঘ, ঠিক পেঁজা তুলোর মতো দেখাচ্ছে, যেন খোপের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে। প্রায়ই দেখা যায় এক একটি মেঘ দল ছেড়ে ধীরে ধীরে আকাশে বেরিয়ে পড়ে, তারপর কার্নিয়ার পিছন থেকে ওঠা মতি সিয়েরার উপর দিয়ে ভেসে যায়। তখন নিচেকার পাহাড় এক গভীর লাল ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়, তারপর হঠাৎ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকালের গভীর প্রশান্তি মাঝে মাঝে গুলির শব্দে চুরমার হয়ে যায়। তখন সবেমাত্র লার্ক পাখীগুলো আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে। লার্কের ঝাঁক, ঘুঘুর ঝাঁক উপত্যকার উপর দিয়ে যখন উড়ে যায়, চাষীরা তখন গুলি করে। প্রত্যেকটি আওয়াজের পর রুগী কুকুরের হিংস্র চিৎকার বহুক্ষণ ধরে শোনা যায়।

চারপাশের শুকনো ক্ষেতগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে দ্রুত পায়ে ডাক্তার এগিয়ে চলল। এখন বর্ষণের পরেই ক্ষেতগুলো চষা হবে। অবশ্য চাষ করবার লোক বলতে গেলে প্রায় নেইই। গ্রামের চারদিকেই একটা করুণ ছন্নছাড়া চেহারা।

সামনেই নিচের দিকে সে দেখতে পেল 'স্তম্ভগৃহ' এ-নামের কারণ হচ্ছে বাড়িটার একটা কোণ প্রাচীন এক গ্রীক মন্দিরের স্তম্ভের উপর ভর করে রয়েছে। সেই স্তম্ভের উপরের দিকটা ভাঙা আর চেহারাটাও অতি জীর্ণ। বাড়িটা আসলে কুৎসিত একটা কুঁড়ে—সিসিলির চাষীরা তাদের গ্রাম্য বাসস্থানের যে নাম দিয়েছে 'রোবা', এ-বাড়িটা ঠিক তাই। ফণিমনসার ঘন জঙ্গলে তার পিছন দিকটা ঢাকা, সামনের দিকে রয়েছে একজোড়া হুঁচল আর বিরাট স্তুরিক গাছ।

'কে আছ? বাড়িতে কেউ আছ কি?' ডাক্তার গলা বাড়িয়ে হাঁক দিলে, কুকুরকে তার বড় ভয়, তাই সে মর্চে-পড়া জীর্ণ গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল।

ন-দশ বছরের একটি রুক্ষুই ছেলে বেরিয়ে এল। খালি পা, মাথাতে ঝাঁকড়া চুল রোদে পুড়ে ফ্যাকাশে। চোখ দুটো তার শান্ত বুনো জন্তুর মতো সবুজ।

'কুকুর আছে নাকি?' প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'হ্যাঁ, কিন্তু কিছু বলবে না। ভারি শান্ত।'

'তুমি কি রক্কো কপিয়ার ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা কোথায়?'

'ওদিকে খচ্চরের পিঠ থেকে মাল নামাচ্ছে।'

কুটিরের সামনের দাওয়ায় বসেছিল ছেলেটির মা। তার বড় মেয়ের চুল আঁচড়াচ্ছিল। মেয়েটির বয়েস বছর বারো। কোলে কয়েক মাসের ছোট

তাই। মেয়েটা বসেছিল একটা ওল্টানো লোহার বালতির উপর। আর একটা ছোট ছেলে সামনের জমিতে মুর্গিগুলোর মধ্যে গড়িয়ে বেড়াচ্ছিল—তাকে দেখে তারা ঘাবড়াল না, শুধু সুন্দর দেখতে একটা মোরগ বিরক্ত হয়ে গলা বাড়িয়ে ঝুঁটিটা নাড়তে লাগল।

মেয়েটিকে লক্ষ্য করে তরুণ ডাক্তার বলল, 'মস্কো রুপিয়ার সঙ্গে একটু দরকার আছে। আমি গ্রামের নতুন ডাক্তার।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য মেয়েটি চিন্তিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তার স্বামীর সঙ্গে ডাক্তারের কী দরকার থাকতে পারে ভেবে পেল না। বাচ্চাটাকে সে দুধ খাওয়াচ্ছিল, বডিসটা তখনও খোলা রয়েছে। তার মোটা কাপড়ের শার্টটা ভিতরে ঠেলে, বোতাম লাগিয়ে, অতিথির জন্যে চেয়ার আনতে উঠল। ডাক্তার কিন্তু বসল না। মাটির উপরকার ছেলেটাকে পিঠ চাপড়ে আদর করতে লাগল। অন্য ছেলেটা দৌড়ল বাপকে ডেকে আনতে।

কয়েক মিনিট পরে শোনা গেল নাল লাগানো ভারি বুটের শব্দ, তারপর ফণিমনসার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মস্কো রুপিয়া। তার পা দুটো লম্বা আর ধনুকের মতো বাঁকা। পিছনে একটা হাত রেখে চাষীদের স্বাভাবিক ভংগীতে একটু কুঁজো হয়ে সে হাঁটে। তার বিরাট থ্যাবড়া নাক, অস্বাভাবিক লম্বা উপরের ঠোঁট, চাপা-চোয়াল, চোখ-মুখ—সব মিলে অনেকটা বাঁদরে দেখতে। তার চুলগুলো লাল, আর ক্যাকাশে মুখ ভরা ঝাঁটিল। তার কোটরগত সবুজ চোখের দৃষ্টি যেমন বাঁকা, তেমনি চতুর।

কালো বোনা টুপিটাকে কপালের উপর থেকে সামান্য পিছনে ঠেলে এক হাত তুলে ডাক্তারকে সে অভিবাদন জানাল।

'প্রণাম হই। কী আজ্ঞা বলুন।'

'কথাটা আর কিছুই নয়,' ডাক্তার আরম্ভ করল। 'তোমার মা-র সম্বন্ধে

পোস্টাকতক কথা বলতে এসেছি।'

বুড়ো ক্রপিয়ার মুখের ভাব বদলে গেল।

'তার কি অসুখ হয়েছে ?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল ডাক্তার। 'সে যেমন থাকে তেমনই আছে। কিন্তু তুমি তো জান সে কী রকম বুড়ি হয়ে গেছে, জামা কাপড় টুকরো-টুকরো, দেখবার কেউ নেই...'

ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে বুড়ো ক্রপিয়ার অস্বস্তি ক্রমে বাড়তে লাগল। শেষটায় নিজেকে আর সামলাতে পারল না।

'আমাকে কি আর কিছু বলবার আছে ডাক্তারবাবু ? যা আজ্ঞা করবেন তাই করব। কিন্তু আপনি যদি আমার মা-র কথাই শোনাতে এসে থাকেন তা হলে বিদায় দিন, কাজে ফিরে যাই।'

'শোন! তোমার দোষে যে তার এই দুর্গতি নয় সে-কথা জানি,' তাকে ধরে রাখার জন্যে ডাক্তার বলল। 'আমি শুনেছি তুমি এমন কি...'

'এদিকে আসুন ডাক্তারবাবু,' কুটিরের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বুড়ো ক্রপিয়া অকস্মাৎ বলল। 'বাড়িটা গরিব লোকের। কিন্তু আপনি গ্রামের ডাক্তার—হালে নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো বাড়ি খুব বেশি দেখেননি। বিছানাটা দেখে যান—আমার বুড়ি মা'র জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সে আমার মা, তাই তার সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে মুখে বাধে। এই দেখুন আমার বউ আর ছেলেমেয়েদের। ওদের মুখেই শুনুন আমার বুড়ি মা'কে দেবীর মতো সর্বদা ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে আমি আদেশ দিয়ে রেখেছি কিনা। ডাক্তারবাবু, নিজের মাকে সব সময় ভক্তি করা উচিত, নয় কি ? কোন অপরাধে সে যে সমস্ত গ্রামের কাছে আমার মুখ পুড়িয়ে বেড়ায় জানি না। ভগবান জানেন গ্রামের লোকেরা আমাকে কী ভাবে...এ-কথা সত্যি ছেলেবেলা থেকেই বাপের বাড়ির

লোকের কাছেই আমি মানুষ আর বরাবরই যা আমার সম্বন্ধে উদাসীন ব'লে তাকে কখনো মায়ের মতো ভক্তি করতে শিখিনি। তবু তাকে বরাবরই ভক্তি করেছি, তার মঙ্গল কামনা করেছি। সেই হতভাগা ছেলে ছুটো আমেরিকায় চলে যাবার পর এ বাড়িতে তাকে কর্ত্রী করে আনার জন্যে আমি দৌড়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু না, তা তার পছন্দ হ'ল না। গ্রামের মধ্যে ভিখিরি সাজতেই তার শখ হ'ল, লোক হাসাল আর আমার মুখ পোড়াল।

'সেই হাবাতে ছেলে ছুটোর জন্যে গত চোদ্দ বছর ধরে আমাকে যে জ্বালা-যন্ত্রণায় পুড়তে হয়েছে সে-কথা কখনো ভুলব না আর আপনাকে দিব্যি গেলে ব'লে রাখলুম ডাক্তারবাবু, তাদের মধ্যে কেউ যদি কখনো কানিহার ফিরে আসে আমি তাকে নিশ্চয়ই খুন করব। এই চার ছেলে আর বৌর সামনে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা কইছি এ-কথা যেমন সত্যি, তারা ফিরলে যে খুন করব সে-কথাও তেমনি সত্যি…'

রাগে কাঁপতে লাগল বুড়ো রুপিয়া। তার মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ দুটো টকটকে লাল। হাত দিয়ে সে ঠোঁটের পাশেকার ফেনা মুছল।

তাকে দেখতে-দেখতে সেই তরুণ ডাক্তারের মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। 'বুঝলুম,' একটু থেমে সে বলল। 'এ-কারণেই তা হ'লে তোমার মা এখানে থাকতে চায় না। ভাইদের এ-রকম ঘেন্না কর ব'লেই সে আসতে চায় না এখানে। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল।'

'ঘেন্না?' ঘুষি পাকিয়ে পিছন থেকে হাতটা বার করে বুড়ো রুপিয়া হুঙ্কার দিয়ে উঠল। 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এখন তাদের ঘেন্নাই করি। আমার আর মায় এই দুর্দশার মূলে তারা আছে এ-কথা ভেবে আমি তাদের ঘেন্নাই করি। ছেলেবেলায় তারা এখানে যখন ছিলো বড় ভাই-এর মতো সত্যিই তাদের ভালোবাসতুম। প্রতিদানে আমার সঙ্গে তারা

কেইন-এর মতো ব্যবহার করত। শুনুন ডাক্তারবাবু। তারা কেউই কোনো কাজ করতো না, প্রত্যেকের জন্যে এবং আমাকে খাটতে হোতো। তারা এসে বলতো রাতের খাবার কিছু নেই, রাতে উপোস করে রাত কাটাতে হবে—শুনে আমার খাবার দিয়ে দিতুম…তারা মাতাল হয়ে ঘুরত, বেশ্যার পেছনে টাকা ঢালত আর আমার ভাগ আমি দিয়ে দিতুম…তারা যখন আমেরিকায় চলে গেল আমার যথা-সর্বস্ব তাদের দিয়েছিলুম—এই তো আমার বৌকেই জিগ্যেস করুন না—তার মুখেই সব কথা শুনুন।'

'তা হলে এর কারণ কী?' প্রায় নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করল ডাক্তার।

হুগো ক্রপিয়া শুকনো হাসল।

'কারণ? কারণ আমার মা বলে আমি নাকি তার সন্তান নই।'

'কী বললে?'

'তাকেই শুধোন গে ডাক্তারবাবু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না। খচ্চর বোঝাই গম নিয়ে আমার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে…এ-সব কথা আর সহ্য হয় না। তাকেই শুধোন গে ডাক্তারবাবু। রওনা হই।'

যেমন এসেছিল সে-ভাবেই ফিরে গেল হুগো ক্রপিয়া, পিছনে একটা হাত রেখে, কুঁজো হয়ে। তার দীর্ঘ পা-দুটো ধনুকের মতো বাঁকা। মুহূর্তের জন্যে ডাক্তারের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল তারপর সে মুখ ফেরাল বাজারের দিকে—তারা যেন ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। সে কেবল বসেই অস্বস্তিতে হাত কচলাচ্ছে। শেষে চোখ বুজে অসহায়ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।'

গ্রামে ফিরেও ডাক্তারের এই অবিশ্বাস্য কাহিনীর শেষটা জানবার কৌতূহল গেল না। তার দরজার সামনে বুড়ি বসে রয়েছে, ঠিক যেমনটি তাকে দেখে গিয়েছিল। এক রকম রুক্ষভাবেই তাকে ডাক্তার ভিতরে ডাকল।

'তোমার ছেলের সঙ্গে কথা বলে এলুম। তোমার যে এখানে আরো এক ছেলে আছে সে-কথা জানাওনি কেন?'

প্রথমে বিহ্বল হয়ে, পরে প্রায় ভীত ভাবেই চেয়ে রইল মারাগ্রাৎসিয়া। কপালে আর চুলের মধ্যে তার কম্পিত হাত চালাতে-চালাতে সে উত্তর দিল:

'ও ছেলের কথা শুনলে আমার কালঘাম ছোটে ডাক্তারবাবু। দয়া করে তার কথা বলবেন না।'

'কেন বলব না?' রেগে প্রশ্ন করল ডাক্তার। 'সে তোমার কী ক্ষতি করেছে? আমাকে বলতে হবে!'

'সে কিছুই করেনি,' তাড়াতাড়ি বুড়ি জবাব দিল। 'সত্যি বলছি সে কোনো ক্ষতি করেনি আমার। বরং সব সময়েই সে ভালো ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমি···আমি···দেখছেন ডাক্তারবাবু সে কথা বলতে গিয়ে আমার হাত কী রকম কাঁপছে? সে-কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না! কারণ—কারণ—ও-লোকটা আমার ছেলে নয়, ডাক্তারবাবু!'

তরুণ ডাক্তারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

'কী বকছো—সে তোমার ছেলে নয়? তুমি বলছো কী? তোমার কি ভিমরতি ধরেছে, না কি পাগল হয়ে গেছ? সে কি তোমারই সন্তান নয়?'

ডাক্তারের রাগ দেখে বুড়ি মাথা নামিয়ে, রক্তাক্ত চোখের পাতা আধবোজা করে উত্তর দিল:

াজ্ঞে হ্যাঁ, বোধ হয় আমি বোকাই। পাগল? না! হা ভগবান্,
ন আমি পাগল হলুম না। তা হ'লে তো এ-অনুভূতির হাত থেকে
চে যেতুম…কিন্তু আপনি যে এখন নিতান্তই শিশু, তাই এমন
তগুলো কথা আছে যেগুলো ঠিক বুঝতে পারবেন না। আমার চুল
কা হয়ে গেছে, বহুদিন ধরে বহু কষ্ট পেয়েছি, অনেক কিছু দেখেছি…
মন সব জিনিস দেখেছি আপনি যা ধারণাও করতে পারবেন না।'

কী এমন দেখেছ, কী? বল!'—আবেগের সুরে বল্‌ল ডাক্তার।

প্রাকৃতিক কাণ্ড! ভয়ঙ্কর জিনিস!' মাথা দুলিয়ে বুড়ো লোক উঠলে
ঠল। 'সেকালে আপনি জন্মাননি, আপনার কথা তখন স্বপ্নেও
ভাবেনি কেউ—এতদিন আগেকার কথা। তাদের আমি নিজের
চোখে দেখেছি—আর তখন থেকেই আমার বুকের রক্ত জল হয়ে
রয়েছে…আপনি কি ক্যানেবার্কোর (গ্যারিবল্ডির নাম সিসিলির
লোকেরা এইভাবে উচ্চারণ করত) নাম কখনো শুনেছেন?'

গ্যারিবল্ডি?' বিস্মিত হয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্যানেবার্কো। আমাদের দেশে এসে শহরে আর গ্রামে
মানুষ আর ভগবানের প্রত্যেক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ
করেছিল। তার কথা কি শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর! গ্যারিবল্ডির সঙ্গে এর কী সম্বন্ধ?'

'সম্বন্ধ আছে বৈকি মশাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেই লোকটা—
সেই ক্যানেবার্কো এখানে এসেই সমস্ত শহরের সমস্ত জেলখানার দরজা
খুলে দিয়েছিল। আপনি কল্পনা করুন আমাদের দেশের উপর কী
অরাজকতার ঝড়ই না বয়ে গেছে—যারা শঠ, যারা খুনে, যারা
ডাকাত, যারা বছরের পর বছর জেলে বন্ধ থেকে একেবারে ক্ষেপে
ছিল, তারা ছাড়া পেল! তাদের ভেতর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ছিল কোজা
ক্যাম্বিংগি—ডাকাতের সর্দার সে। তার কবলে যারা পড়ত

তাদের সে ছুরিতে মেরে ফেলত মশার মতো, মুখে বলত—এ আর কী—বাক্সটা তাজা আছে কিনা আর বন্দুকটা ঠিকমতো ভরা আছে কিনা তারই শুধু পরখ করা চলছে। খোলা জায়গায় সে থাকতো। এদিক দিয়ে যাবার সময় কার্নিয়ার ভেতর দিয়েই সে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল একদল সাঙ্গপাঙ্গ—তারা সবাই চাষি। তাদের নিয়ে সে খুশি ছিল না, দল ভারি করার জন্যে আরো অনেক লোক খুঁজছিল, আর যে তার চ্যালা হতে রাজী হয়নি তাকেই মেরে ফেলছিল। তখন সবে আমার কয়েক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, ওই দুটি ছেলেও তখন জন্মেছিল—যারা এখন আমেরিকায়। পোজেস্তোর গোলাবাড়িতে আমরা তখন থাকতুম। আমার স্বামী—তাঁর আত্মার শান্তি হোক—সেটা ভাড়া নিয়েছিল। কোলা ক্যাম্বিৎসি যাবার সময় তাকেও নিয়ে গিয়েছিল—জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমার স্বামীকে···দিন দুই পরে দেখলুম সে ফিরে এসেছে, চেহারা একেবারে মড়ার মতো—সে যেন অন্য একটা মানুষ। তার কথা আটকে গিয়ে-ছিল, তার চোখের মধ্যে ছিল বিভীষিকার ছায়া। বেচারা তার হাত দুটো ঢেকে ফেলল—সে-হাত দিয়ে তাকে জোর করিয়ে যে-কাজ করানো হয়েছিল সেই লজ্জায় সে হাত ঢেকেছিল। 'ওগো!' আমি তাকে বললুম—(তাঁর আত্মার শান্তি হোক)—'ওগো, তুমি কী করেছ?' সে জবাব দিতে পারল না। 'হ্যাঁ গো, তুমি কি ওদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছ? তোমাকে ধরলে কী হবে? তোমাকে যে খুন করবে!' আমার মন বলল কী ঘটবে···কিছুদিন সে আমাদের সঙ্গে ছিল, হাত দুটো এইভাবে জামার ভেতর ঢুকিয়ে, মেঝের দিকে চেয়ে, উনুনের কাছ ঘেঁষে, চুপচাপ বসে থাকত—তার চোখ দুটো উন্মাদের মতো। তারপর সে বলল, 'এর চেয়ে মরা ভালো!' আর কিছু বলেনি তিন দিন সে লুকিয়েছিল। চতুর্থ দিনে সে বাইরে গেল—আর

গরিব, কাজ না করলে চলে না। সে ক্ষেতে গিয়েছিল কাজ করতেই। সন্ধে হয়ে এল—তবু সে ফিরল না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম। হা ভগবান! কী ভাবেই না অপেক্ষা করেছি—কিন্তু তখনি জানতুম, ততক্ষণে সব ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছিলুম—তবু ভাবলুম, কে জানে? হয়তো তাকে প্রাণে তারা মারেনি—শুধুই হয়তো ধরে নিয়ে গেছে। দু'দিন পরে জানতে পারলুম কোনো ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের মঠেরকুলা ধ্যানরে রয়েছে। জায়গাটা লিগুরোরিয়ার সন্ন্যাসীদের। তারা সেখান থেকে পালিয়েছিল। প্রায় পাগলের মতোই সেখানেই হেঁটে গেলুম। ডাক্তারবাবু, সেদিন ছিল দারুণ ঝড়। সে-রকম ঝড় জীবনে কখনো দেখিনি। আপনি কি কখনো হাওয়া চোখে দেখেছেন? সেদিন সত্যিই দেখতে পেতেন! মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত খুন করা লোকের আত্মা মানুষ আর দেবতাকে ডেকে বলছে, প্রতিশোধ নাও। সেই ঝড়ের মধ্যেই চললুম আমি। আমাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। আমাকে যেন কুটিকুটি করে ফেলছিল সেই ঝড় আর আমার আর্তনাদ ঝড়ের হুঙ্কারকে ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছিল। আমি যেন উড়ে চললুম। অনেক উঁচুতে, কালো পপলারের ঝোপের ভেতর সেই মঠে পৌঁছতে আমার ঘণ্টা খানেকও লাগল না।

সেখানে পাঁচিলে-ঘেরা মস্ত একটা উঠোন ছিল। এখনো মনে আছে একপাশে ঝোপে আধ ঢাকা ছোট্ট দরজা দিয়ে ভিতরে যাবার পথ। গাছের শেকড়গুলো দেয়ালের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। জোরে ঠোকা দেবার জন্যে একটা পাথর কুড়িয়ে নিলুম। ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে চললুম, কিন্তু কিছুতেই তারা খুলল না। আমি ধাক্কা দিয়েই চললুম। শেষে তারা খুলল। হা ভগবান! কী দৃশ্য দেখলুম ভিতরে!—'

মারাগ্রাৎনিয়া দাঁড়িয়ে উঠল। আতঙ্কে তার সমস্ত মুখ কুঁকড়ে গেছে। তার আরক্ত চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। একটা হাত সে বাড়াল, আঙুলগুলো

থাবার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, আর বলতে পারল না।

'তাদের হাতে…' অনেক পরে সে বল্‌ল, 'তাদের হাতে…সেই শয়তানদের হাতে…তাদের হাতে…'

আবার সে থামল। কে যেন চেপে ধরল তার গলা আর দু-হাত দিয়ে কিছু ছুঁড়ে ফেলবার ভংগী সে করতে লাগল।

শিউরে উঠে ডাক্তার প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

'সেই উঠোনে তারা ভাঁটা খেলছিল…মানুষের মুণ্ড নিয়ে খেলছিল…ধুলোয় ঢাকা কালো কালো মুণ্ড…চুলের মুঠি ধরে তুলছিল তারা…আর…আর সেগুলোর মধ্যে ছিল একটা মুণ্ড, আমার স্বামীর…কোলা ক্যাবিৎসি নিজেই সেটা ধরেছিল…আমাকে সে দেখাল। বুক ফাটিয়ে গলা ছিঁড়ে আমি আর্তনাদ করে উঠলুম। এতো জোরে চেঁচিয়েছিলুম যে খুনেরা পর্যন্ত শিউরে উঠল। থামবার জন্তে কোলা ক্যাবিৎসি আমার গলাটা টিপে ধরল আর তারপরেই দলের একটা লোক পাগলের মতো আক্রমণ করল তাকে। আর তাই দেখে সাহস পেয়ে চার-পাঁচজন—হয়তো দশজনই হবে—চারদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরল। সেই শয়তানের বর্বর অত্যাচার তারাও যথেষ্ট সয়েছিল তাই তারা বিদ্রোহ করল—আর জানেন, ডাক্তারবাবু, আমার চোখের সামনে দলের লোকের হাতে তার নিজের গলাটা কাটা পড়ল দেখে সত্যিই ভারি তৃপ্তি পেলুম!'

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বুড়ি ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। সমস্ত দেহ তার শিউরে-শিউরে উঠছে।

তরুণ ডাক্তার তাকে দেখতে লাগল। তার চোখে অনুকম্পা, বিতৃষ্ণা আতঙ্ক-যেখান চাউনি। ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এসে শান্তভাবে ভেবে সে কিছু ঠিক বুঝল না এই বীভৎস গল্পের সঙ্গে তার অস্থ ছেলে

ছ কী। তাকে সে পরিষ্কার করে বলতে বলুন।

জান!' ঝব দিয়েই বুড়ি উত্তর দিল। 'যে-লোকটা বিদ্রোহ শুরু
র আমাকে বাঁচাতে এসেছিল তার নাম মার্কো কপিয়া।'

হো!' বিস্মিত হয়ে বললে ডাক্তার। 'তা হ'লে হয়তো…'

ারই ছেলে,' উত্তর দিল মারাগ্রাৎসিয়া। 'ডাক্তারবাবু, ভালো করে ভেবে
বুন! আমার যে অবস্থা গিয়েছে তারপরেও কি ও লোকটাকে বিয়ে
রা সম্ভব ছিল? আমাকে পাবার জন্যে সে খুনোখুনি করতে লাগল।
ন মাস ধরে তার কাছে আমাকে রেখেছিল, আমি চেঁচাতুম কামড়াতুম
লে আমার মুখ বন্ধ করে সে বেঁধে রাখত…তিনমাস পরে সরকার
াকে ধরে জেলে বন্ধ করে রাখল, সেখানেই কিছু দিনের মধ্যে
রেছিল লোকটা। কিন্তু ততদিনে আমি পোয়াতি হয়েছি।

াক্তারবাবু, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমার ভেতরটা আমি ছিঁড়ে
ফলতে চেয়েছিলুম—আমার মনে হয়েছিল আমি এক দানবের জন্ম
িতে চলেছি—তার হাত থেকে বাঁচবার কোনো উপায় নেই। মনে হ'ল
ছেলেটাকে কোনোদিন ছুঁতেও পারব না। তাকে মাই দিতে হবে এই
ভাবনায় পাগলের মতো আমি আর্তনাদ করতুম। তার জন্মাবার সময় আর
কটু হ'লেই তো মরেছিলুম। আমার মা-ই (তাঁর আত্মার শান্তি হোক)
দেখাশুনো করত। ছেলেটাকে একবার দেখতেও দেয়নি। জন্মাবার
রেই তাকে সোজা তার বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিল, সেখানেই সে
ানুষ…এখন বলুন তো ডাক্তারবাবু, সে আমার ছেলে নয় এ-কথাটা
ই মিথ্যে?'

ভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল ব'লে ডাক্তার প্রশ্নটা কোনো জবাব দিল না;
পরে বললে—'কিন্তু যাই হোক, সে তো তোমারই ছেলে, তার
দোষ কী?'

কিছু না!' বুড়ি উত্তর দিল, 'কখনোই তাকে আমি দোষ দিইনি।

সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু, বরং তার প্রশংসাই করেছি। কিন্তু দূর থেকে দেখলেও তাকে সহ্য করতে না পারলে আমি কী করব বলুন? ডাক্তারবাবু, সে ঠিক তার বাপের মতো দেখতে হয়েছে—চেহারায়, গড়নে, গলার স্বরে। তাকে দেখলেই আমার হৃৎকম্প হয় আর কান্নায় ছোটে। আমি আর স্থির থাকতে পারি না, আমার মাথায় আগুন জ্বলে। আমি কী করব বলুন—?'

এক মুহূর্তের জন্যে থেমে হাতের উল্টো পিঠে সে চোখ মুছল। তার পরেই ভয় হ'ল যে-বল ক্লিনিক ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার আসল ছেলেদের জন্যে চিঠিটা না নিয়েই হয়তো চলে যাবে। তাই সাহসে বুক বেঁধে অন্যমনস্ক ডাক্তারকে সচেতন করে বলুন: 'আপনি যদি দয়া করে যা বলেছিলেন…'

কাকামি দিয়ে সেই যুবক তার ভাবনাগুলোকে যেন ঝেড়ে ফেলল। তারপর টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে এনে জানাল সে প্রস্তুত। আবার সেই ঘ্যানঘ্যানে স্বরে বুড়ি বলতে শুরু করল:

'আমার বাছারা…'

— কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়